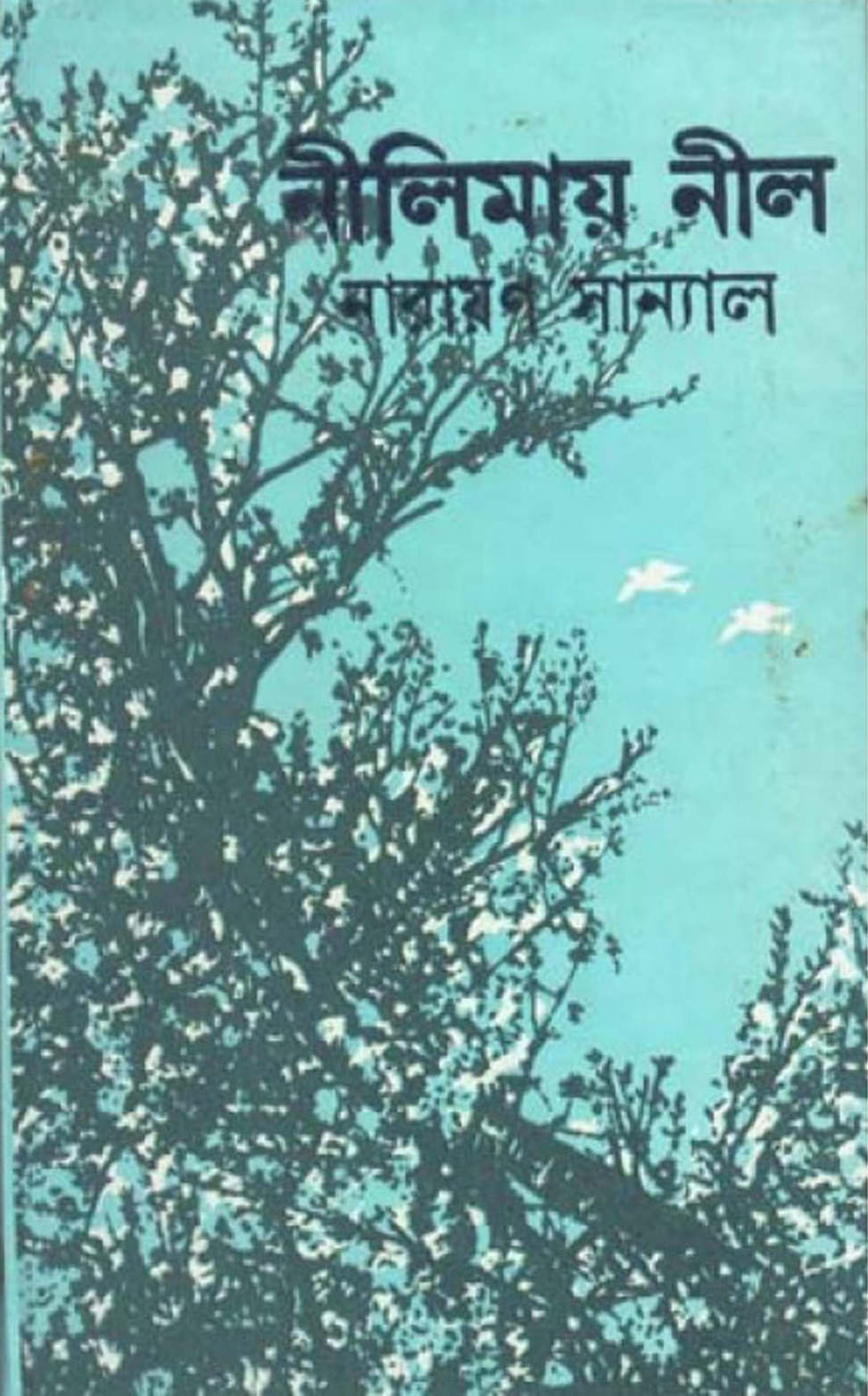


নীলিমায় নীল

মারায়ণ মান্যাল



नौनिमाय नौन

ନୌଲିଖାସ ନୌଲ

ନାହାସବ ନାହାସବ



ଅଗିମା ପ୍ରକାଶନୀ

୧୫୧ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ସ୍ଟ୍ରିଟ, କଲକାତା-୭୦୦୦୦୨

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অগ্নিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

অগ্নিমা সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৬৩

মুদ্রাকর : শ্রীকুশলধ্বজ মান্না, মান্না প্রিণ্টার্স
৬৭/এ ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬

শ୍ରীইন্দ্রা মৈত্র
৬৮ডীদাস মৈত্র

যৎগলকরকমলেশ্ব

চিঠি-চিঠি-চিঠি !

এক এক ধাপে তিন তিনটে করে সিঁড়ি ভিঙিয়ে বাদল উঠে আসে একতলা থেকে দোতলায়। পর্দা সরিয়ে জ্বলন্তরুমে ঢুকতে ঢুকতে বলে—মা নম, ছোড়দি নম, দাদা-বউদিরও নম—দিদির চিঠি !

দিদির দিকে একটা অ্যাক্যুরেট-থ্রো করে। অব্যর্থ লক্ষ্যে ইন্-সুইং বলের মতো খামখানা এসে পড়ে শর্মিলার কোলের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী চিৎকার—হাউস দ্যাট !

মিসেস বোস ধমকে ওঠেন, ও আবার কি অসভ্যতা, দিন দিন বাঁদর হয়ে উঠছে একটা।

হঠাৎ যেন এক ফর্মে নিবে যায় বাদল। দিদি এল। বি হয়েছে নির্ঘাৎ, কিন্তু অস্পায়ারের নির্দেশ সে যেনে নেয় নির্বিচারে। মাথাটা নিচু করে বলে—আম্মাম সরি !

যেন নিজেই বোম্বড-আউট হয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরছে।

মিসেস স্বাগতা বোসের বাড়ির ব্যবস্থা ঘাড়ের কাটার সঙ্গে বাঁধা। সকাল সাতটায় সকলকে এসে বসতে হয় ব্রেকফাস্ট টেবিলে। যদি কোন কারণে কারও দেরি হয়ে যায় তাহলে সে ওই বাদলের মতো সলজ্জকণ্ঠে বলে, আম্মাম সরি ! এ নিয়ম চলে আসছে সেই সাহেবের আমল থেকে। আজ আর সাহেব নেই, কিন্তু তাঁর প্রচলিত আইন আছে অব্যাহত। মিসেস বোস অবশ্য এর আগেও একবার চা খান বিছানায় শূরে শূরে। চায়ের প্রথম পাট মেটাবার দায় জনার্দনের। বোস-সাহেবের আমলের পুরাতন ভৃত্য সে। ঘরে ঘরে পেঁছে দিয়ে আসে বেড-টি। শূধু মিসেস বোসের ঘরে রেখে আসে কাপ নম, গোটা পট্টাই—টি-কোজি দিয়ে ঢেকে। তারিয়ে তারিয়ে দু-আড়াই কাপ চা খান তাঁর শয্যাভ্যাগ করার আগেই। স্বামী গত হবার পর অনেক কিছুই ত্যাগ করেছেন—কর্তার দেওয়া এই নেশাটিকে ছাড়তে পারেননি।

কিন্তু শয্যা-চায়ের সে আলোজনটা ধর্তব্যের বাইরে। বাদলের ভাষায় সেটা ‘ট্রায়াল বল’। আসল খেলা শূধু হয় এই চায়ের টেবিলে। সকাল সাতটায়। বাড়ির সকলেই এসে বসে। বাইরের লোক কেউ থাকে না, তবু ওরই মধ্যে সরম্বা একটু প্রসাধন করে আসে। ঘাড়ের-মুখে লেগে থাকে অস্প পাইডারের প্রলেপ। এটা মিসেস বোসেরই শিক্ষা, তাঁরই নির্দেশ। অপরের একটা কোঁচে গা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। বাঁ হাতে জ্বলতে থাকে ধুমায়িত সিগার। না, মায়ের সামনে ধূমপানে বাধা নেই। মিসেস বোস আলোকপ্রাপ্ত। ব্যারিস্টারের গৃহিণী। ছেলেমেয়েদের

তিনি বাস্তবী হতে চান, সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সরে থাকতে চান না একান্তে। ফলে চা-পানাণ্ডে চুরট ধরাবার জন্য অপরেণকে কোন নলচের আড়াল খুঁজতে হয় না। মৌতাতটা চলে আরও কিছুদ্ধণ। এ সময়টুকু মিসেস বোসের ভারি প্রিয়। এ যেন মহাকালের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একমুঠো দুলভ মূহূর্ত। একটু বেলা বাড়লেই যে খার কক্ষপথে জীবনচক্রে পরিভ্রমণ শুরু করবে। এ যুগে জীবন বড় জটিল—নিকট আত্মীয়ের জীবনচক্রে সম্পান তুমি রাখতে পারবে না। রমলা যাবে কলেজে, সেখানে তার একটা ভিন্ন সন্তা। শর্মিলা যাবে অফিসে, সেখানে তার অন্য এক পরিচয়। অপরেণ, ভগবান জানেন কোথায়—তার সম্পানই জানেন না মিসেস বোস। অথচ এরা সবাই তার সন্তান, তাঁরই রক্তমাংসে গড়া জীব। ফলে মধ্যাহ্ন-আহারটা একত্রে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। রাত্রেও তাই। কে কখন ফিরবে তার খবর জানা আছে শুধু ঠাকুরের।

আজও ওঁরা বসেছিলেন প্রাত্যহিক নিয়মে। মিসেস বোসের হাতে একজোড়া নিটিং-এর কাটা। অপরেণের দৃষ্টি সকালের কাগজে নিবদ্ধ। সরমা টি-পট থেকে চা ঢালছে কাপে, আর রমলা টোস্টের উপর মোলায়েম করে মাখনের আন্তর লাগাতে ব্যস্ত। একমাত্র বেকার বসেছিল শর্মিলা। বাদলের বডি-লাইন ইন-সুইঞ্জারটা এসে পড়ল তার কোলে। শর্মিলা ম্যানিক্যুর-করা দুটি আলতো আঙুলে তুলে ধরল খামটা। পোস্ট-অফসের ছাপটা দেখে নিয়ে খামটাকে উপড় করে রেখে দেয় ফের টেবিলের উপর। হাত বাড়ায় চায়ের কাপটার দিকে।

সু দুটি কুঁচকে ওঠে স্বাগতার। কেমন যেন সন্দেহ জেগেছে তাঁর মনে। সন্দেহ নয়, প্রমিানশন। আজ সকালে বিহানায় শুরুরে প্রথম ধুম ভেঙেছে বিদ্রী একটা দাঁকাকের ডাকে। বারান্দার রেলিঙে-বসা কাকটা ককশ স্বরে ডাকছিল কা-কা-কা। বিরক্তিকর। স্বাগতার শাশুড়ী—এ বাড়ির প্রান্তন গৃহিণী জীবিত থাকলে কাকবাবাজীবনের উদ্দতন চতুর্দশ পুরুষকে উদ্ধার করে ছাড়তেন। সেসব সুপারস্টিশন মিসেস বোসের নেই। এ যুগের মানুষ তিনি, কনভেন্ট-লালিত। তবু কেমন যেন অস্বস্তি লেগেছিল তাঁর। হঠাৎ সেই সকালবেলার ককশ শব্দটাই মনে পড়ে গেল এ সময়ে। শমু খামটা খুলল না কেন?

ঠিক ঐ কথাই ভাবছিল সরমা পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে। ঠাকুরবির চিঠিপত্র তো কই আজকাল আর আসে না। যেসব কলেজের বাস্তবী এককালে মোটা মোটা খাম পাঠাত ওর নামে, তারাও ওর নিরুদ্ভাপ উদাসীনতার চিঠি লেখা বন্ধ করেছে ইদানীং। শামকের মতো নিজের কঠিন বর্ধের মধ্যে শর্মিলা গুটিয়ে ফেলেছে নিজেকে। আপন মনে থাকে। খাম দায় অফিস করে। বাইরের

দুনিয়ার সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক না রাখলে নয়, সেটুকুই শব্দ বজায় রেখেছে। লক্ষ্য আলোকপ্রাপ্তা নয়, সৌন্দর্যের পাসপোর্ট নিয়ে সে প্রবেশ করেছে এই অভিজাত রাজ্যে, মধ্যবিত্তের সংসার থেকে। ফলে অতটা সংযমও নেই তার। মনে মনে এখনও এক। কোত্‌হলটা দমন করতে না পেরে ফস করে বলে বসে—কই, খামটা খুললে না ঠাকুরাণি ?

চামে চুমুক দিতে দিতে নির্বিকার ভাবে শর্মিলা বলে—খুললেই হবে।

কোত্‌হলী অপরেণও হাঁচ্ছল যথেষ্ট। খবরের কাগজ থেকে বারে বারে দৃষ্টি সরে যাচ্ছে টেবিলের উপর মুঁছিত খামখানার দিকে। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, সাদামাটা একখানা ডাকের চিঠি। কিন্তু কী-জানি-কেন অপরেণের মনে হল ঐ চিঠিখানা বিশেষ অর্থবহ। অর্থবহ না অনর্থবহ ? শর্মিলার ভঙ্গিটাই তার প্রমাণ। শব্দর হাতটা কাঁপছে। হ্যাঁ, ঠিকই চামের কাপটাকে সে ঠিকমত ধরে রাখতে পারছে না। বালয়ান মাকে'টের পাতাটা মুড়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত অপরেণকে বলতে হল—বিকাশ লিখেছে বন্ধু ?

শর্মিলা হাসল। বললে—তার চিঠি তো কালকেই এসেছে তোমার কাছে। আজ বাদে কাল সে আসছে। সে আবার লিখবে কেন ? কই দাদা, তুমি টোস্ট নিলে না ?

—হ্যাঁ নিই। অপরেণ হাতটা বাড়ালো এবং কোত্‌হলটা গোটালো। লক্ষ্য করল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায় শর্মিলা। এক্ষেত্রে অপরেণেরও এ প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া উচিত। সৌজন্যের তাই নির্দেশ। অপরের চিঠির সম্বন্ধ বেশী কোত্‌হল দেখানো এটিকেট-বিরুদ্ধ তা হোক না কেন নিজের বোনের চিঠি। কিন্তু তবু অপরেণ চূপ করে যেতে পারে না। ধরতে গেলে সে এখন এ পরিবারের অভিভাবক। বললে—কাল চিঠি লিখেছে বলে আজ আর লিখবে না এমন কি মানে আছে ? চিঠি কি লোকে শব্দ প্রয়োজনেই লেখে ?

শর্মিলা স্মিত হাসল।

মিসেস বোস এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলেন সকলকে। হাতের কাঁটা দূরটো তাঁর অনেকক্ষণ থেমে আছে। মনের কাঁটাটাই খচখচ করে বিঁধছে। শর্মিলা এভাবে সকলের জবাব এড়িয়ে যেতে চাইছে কেন ? কোথা থেকে এসেছে চিঠিখানা তা খোলাখুলি বলে দিতেই বা বাধা কোথায় ? অপরের চিঠির বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোত্‌হল নেই। ছেলেমেয়েদের তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। যে খুঁশি লিখুক না কেন চিঠি তাঁর ছেলেমেয়েদের, তাঁর কী ? আলোকপ্রাপ্ত সমাজে স্বামী ও স্ত্রীর চিঠি সম্বন্ধে কোত্‌হল দেখায় না, তা এ তো মেয়ে। তবু জেদী মেয়েটা যখন সব প্রগ্নই কোঁশলে এড়িয়ে যেতে চাইছে তখন তিনি আর না বলে পারলেন না—ছাপটা কোন পোস্ট অফিসের ?

কিন্তু কি হল শর্মিলার ! খপ করে উঠে পড়ে চেয়ার ছেড়ে। ঠক করে আধ

খাওয়া চায়ের পেয়লাটা নামিয়ে রাখে টেবিলে। খামটা সজোরে ছুঁড়ে দেয়
মায়ের দিকে, ঠিক যে ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য এইমাত্র ধমক খেয়েছে বাদল।
বেশ জোরের সঙ্গে বলে—হ্যাঁ তোমরা যা ভাবছ তাই। বহরমপুরেরই চিঠি।
নাও, খুলে পড়। প্রাণটা ঠান্ডা হোক।

দুঃখ দুঃখ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় শনি'লা।

মিসেস বোস স্তম্ভিত। অপরের চশমাটা খুলে অকারণেই কাচটা মূছতে
থাকে। সরমা একবার স্বামী একবার শাশুড়ীর মূখের দিকে তাকিয়ে দেখে।
তারপর যেন বাতাসকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে—মাই দোখি, জনার্দন বাজারে
গেল কিনা।

জনার্দন বাজারে গেল কিনা দেখবার কোন প্রয়োজন নেই। যশের মতো
সে কাজ করে যায়। এতক্ষণ সে বসে নেই, বাজারে বেরিয়ে গেছে নিশ্চয়। কিন্তু
ঐরকম একটা অছিলা করে স্থানটা ত্যাগ করা দরকার হয়ে পড়েছিল সরমার।
রমলাও একবার দাদার গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখল। মায়ের প্রথমতঃ
মুখের দিকেও। তারপর সেও ভাববাচ্য বলে ওঠে—আমার আবার প্রায়টিকাল
ক্লাস আছে আজ। তৈরী হয়ে নিই গে।

প্রায়টিকাল ক্লাস আছে বেলা দেড়টায়। রমলা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে।
সায়াম্প। দেড়টার ক্লাশে হাজিরা দেবার জন্য এই সাত সকালে তারও বাস্ততার
কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু হঠাৎ ঘরের বাতাসটা কেমন ভারী ভারী লাগছে।
রমলাও পালিয়ে বাঁচে।

পাথরের মূর্তির মতো বসেছিলেন মিসেস বোস। পায়ের কাছে পড়ে
আছে না-খোলা খামটা। অপরের একটু কাশল। মোছা-কাচ চশমাটা
চড়াল নাকে। আড় চোখে একবার দেখে নিল মা'। তারপর একটু
নড়েচড়ে উঠতেই মিসেস বোস বলেন—তোমারও কোন জরুরী কাজের কথা মনে
পড়ে গেল নাকি?

মিসেস বোসের দৃষ্টি কিন্তু জানালা দিয়ে চলে গেছে বাইরে।

অপরের সত্যিই পালাবার তালে ছিল। এ কথায় বসে পড়ে ফের; বলে—
কী যে বল মা, আমি আর পালিয়ে যাব কোথায়? এ যে আমারই দায়। বাবা
থাকলে না হয়—

কথাটা আর সে শেষ করে না। একটু গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলে মুখে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই স্বাগতা বলেন, তা, এ
চিঠিখানা কি খোলা হবে না?

অপরের বলে—কেন হবে না? যার চিঠি তাঁকে দাও, তিনিই খুলুন।

এতক্ষণে স্বাগতার দৃষ্টি ফিরে আসে। বাইরে থেকে ভেতরে। পূর্ণদৃষ্টিতে
ছেলের দিকে তাকান এবার। অপরের একটু চমকে ওঠে। মায়ের এ দৃষ্টিকে

সে চেনে। স্বাগতা খামটা কুড়িয়ে নিলেন, বলেন—না, এ চিঠি কেউ পড়বে না। এ চিঠি আসেনি। খোলাই হবে না এ খাম।

টি-পয় থেকে দেশলাইটা তুলে নিয়ে মিসেস বোস ফস করে একটা কাঠি জ্বালেন। খামটা ধরেন তার শিখায়। শব্দ দেশলাই কাঠিটাই নয়, তাঁর চোখদুটোও যেন জ্বলছে।

অপরের মাকে ভয় করে। এ পরিবারে সবাই করে। কিন্তু এখন ভয় করলে চলবে না। খপ করে সে কেড়ে নেয় খামখানা। বলে এ কি করছ তুমি?

—ঠিকই করছি। আমি জানি ঐ চিঠির মধ্যেই আছে আবার নতুন সর্বনাশের বীজ। বিকাশ নিজে থেকেই প্রস্রাব তুলছে। না না করতে করতে শব্দ এতদিনে রাজী হয়েছে। কালই দিল্লি থেকে বিকাশ আসছে। আর আশ্চর্য! যোগাযোগ! আজই এল এ চিঠি! না না, এখন নতুন করে জট পাকাতে দেব না আমি। ও চিঠি তুই পড়িয়ে ফেল খোকা। আর আজই মনোহরবাবুকে খবর দে। বিকাশ এলে কালই কথাবার্তা সব পাকা করে ফেল। কী তোদের কোর্ট কাছারীর কারবারটুকু বাকি আছে মিটিয়ে ফেল।

অপরের বলে—তা তো বুদ্ধিলাম। কিন্তু শব্দ যখন বলবে, মা, আমার চিঠি কই? কি বলবে তাকে?

—বলব, না পড়েই পড়িয়ে ফেলেছি সে চিঠি।

—তাই বল তাহলে। এখানা থাক আমার কাছে। ভয় পেও না, ভগ্নীপতির চিঠি আমি খুলে পড়ব না। কিন্তু কে বলতে পারে আইনের চোখে হয়তো এ চিঠিখানাই হয়ে পড়বে ইম্পটেন্ট ডকুমেন্ট। মনোহর কাকাকে না দেখিয়ে আর কোন চিঠিপত্র নষ্ট করা আমাদের উচিত হবে না।

কৃতবিদ্যা ব্যারিস্টারের স্ত্রী স্বাগতাকে স্বীকার করে নিতে হল যুদ্ধিটা।

অপরের খামখানা পকেটে রাখে। হাতঘাড়িতে দেখে সাড়ে আটটা বেজে গেছে। দেরি হয়ে গেছে ওর। হাঁক পাড়ে জনার্দন, মহেশ্বরকে বল গাড়ি বার করতে।

স্বাগতাও উঠে যান নিজের ঘরের দিকে।

রাতে অপরের যখন ফিরে এল তখন আশপাশের বাড়ির বার্তা নিবেছে। গোটা নিউ-আলিপুুরটা যেন ঝিমোছে প্রথম শীতের আমেজে। মাঝে মাঝে দ্রুতগামী ট্যাক্সির শব্দ। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে, দু একটা পান-বিড়র দোকান খোলা আছে এখনও। গাড়ি গ্যারেজ করে অপরের উঠে এল বিতলে। মিসেস বোস জেগেই ছিলেন। আলো জ্বলছে তাঁর তিনতলার ঘরে। কিন্তু পত্র রাত করে ফিরলে আজকাল আর তিনি নিচে নেমে আসেন না খবরদারি

করতে। পাখি এখন নিজের ডানায় ভর দিয়ে উড়তে শিখেছে। মায়ের পক্ষপদ্যের আড়াল খোঁজে না সে এখন। রাষ্ট্রের আহাৰ্য হটকেসে রাখা আছে। ইলেকট্রিক হাটারে সরমা ফ্রাইগুলো শব্দ চটপট ভেজে দেবে। তার আমলে তিনিও তাই করতেন, ব্যারিস্টার বোসসাহেব রাত করে ফিরলে। বছর কয়েক আগে হলেও তিনি একসময়ে নেমে আসতেন। তখন সরমা ছিল না এ সংসারে। এমন রাতও গেছে যখন কতার দৃষ্টি এড়িয়ে ছেলেকে বিছানায় শুইতে দিতে হয়েছে। টাই খুলে দিয়েছেন, মোজা খুলে দিয়েছেন; — এমন কি আচমকা ঘর নোংরা করে ফেললে সকলের দৃষ্টি এখানে ধুয়েও দিয়েছেন। এখন আর সে দায় নেই। কে জানে এত রাত করে থোকা খেয়ে ফিরেছে কি না। সে খবরটার জন্য তার কৌতূহল আছে কিন্তু জানেন, ওরা কেউই সেই কৌতূহলের পেছনে মাতৃস্বপ্নটিকে শব্দ প্রকার চোখে দেখবে না। ওরা বিব্রত বোধ করবে তিনি নিচে নেমে এলে। স্নাগতা সেটা চান না। খোকাকার গাড়ি ঢোকাকার শব্দ পেয়েও তাই তিনি নেমে এলেন না।

অপরেণ কিন্তু আজ নৈশ আহাৰ্য সেরে আসেনি। জামা জুতো খুলে প্রথমেই ঢোকে বাথরুমে। গরম জল তৈরী আছে। এখন সে স্নান করবে। সরমা ফ্রাই কথানা ভেজে নেবার আয়োজন করে।

ঢিলে পায়জামা আর চীনে কোটটা গায়ে চাপিয়ে অপরেণ বিছানায় উঠে শোয়। ইটালিয়ান কম্বলটা টেনে দেয় পায়ের উপর। বুকের নিচে টেনে নেয় পালকের বালিশ। সামনে টি-পয়ের উপর খাবারের থালা। এই মুহূর্তটিতে সে আর সাহেব নয়, ভারতীয়ও নয়, সে আপরুচি। শীতের রাতে এই আধশোয়া অবস্থায় নৈশ আহাৰ্য গ্রহণের বিচিত্র ব্যবস্থাটি তার স্বকপোলকল্পিত।

সরমা স্টেনলেস স্টীলের হাতায় আহাৰ্য পরিবেশন করতে করতে বলে—বেশ আছ তুমি। এদিকে বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড হয়ে গেল আর তুমি দিব্যি গায়ে ফু দিয়ে বেডালে সারাদিন।

গায়ে ফু দিয়ে অপরেণ সারাদিন মোটেই হাওয়া খেয়ে বেড়ায়নি। রীতিমত ছোটোছোটো করতে হয়েছে তাকে। তিনটে মিটিঙ অ্যাটেন্ড করেছে, একটা টেন্ডার দিতে হয়েছে, হিসাবপত্র দেখতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদ করা বৃথা। তাই সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলে—দক্ষযজ্ঞ কিসের?

—ঠাকুরকি ক্লেপে আগুন।

—মা তার চিঠি না পড়েই পড়িয়ে ফেলেছেন।

—তাই নাকি?

—ন্যাকা! যেন জানেন না কিছুই! তোমার আদিদেহতা দেখলে কামা পায়। তোমরা দুজনেই তো শলাপরামর্শ করে কাণ্ডটি করেছ।

যুদ্ধের গ্রাসটা গলাধঃকরণ করে অপরেণ বলে—কে বললে? মা?

—আবার কে ?

অপরেণ সতর্কভাবে একবার ওয়াল্ডোবটার দিকে তাকায়। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় আবার। ওখানেই হ্যাণ্ডার থেকে বুলছে বৃশকোটটা। তারই পকেটে খামটা রয়েছে। এখনও খোলা হয়নি। দিনের মধ্যে বার দুই-তিন বার কবেছে চিঠিখানা—নাড়াচাড়া করেছে—কিন্তু খোলেনি। হ্যাঁ, বহরমপুরেরই ছাপ। স্পষ্ট পড়া যায় ছাপটা। আনন্দের কাছ থেকেই এসেছে চিঠিখানা। তাই খুলতে পারেনি। হাজার হোক ভগ্নীপতির চিঠি তো। এর ছোট বোনকে লেখা। অবশ্য দুর্দিন পরে সে আর ভগ্নীপতি থাকবে না। বিবাহ-বিচ্ছেদটা আইনত অনুমোদিত হওয়ার অপেক্ষা। তখন আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে আনন্দের আর কোন তফাত থাকবে না পথেঘাটে দেখা হলে মনে হবে এ ভদ্রলোককে কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু আজও আইনের চোখে,—আর শব্দ আইন কেন সমাজের চোখে, বিবেকের দৃষ্টিতে আনন্দ ওর ভগ্নীপতি। স্ট্রীকে লেখা তার চিঠি অপরেণ খুলবে কোন অধিকার ?

—চিঠিখানা তোমাদের পড়ে দেখা উচিত ছিল।

অন্যমনস্কের মত অপরেণ বলে - কেন ?

—আজ একবছর পর হঠাৎ ঠাকুরজামাই ওকে কেন চিঠি লিখলেন তা জানা উচিত নয় ?

অপরেণ ধমকে ওঠে দেখ, তোমার ঐ ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই ঈডিয়াঃ গুলো বাতিল কর দেখি। এতদিন এ বাড়িতে আছ, তবু বদভ্যাসগুলো গেল না তোমার ?

সরমা মৃদু টিপে হেসে বলে—সত্য না যায় ম'লে ! ঠাকুরঝিকে ঠাকুরঝি, ঠাকুরপোকে ঠাকুরপো আর তোমাকে ওগোই বলব আমি। 'ডালিং' ডাক শোনার জন্যে যদি অতটা হা-পিতোশ হয়ে থাকে তবে বোনের সঙ্গে বরং তুমিও আর একবার বসে পড় বিয়ের পিঁড়িতে।

অপরেণ জবাব দেয় না। মনটা তার আজ সত্যিই ভারাক্রান্ত। অফিসেও আজ রাগারাগি হয়েছে। তাছাড়া সকালের ডাকে শম্ভুর নামে যে চিঠিখানা এসেছে, তার মর্মার্থ কেউ জানে না ; কিন্তু সকলেরই কেন জানি মনে হয়েছে এ সংসারে ছোটখাটো একটি অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবার মতো বিস্ফোরণী শক্তি আছে ঐ চিঠিখানির গর্ভে। আনন্দের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চূঁকিয়ে দিয়েছে শম্ভু। আত্মপ্রাপ্ত এক বছরের উপর দুজনের মৃদু দেখাদেখি নেই, চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও বন্ধ। একদিন ঐ আনন্দের জন্যে শম্ভু এ পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক চূঁকিয়ে দিয়েছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে রোজগারি বিয়ে করেছিল। আজ তার ফল ভোগ করছে সে। এ যে ঘটবে তা জানা ছিল অপরেণের। জেদের বশে

শর্মিলা বিয়ে করেছিল ঐ অপদার্থ মানুষটাকে। জেদ ছাড়া কী? যে পরিবারে, যে পরিবেশে সে বড় হয়ে উঠেছে তাতে ঐ কপর্দকহীন লোকটার সংসারে ঘর মুছে আর বাসন মেজে যে সে জীবনটা কাটাতে পারবে না এ তো জানা কথাই। পরিবারের প্রতিটি প্রিয়জনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে সেদিন ভুল করেছিল শম্ভু। ব্যারিস্টার বোস-সাহেব তার আগেই গত হয়েছেন। শ্বাগতার কঠোর নির্দেশ অমান্য করে শম্ভু গৃহত্যাগ করেছিল। তার ফল সে ভুগছে এখন। মাত্র এক বছরের মধ্যেই তার শ্বশুর ভেঙে গেছে। সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছে আবার। আজ এই এক বছরের মধ্যে আনন্দের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ নেই। আনন্দের ছোট বোন উমা অবশ্য একবার এসেছিল। নিশ্চয়ই দৌতকার্খ। কিন্তু শ্বাগতা সে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। শম্ভুর সঙ্গে মেয়েটির দেখা হতে দেননি। মিথ্যা কথা বলেছিলেন শ্বাগতা—শম্ভু বাড়ি নেই।

আজ দীর্ঘ এক বছর পর কী এমন নতুন কথা জানাতে চায় আনন্দ? সে কি নিজে থেকেই লিগ্যাল সেপারেশনের প্রস্তাব পাঠিয়েছে? কিন্তু আনন্দ তো লিখতে পারে না। সে দৃষ্টিশক্তিহীন। ঠিক কথা। এই চিঠি আনন্দ শ্বহস্তে লেখনি—সে ক্ষমতা তার নেই। আশ্চর্য, এত সহজ কথাটা তার খেয়াল হয়নি কেন? আনন্দ কাউকে দিয়ে এ চিঠি লিখিয়েছে, হয় তার বোন উমা, নয় কোন বন্ধু, অথবা তার উকিল। সুতরাং সে ক্ষেত্রে অপরের যদি চিঠিখানা খুলে পড়ে তাতে দোষের কিছু নেই। অপরের ইচ্ছে হল, এখন এই মনুহুতেই খামখানা খুলে ফেলে। রংসোর যবনিকাপাত ঘটায়। কিন্তু না, সরমার সামনে সে কিছু করবে না। বোস-বাড়ির বউ হয়েছে সরমা যেন ঠিক এ পরিবারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি। অপরের তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। না, বিশ্বাসঘাতকতা সরমা কিছু করবে না। কিন্তু সে বড় সরল, বড় সহজ। মিসেস শ্বাগতা বোসের উপযুক্ত পুত্রবধূ সে নয়। তাকে কিছু জানতে দেওয়া চলবে না। অপরের স্থির করল শ্রীকে লুকিয়ে খামখানা আজ রাতেই আয়রন চেস্টে সরিয়ে রাখবে। তারপর সম্মত খুলে পড়বে। হ্যাঁ, পড়াই উচিত। এ সব অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। বাজে সেস্টিমেণ্টে ইতস্তত করা চলে না। বাবা নেই, সমস্ত দায়িত্ব এখন অপরের। শম্ভু রাজী হয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদনপত্রে সই দিতে রাজী হয়েছে। অশ্ব স্বামীর ঘর করতে আইনত সে বাধ্য নয়। বিকাশকে তার নতুন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতেও রাজী হয়েছে। বিকাশ এ পরিবারের অনেকদিনের পুরানো বন্ধু। জীবনে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে। অপরের চেয়ে তার রোজগার বেশী। একটু শ্রম। তা এ সমাজে কেউ সেটা গারে মাথে না। বড়লোকই পারে বড়লোকি চাল মারতে। পাঁচ-সাত বছর ধরে বিকাশকে জানে এ পরিবারের

সবাই। শম্ভুর প্রাক্‌বিবাহজীবনে তার স্মৃষ্টিরূপে এ বাড়িতে বিকাশের প্রথম আগমন। ব্যারিস্টার বোস-সাহেবও তাকে পছন্দ করতেন। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর বন্ধুশ্রমতী মেয়েটি তাকেই বেছে নেবে জীবনসঙ্গীরূপে। তাঁর সে আশায় ছাই দিয়ে মূখ্য মেয়েটা চলে গিয়েছিল কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল আনন্দের স্থানে। বিকাশও বোধ করি সে আঘাতে মর্মান্বিত হয়েছিল। আসলে তার ভ্যানিটিতে লেগেছিল বেশি। ঠিক হতাশ প্রেমিক হিসাবে নয়, রাগে সে নিজেকে থেকেই উদ্‌বিগ্ন করে দাঁড়িয়ে বদলি হয়ে গিয়েছিল। সমাজে বেচারি আর মূখ্য দেখাতে পারছিল না। তার মতো স্মৃষ্টিগঠকে উপেক্ষা করে একটা মাস্টারের কাছে ধরা দিয়েছে তার বাস্তবী, এ চিন্তা লুকোতে সে দেশভাগী হয়ে পড়ে। অপরের আশা করেনি সেই বিকাশ আবার রাজ্য হবে শম্ভুকে বিবাহ করতে। কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন! এতদিনে শম্ভুর সম্মতি পেয়ে সেই বিকাশই ছুটে আসছে দিল্লি থেকে।

রাত পোহালে কালবেই সে এসে হাজির হবে এখানে। অপরের এ সুযোগ ছাড়তে পারে না। কিছুতেই না। দক্ষ নাবিকের মতো এবারে বন্দরে ভিড়িয়ে আনতে হবে হালভাঙা জাহাজ। দেরি করলে চলবে না। ইতস্তত করলে আবার হয়তো ভেঙে যাবে সব। মেয়েদের মন তো, কখন কোথায় ঘনিষে উঠবে মেঘ, কোন দিক থেকে বইবে ক্ষ্যাপা হাওয়া—পথ হারায়ে জাহাজ।

—কই, তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না। খেয়ে এসেছ নাকি?

—না না, খাচ্ছি তো। বেশ খিদে আছে আজ। আচ্ছা, শম্ভু অফিস থেকে ফিরে আর বার হয়নি?

—আপিস! না, তিনি আজ আপিস থেকে ফিরেছেনই রাত করে। এই মাত্র।

—তাই নাকি? খুব কাজের চাপ পড়েছে বোধহয়।

—আর ন্যাকামি কর না। তোমাদের আবার আপিস, তার আবার কাজের চাপ! মায়ের কাছে মাসীর গম্পো!

—তার মানে?

—তার মানে আপিস-করা কাকে বলে যদি জানতে চাও তাহলে আমার বাবাকে দেখ গে, দাদাকে দেখ গে। সেই সকাল সাড়ে আটটায় দুটো নাকে মুখে গন্ধে ছোটো আপিসে। টাম্রে বাসে ঝুলতে ঝুলতে। দু'তিনটে টিউশানি সেরে যখন বাড়ি ফেরে তখন নিশ্চয় রাত।

শম্ভুর এবং শালার সঙ্গে এ জাতীয় ভুলনায় অপরের নিজেকে খুব অগৌরবান্বিত মনে করে না। হেসে বলে—আমাদেরও তো তাই। আমিও সেই সাত-সকালে বেরিয়ে গেছি, ফিরছি এই নিশ্চয় রাত্রে। আর এইমাত্র তো তুমি বললে শম্ভুরও

আজ দিনটা গেছে একই ভাবে ।

সরমা মৃদু টিপে হেসে বলে—তুমি কোথায়-কোথায় যাও তা অবশ্য জানি না ; কিন্তু তোমার বিদ্যেধরী বোনটির কীৰ্ত্তি জানা আছে আমার । আপিসের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সারা রাজ্জা টো টো করে বোরেন ।

—কী বলছ তুমি ! শম্ভুর অফিস কোথায় তা তুমি জান না ?

—খুব জানি, এবং সেখানে যে তিনি যান না তাও জানি ।

—এ সব তোমার মিতো সন্দেহ ।

—বটে ! তবে শোন । আজ সন্ধ্যাবেলায় এসেছিল সেই মিনি মিস্তুর । ঐ যে ঠাকুরঝির সঙ্গে কাজ করে । এসে বলে, শর্মিলাদির জ্বর এ বেলায় কত ? আমি তো থা । শেষে শুননি আপিসে ফোন করে তোমার গৃহবতী বোনটি জানিয়েছেন যে তিনি জ্বরে ভুগছেন । আপিসে যাবেন না ।

অপরেণ হেসে ফেলে, বলে—কি করে ম্যানেজ করলে ?

—করলাম । প্রথমটা আমতা আমতা করছিলাম । কিন্তু মিনি মিস্তুর এক নম্বর খড়িবাজ । বদ্বলাম নিজলা মিছে কথা বলে ও ভেটিকিমুখীর কাছে পার পাওয়া যাবে না । বিকাশবাবুর কথা তো আগের বারই শুনেন গেছে, তাই বললুম, কাল বিকাশবাবু আসছেন, তাই নিয়ে ওর কি সব কাজ আছে । জ্বর-টর নয় । মাগী ভারি শয়তান !

অপরেণ বিরক্ত হয়ে বলে কী বিদ্রী ভাষা হচ্ছে তোমার দিন দিন । বিদ্যেধরী, ভেটিকিমুখী, মাগী ! এ সব কী ?

—বললুম তো, ডালিং, ডিয়ার শুনবার শখ থাকে, তাহলে টোপরের অর্ডার দাও গে, যাও । আমার দ্বারা ও সব চলবে না ।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল অপরেণের । প্লেটো সরিয়ে রেখে সিগারেট ধরায় এবার । মাঝে মাঝে ওর মনে হয় শর্মিলাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই । শর্মিলা যে ভুল করেছে জীবনে, তার চেয়ে বড় ভুল করে বসে আছে সে । হাজার হোক আনন্দ লোকটা ইস্টেলে কুচুয়াল, তার সঙ্গে বসে দু'দণ্ড আলাপ করা যায় । আর এ ? একই ভুল, একই পরিবারে এ রকম একই ভুল পর পর করে কেউ ? দেখেও শেখে না ? শম্ভু আগে ভুল করেছে । ঘর না দেখে বর বেছে নিয়েছে । মিল হয়নি ফলে । তা দেখেও কেন সতর্ক হতে পারল না অপরেণ ? কেন নিজই পছন্দ করে এস সরমাকে ? অপরেণ তো জানত সরমা শুলের গাউ পেরিঘে বাইরে আসেনি কোনদিন । দুজনের শিক্ষায়-দীক্ষায় জীবনদর্শনে আশমান-জমিন ফারাক । মধ্যবিত্ত সংসারের অভাব-অনটনের মধ্যে সরমা অত্যন্ত ছোট পরিসরে মানুষ । সে জীবনযাত্রার সঙ্গে র্যাশন-বাগ ছেঁড়া ছাতা আর প্রাইভেট টাইশার্মি অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা । তাই আজও জনাদর্শন বাজারের পয়সা সরাচ্ছে কি না, মহেন্দ্র পেট্রল বেশি খরচ করছে

কি না দেখতেই তার সব এনার্জি ফুটিয়ে যায়। রেক্সোরাতে একসঙ্গে খেয়ে তাকে লুকিয়ে টিপস্ দিতে হয় অপরেরকে। সরমা সন্দরী, খুবই সন্দরী ছিল সে বিয়ের আগে; কিন্তু স্যোসাইটিতে কি সন্দরী মেয়ের আকাল পড়েছিল? কেমন যেন একটা শিভালির ভূত তখন চেপে বসেছিল অপরের ঘাড়ে। ঘন্টে-কুড়ুনির মেয়েকে বিয়ে করে আনে যে রাজপুত্র তার চরিত্রটা অভিনয় করবার শখ হয়েছিল যেন। অপরের আজ দায়ী করে তার মাকে। তিনি বাধা দেননি বলে। বোধ করি একবার বাধা দিতে গিয়ে বার্থ হওয়ায় স্বাগতা ওর বেলায় আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

—তুমি কি বই-টাই কিছ পড়বে? বেড-ল্যাম্পটা জ্বললে দেব?

—না থাক। ঘুম পাচ্ছে আমার।

আলো নিবিয়ে শূন্যে পড়ে অপরের। কিন্তু ঘুম নেই তার চোখে। অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করতে থাকে ডানলোপিলোর আলিঙ্গনে। আর আশ্চর্য, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল সরমা শোওয়ামাত্রই।

পাশের ঘরে শর্মিলারও কাটছে বিনিন্দ্র রাত্রি।

শম্ আর রম্ একই খাটে শোয়। দুই বোন। ছেলেবেলা থেকেই ওরা এভাবে শোয়। মাঝে অবশ্য বহরখানেক রমলাকে এ খাটে একা শূতে হয়েছে। রমলা ঘুমিয়ে কাদা। শর্মিলা ওর গায়ে চাদরটা টেনে দেয়। হাতটা কোয়দায় বুলে পড়েছিল খাট থেকে। তুলে ঠিক করে দেয়।

—রম্, এই রম্, সরে শো। এতবড় মেয়ে ঘুমালে একেবারে কাদা।

রমলার ঘুম ভাঙে না তাতেও। ঠেলাঠেলিতে পাশ ফিরে শোয়। আধো ঘুমে আচমকা জড়িয়ে ধরে দিদির গলা। একেবারে বৃকের মধ্যে মূখ গর্জনে সরে আসে ঘুম-কাতুরে মেয়েটা। শর্মিলা হাসে আপনমনেই বলে—শোয়ার কী ছিরি!

গলা থেকে হাতটা খুলে নেয়। ঘুম-কাদা রম্ টেরও পায় না। শর্মিলা উঠে পড়ে। এক গ্লাস জল খায়। ঘড়িটা একবার দেখে। রাত সাড়ে এগারোটা। বড় কাঁটা আর ছোট কাঁটা দুটো যেন ঝগড়া করেছে। দুজনের মূখ দেখা-দেখি নেই।

শর্মিলা আঙে আঙে নিজের গলায় হাত বুলালো। এখন কেমন আঁকড়ে ধরেছিল রম্ ঠিক এই রকম শোওয়ার ধরন ছিল আনন্দের। ঘুমের মধ্যে এমন আচমকা জড়িয়ে ধরত যে দম বন্ধ হয়ে যেত। অবশ্য এ সবই প্রথম দিকে। বিয়ের পর শেষ দিকে ওরা এক বিছানাতে শুলেও মনে হত যেন দুজনে নদীর দূ পারে আছে। কিন্তু প্রথম দিকে আনন্দ ছিল যেন অন্য আর এক রকম মানুষ। ছেলেমানুষ, খুশীমাল, ফুটিবাজ। সে, মানুষই কী হয়ে গেল মাত্র একটি বছরে। যেন পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ, গভীর নীরস। কিন্তু

না, সেই শেষের দিকে আনন্দের কথা আজ ভাববে না শর্মিলা। তাকে মনে করতে হবে প্রথম দিককার আনন্দকে। একটা বিশেষ রাত্রির কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল শর্মিলার। ওরা তখন হুগলীতে। বিষের মাস দুই পরের কথা। আনন্দ প্রথম চাকরি পেয়ে যোগ দিয়েছে মহসীন কলেজে। শর্মিলাকেও নিয়ে গেছে। ফাঁকা মতন জামগাটা। একতলা বাড়ি। দুখানি মাত্র ঘর। সামনের ঘরখানাকে গোরবে বৈঠকখানা বলা হত বটে, আসলে সেটা ছিল বইয়ের গুদাম। আশ্চর্য বই-পাগল মানুষ আনন্দ মিত্র। রাজ্যের বই কিনে আনত সে অহরহ। যে কটা টাকা রোজগার করত তা থেকে বইয়ের পিছনেই ব্যয় হত বেশি। শর্মিলা কোন অনুযোগ করলেই বলত—ঠিক কথা, বিবাহের ব্যাকরণে এর্বিস্বধ নির্দেশ আছে বটে। 'ই'-স্থলে 'উ' আদেশ।

—তার মানে ?

—মানে 'বই'য়ের পিছনে খরচ বন্ধ করে 'বউ'য়ের পিছনে খরচ করতে হবে।

তা সে কথা যাক। সেই বিশেষ রাত্রির কথাটাই এখন মনে করবে শর্মিলা। রোমস্থান করবে স্মৃতির সঞ্জীবনী। এখন তো সেইটুকুই ওর সম্বল। সে রাত্রেও শর্মিলার চোখে ঘুম ছিল না। আর সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত আনন্দ অঘোর ঘুমোচ্ছে পাশে শুয়ে—ঠিক আজকের রম্ভার মত। সে রাতটাও ছিল আজকের মতো অশুভকার। চাঁদ ছিল না আকাশে। না, আলো তো ছিল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঘরের সামনেই ছিল রাস্তা। সেখানে ছিল এক-পায়ে-খাড়া একটা ল্যাম্প-পোস্ট। সারারাত তাতে আলো জ্বলত। পূর্বের জানলা দিয়ে সেই রাত্রে লাইট-পোস্টের এক মূঠো আলো এসে ছড়িয়ে পড়ত ওদের মশারির গায়ে। আনন্দ বলত—চাঁদনী অর নো চাঁদনী, আমার ঘরে নিতা পূর্ণিমা।

শর্মিলা বলত—মিউনিসিপ্যালিটি তোমার ট্যাক্স না বাড়িয়ে দেয়।

আনন্দ ছদ্ম বিষ্ময়ে বলে তার মানে ? তুমি কি ওই ল্যাম্প-পোস্টটার আলোর কথা ভাবছ বুঝি ? আমি ও কথা বলছি না কিন্তু—

—তবে কী ?

ওর গালটা টিপে দিয়ে আনন্দ বলেছিল—আমি এই পূর্ণিমার কথা বলছি।

নাঃ। আবার উন্মোচন ভাবনা শুরুর হয়েছে। কী কথা ভাবছিল সে ? ও হ্যাঁ, সেই বিশেষ রাতটার কথা। সে রাত্রেও ঘুম আসছিল না শর্মিলার চোখে। আর ঘুমেরই বা দোষ কী ? এমন ঘরে এমন পরিবেশে সে কখনও ঘুমায়েছে যে, নিশ্চিত হয়ে ঘুমাবে ? আনন্দের আর কী ? সমস্ত দিন হয় পড়ছে নয় পড়াচ্ছে, হয় লিখছে নয় লেখাচ্ছে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক চালনার আর বিরাম নেই। ফলে খাটে এসে শুলেই একেবারে মড়া। অথচ প্রহরের পর প্রহর ঘুম আসত না শর্মিলার চোখে। ডাক শুনত ঝাঁঝ পোকার, শেল্লালের আর নিশাচর

চৌকিদারটার। সে রাতেও শূন্যে শূন্যে উসখুস করছে, হঠাৎ মনে হল বাইরের জানলার কাছে কিসের খুটখুট শব্দ। শর্মিলা চুপচুপি ডেকে দিয়েছিল আনন্দকে—এই, শূন্য ? ওঠ, কিসের যেন আওয়াজ হচ্ছে।

তাতেও আনন্দের ঘুম ভাঙে না। শেষে একটা ঠেলা দিতেই ঠিক এই রম্ভার মতো আনন্দ ওকে আচমকা জড়িয়ে ধরেছিল। বৃকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে আরাম করে শূন্যেছিল।

—এই ! আচ্ছা মানুষ তো ! ওঠ, চোর এসেছে !

ঘুমের ঘোরে আনন্দ বলে'ছিল—চোর নয়, ছুঁচো।

—না না, তুমি উঠে দেখ একবার। আমার ভয় করছে। শূন্য ?

—উ ? চোর ? আচ্ছা দেখছি। বলে, শূন্যে শূন্যেই একটা হাঁক পেড়েছিল—অ্যাই চোর ! ভাগ ! শব্দ করিস না, বউ ভয় পাচ্ছে।

শর্মিলা চাপা ধমকে গর্জে'ওঠে—কী অসভ্যতা হচ্ছে ! ও ঘরে উমা আছে না। উঠে দেখবে না, খালি শূন্যে শূন্যে চে'চানো। ভারী অন্যায়।

ঘুমের ঘোরে আনন্দ সায় দেয়—অন্যায় বলে অন্যায়। বেটা চোর, চুরি করছি'স কর, আবার শব্দ করা কেন !

শর্মিলা এক ধাক্কা মেরে বলে—কী হচ্ছে ! চুপ কর না, চে'চাচ্ছ কেন ?

এবার ঘুমটা ভেঙে যায় আনন্দের। বলে—তুমি চে'চাতে দিচ্ছ কেন ? চুপ করিয়ে দিলেই পার।

—তার মানে ?

তার মানে বোধ না ? আচ্ছা এই দেখ বুঝিয়ে দিচ্ছি। ক্ষমতা থাকে তো চে'চাও দেখি।

—দম বশ্ব হয়ে গিয়েছিল শর্মিলার। বাঁ হাতের চোটোর মুখটা মুছে নিয়ে বলেছিল—অসভ্য কোথাকার !

মার ঘরে আলো জ্বলল।

আজ রাতে স্বাগতের চোখেও বোধ করি ঘুম নেই। খুটখুট শব্দ হচ্ছে তাঁর ঘর থেকে। পাশের ঘরে ছিটকিনি খোলার আওয়াজ হল। শর্মিলা চাদরটা টেনে নেয়। চোখটা অস্পষ্ট করে দেখে স্বাগতা এ ঘরের দিকেই আসছেন। হাতে টর্চ। ওদের বিছানার দিকে এগিয়ে আসছেন। শর্মিলা মড়ার মত পড়ে থাকে। যেন ঘুমে কাণা। স্বাগতা ওর মাথায় বালিশটা ঠিক করে দিয়ে ফের বেরিয়ে গেলেন। হ্যাভানা ঘাসের নরম চটির আওয়াজ মোজেইক মেজেতে শোনা যাচ্ছে, রাত এত নিস্তব্ধ। বাথরুমের দিকে চলে গেলেন মিসেস বোস।

শর্মিলা আপন মনেই হাসল। আশ্চর্য, সে কেন মড়ার মত পড়ে থাকল !

কেন জানতে দিল না মাকে, যে সে জেগে আছে। শর্মিলা কি মায়ের কাছে থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে? না কি তিনি আজ সকালে আনন্দের চিঠিখানা না পড়েই পুড়িয়ে ফেলেছেন বলে এ অভিমান? আচ্ছা, সেই বা কেন মিছিমিছি রাগারাগি করতে গেল এভাবে? আনন্দের প্রতি তার তো আর কোন মমতা, কোন আকর্ষণ নেই। আনন্দের লেখা চিঠির বিষয়ে তো কোন কৌতূহল তার থাকার কথা নয়। সে-পাট তো সে চুকিয়েই দিয়ে এসেছে চিরকালের জন্য। যে ব্যবহার আনন্দ করেছে তারপর তার সঙ্গে বিতীয়বার বোঝাপড়া করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দীর্ঘদিন তা সত্ত্বেও সে প্রতীক্ষা করছিল, কিন্তু আনন্দের দিক থেকে কোন আহ্বান, কোনও মাড়া সে পায়নি। এমন কি সে হাসপাতালে গেল, ফিরে এল ওবু কোনও খবর নেয়ান আনন্দ। ফলে সেই শেষ সাক্ষাতে যে কথাগুলো আনন্দ বলেছিল সেগুলোকে আর রাগের-মাথায়-বলা ফাঁকা কথা বনে উড়িয়ে দিতে পারেনি। আনন্দ মৃত্তি চেয়েছিল। শর্মিলা তাকে মৃত্তি দিয়েছে। শুধু কি তাই? শর্মিলাও যে মৃত্তি চেয়েছিল। এতদিনে সে মৃত্তি সেও পেয়েছে। ভুল ভুলই। দু পক্ষই সে ভুল বন্ধুতে পেরেছে। ভুল সংশোধনের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। অনেক ভেবেচিন্তে শর্মিলা সম্মতি দিয়েছে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থাপনায়। যে ভুলকে দৃজনেই অস্বীকার করতে পারেনি, সে ভুলকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়াই ভাল। আচ্ছা ডিভোর্সের কথা কে প্রথম উচ্চারণ করেছিল? আনন্দ না শর্মিলা? ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু আজ আর সে খতিয়ান হাতড়ানো নিঃপ্রয়োজন। মুখে যেই আগে উচ্চারণ করে থাক, এটা যে একমাত্র সমাধান তা দৃজনে বোধ করি একই সঙ্গে উপলব্ধি করেছিল। শর্মিলা এতদিনে বিকাশের প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। বিকাশ আসছে। কালকেই তাহলে আবার কেন সে পুরানো অধ্যায় নতুন বরে খোলা? না, ঠিক পুরানো অধ্যায় নতুন করে খোলা নয়। শর্মিলা শুধু জানতে চায়, আনন্দ চিঠিতে কী লিখেছিল, কী তার বক্তব্য। দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ কী উদ্দেশ্য নিয়ে আনন্দ তার কাছে পাঠিয়েছিল চিঠি। যত যাই হোক বোঝাপড়াটা আনন্দ আর শর্মিলার। যা-কিছু সিংধান্ত তা তারাই নেবে, আর কেউ নয়। মা-দাদারা পরামর্শ দিতে আসেন ভাল কথা; কিন্তু তাকে না জ্ঞানিয়ে তার চিঠি পুড়িয়ে ফেলার অধিকার তো তাদের নয়নি শর্মিলা। এ ঠুঁদের অধিকারবাহিত্ব বাড়াবাড়ি। এ অপরাধের শাস্তি দিতেও শর্মিলা জানে। কাল সকালে ব্রেকফাস্ট টেবলে সে বলবে আজ দুপুরের টেনে আমি একবার বহরমপুর যাচ্ছি।

মা চমকে উঠবে। আগুন-ঝরা চোখ দুটো মেলে বলবে, মানে?

—মানে যে চিঠিখানা হঠাৎ পুড়ে গেল, সেটায় কী লেখা ছিল জেনে আসি।

মা নিশ্চয় জবাব দেবে না। গুম মেরে বসে থাকবে। নিটিং-এর কাটায়

পরপর কয়েকটা ঘর পড়ে যাবে হয়তো। বউদির হাত থেকে খানিকটা চায়ের লিকার ছলকে পড়বে টেবিলরূখে। রম্ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে বোকার মতো। আর দাদা বলবে, তুই কেপেছিস শম্? না, সেখানে আর তোর যাওয়া চলবে না।

শর্মিলা বলবে, একদিন চিরকালের জন্য যখন চলে যেতে চেয়েছিলাম তখন বাধা দিয়েছিলে তোমরা। তোমাদের সে বাধা আমি মানিনি। আর আজ তো শম্ একবেলার জন্য যেতে চাইছি, দাদা। কেন মিথ্যে বাধা দিচ্ছ?

মা গর্জন করে উঠবে, যা ইচ্ছে হয় কর। কিন্তু তাহলে এ ভাবে বিকাশকে না নাচালেও চলত।

শর্মিলা বলবে, প্রথমত আমি চিরদিনের মতো যাচ্ছি না, দ্বিতীয়ত বিকাশকে আমি নাচাইনি— নাচাচ্ছ তোমরা। সে দারিদ্র্য তোমাদের।

কিন্তু না, এ সব কী ভাবছে শর্মিলা? অহেতুক সে মায়ের সঙ্গে, দাদার সঙ্গে ঝগড়াই বা করতে যাবে কেন? একটু মাথা ঠান্ডা করে বিবেচনা করলে কি শর্মিলা বুঝতে পারে না—কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলেছেন স্বাগতা? শর্মিলা তো তার দুর্বলতাকে এখনও অস্বীকার করতে পারে না। সে যে এখনও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যে, আনন্দের বদলে বিকাশ তার জীবনে এলেই সে সুখী হতে পারবে। বিকাশ বড়লোক। কিন্তু কে জানে অভাবের মতো প্রাচুর্যও সুখী হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে কিনা। দুদিন আগেও সে রাজী ছিল না বিবাহ-বিচ্ছেদের বাবস্থায়। পনের দিন আগেও প্রত্যাখ্যান করেছে বিকাশের প্রচলিত ঐশ্বর্যভরা চিঠি। আজ, হ্যাঁ আজ সে রাজী হয়েছে। উপায়ান্তর-বিহীন হয়েছে সে রাজী হয়েছে। সমাজে সে তার মূখ দেখাতে পারছে না। দাদা-মা-রম্ ক্রমাগত তার কানে মন্তব্য দিয়ে চলেছে। নতুন কোন মন্দে যদি জাহাজ ভিড়তেই হয়, তাহলে দেরি করও আর উচিত নয়। ঘোবন কারও অভিমানের অপেক্ষায় বসে থাকে না। দীর্ঘ আত্মসমীক্ষার পরে সে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছে এতদিনে। বুঝেছে, আনন্দকে নিয়ে যে স্বপ্ন সে দেখেছিল তা বুদ্ধদের উপরের বর্ণচ্ছটার মতোই ভলীক। তাকে মূঠায় করে ধরা যায় না। ঘর বাঁধবার উপকরণ নেই আনন্দের ভালবাসায়। আর সে ভালবাসাটাই বা রইল কোথায়? আনন্দ জন্ম-উদাসী। খেলালী। চেষ্টার তো চুটি করেনি শর্মিলা। বুঝেছে নানানভাবে, বুঝতে দিয়েছে তাকে। দাম্পত্যজীবন একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট, একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া। দুটি ভিন্ন সত্তা, তারা দুনিয়ায় এসেছে ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্ন পরিবেশে—ভিন্ন ভিন্ন পথে তাদের পরিক্রমা, তবু জীবনের খানিকটা পথ, অন্তত সাতটা পক্ষের তারা একই ভালে একই ছন্দে অতিক্রম করবে—এই হচ্ছে দাম্পত্যজীবনের অঙ্গীকার। তুমি লেখাপড়া ভালবাস,

তুমি ইতিহাসে পদ্রাবত্তের অশ্বকার অলিতে-গলিতে পথ হাতের বেড়াতে আনন্দ পাও। ভাল কথা। বেড়াও। সে গলির মোড়ে তোমাকে হাত ধরে পৌঁছে দেব আমি। দাঁড়িয়ে থাকবে সেই অশ্বকার অচেনা গলির সামনে তোমার প্রতীক্ষায়, কখন তুমি ফিরে এসে আবার আমার হাত ধরবে বলে। কিন্তু আমিও যে আমার মতো করে অনেক কিছু ভালবাসি। আমি গম্ব কর্তে ভালবাসি, হাসতে ভালবাসি,—শাড়ি-গহনার নতুন নতুন প্যাটার্নের বিষয়ে আমার আছে অন্দুর্সম্বন্ধ—সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসের, সদ্যমুদ্রিত ছায়াচিত্রের উৎসাহতা নিয়ে আলোচনায় আমিও যে আনন্দ পাই। তুমি যখন ঐ আমার অচেনা গলিটা থেকে বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরবে তখন আমিও কেন আশা করব না আমার আনন্দলোকেও তুমি আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে? তোমার পাখুলিপির অ্যাপেন্ডিক্স আর সূচীপত্র যদি আমি করে নিতে পারি—তাহলে তুমিও আমাকে নিয়ে সিনেমা বাবার সময় পাবে না কেন?

আনন্দ অশ্ব হয়ে গেছে—মা দাদার কাছে এটাই সবচেয়ে বড় ব্যক্তি। হয়তো বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার বিচারকও সেটাকেই বড় করে দেখবেন। কিন্তু শর্মিলা তো জানে সেটা কোন বাধাই নয়। যে আনন্দকে সে প্রাক্‌বিবাহ-জীবনে চিনত—সেই ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে দেখা আনন্দ, সেই আউট্রাম ঘাটের ধারে বসে আনন্দ, সেই কফি-হাউসের আনন্দ যদি আজ ফিরে আসে তাহলে তার অশ্বত্বকে তুচ্ছ করে শর্মিলা লুটিয়ে পড়তে রাজী আছে তার পায়ের। কিন্তু তা আর হবার নয়। আনন্দ আবার নতুন করে অশ্ব হবে কি? সে তো জন্মান্বিত! মাঝে প্রেমের যাদু-শলাকার স্পর্শে মাত্র কয়েকটা মাস সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল। তার আগে আর পরে শুধু ঘোর অশ্বকার!

কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় কথা আছে। সে কথা আজও কেউ জানে না। আর সেই জন্যেই আজ বিনা আহ্বানে শর্মিলা গিয়ে দাঁড়াতে পারে না ঐ অশ্ব মানুষ্টার সামনে। আনন্দ এখন তাকে দেখতে পাবে না তবু সেই অশ্ব দৃষ্টির সামনে লজ্জায় সোঁকাচে কুঁকড়ে যাবে শর্মিলা। কিন্তু তার কী দোষ? তুমি জেদ করে যদি আগুন হাত বাড়ায় তাহলে বেহেতু আগুনটা আমি জ্বেলছি তাই আমিই দায়ী? তোমার জেদ দায়ী নয়? উত্তটাও তো হতে পারত—আনন্দ এ আগুন থেকে অক্ষত শরীরে ফিরে এসে যদি শুনত শর্মিলা হাসপাতালে মরতে বসেছে? কে দায়ী হত তখন?

আচ্ছা, উমা কি সব কথা জানে? নিশ্চয়ই জানে। শর্মিলা নিজের অবশ্য সে কথা আজও কাউকে বলেনি। রম্মকেও নয়, মাকেও নয়। বউদির গলায় ঐ জড়োয়া হারটা দেখলে আজও সে শিঠরে ওঠে। হারের দু'দিকে দুটো নীল পাথর আছে। সেদিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না শর্মিলা। মনে হয় নীলা তো নয়—ও দুটো মানুষের চোখের মণি! এ কথা কাউকে বলা যাবে না।

বিকাশকেও সে জানতে দেবে না সারাজীবনে । কিন্তু আনন্দ কি সে কথা এত সতর্কভাবে গোপন রেখেছে ? কেন রাখবে ? সে তো সহানুভূতির কাণ্ডাল এখন । অন্তত উমার কাছে সে সব কথা নিশ্চয় খুলে বলেছে । আর তাই উমা ছুটে এসেছিল কৈফিয়ত নিতে । আর ঠিক সেই কারণেই শর্মিলা সেদিন শত চেষ্টাতেও তার মন্থোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি ।

মাস আশ্টেক আগের কথা । মানে শর্মিলা চিরদিনের মতো আনন্দের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে আসার মাস কয়েক পরের ঘটনা । পর পর তিন-চারখানা চিঠি লিখেও জবাব না পেয়ে উমা নিজেই এসেছিল । উমা শর্মিলার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট, রম্মর বয়সী । আনন্দের বড় আদরের বোন । সে এসেছিল নিউ আলিপদুরের এই বাড়িতে । বসেছিল দোতলার ড্রয়িংরুমে । মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ফিরে গিয়েছিল । শর্মিলার দেখা সে পায়নি । শর্মিলা দেখা করেনি । স্বাগতা মেন্নেকে যেতে দেননি । বলেছিলেন, যা বলার তা আমিই বলব । বলেও ছিলেন তাই ।

মা পরে শর্মিলাকে বলেছিলেন, দূর সম্পর্কের কে এক দাদামশাইকে নিয়ে এসেছিল উমা । শর্মিলা জানে তিনি আর কেউ নন, রত্নেশ্বর মিশ্র—রতনদাদু । শর্মিলা স্বচক্ষে দেখেনি, কিন্তু আন্দাজ করতে পারে । রতনদাদু ছাড়া আর কে-ই বা আসবে ?

স্বাগতা ঘরে ঢুকতেই উমা এসে তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল । বলেছিল—ভাল আছেন তো মাএমা ?

উত্তরে স্বাগতা বলেছিলেন—তুমি বন্ধি আনন্দ মিস্ত্রির বাড়ি থেকে আসছ ?

উমা চমকে ওঠে । মাএমা কি তাকে চিনতে পারছেন না নাকি ? কিন্তু তিনি তো এর আগেও তাকে দেখেছেন, কথা বলেছেন । আনন্দের একটি মাস বোন, এত শীঘ্র ভুলে গেছেন তিনি ? একটু অবাক হয়ে বলে—আমাকে চিনতে পারলেন না ? আমি উমা ।

স্বাগতা এ প্রশ্নের জবাব দেননি । পিয়ানোর উপর লেসের ঢাকনাটা হাওয়ার সরে নড়ে গিয়েছিল । সেটাকে ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন হঠাৎ ।

উমা খুব কিছু লেখাপড়া শেখেনি । তবু বোকা সে নয়, এটুকু বুদ্ধিতে পারে এটা নিছক একটা বড়লোকি চাল । অবজ্ঞা প্রকাশের আভ্যাস । বসতে তাকে কেউ বলবে না । সে যে স্টেশান থেকে ট্যাক্সি করে সোজা এসেছে এ খবরটা স্বাগতার না-জানা থাকার কথা নয় । যে চাকরটা খবর দিতে গিয়েছিল সে সেটা দেখেই ভিতরে গেছে । একতলার ট্যাক্সি থেকে রতনদাদু মালপত্র নামাচ্ছেন, আর অনায়াসে উমা উঠে এসেছিল ঝড়লে, বিনা আহ্বানে । কুটুম বাড়—সে ইতস্তত করেনি । অত্যন্ত বিরত বোধ করল সে এককণে ।

মরিয়া হয়ে বলে—বউদি কোথায় ?

ধূরে দাঁড়ালেন স্বাগতা, বউদি মানে ? কার কথা বলছ ?

আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে উমার । গ্রামের মেয়ে সে, কগড়া করতে পিছপাও নয় । দাদার এই বিধবা শাশুড়ীটিকে সে কোন দিনই স্নানজরে দেখেনি । এই আধুনিকা বিধবা মহিলাটির সাজ-পোষাক, হাবভাব কিছই তার ভাল লাগত না । এই ন্যাকামি দেখে সে আর স্থির থাকতে পারে না, বলে—বউদি মানে আমার দাদার স্ত্রী । আপনার মেয়ে শর্মিলার কথা বলছি ।

স্ব কুঁচকে স্বাগতা বলেছিলেন—কিন্তু সেরিক তোমাদের বাড়ি ছেড়ে আসার সময় বলে আসেনি যে, পুরানো সম্পর্কের জের সে টেনে চলতে চায় না ?

উমাও কম যায় না । অতটুকু মেয়ে হলে কি হবে, কোণঠাসা হলে খরগোশও ফিরে আক্রমণ করে । মরিয়া হয়ে বলে—প্রবড় ব্যারিস্টারের বউ হয়ে আপনি এমন বেকাঁস কথাটা বলেন ? রেজিস্ট্রি-ম্যারেজের সম্পর্ক কি কারও খেয়াল খুশিতে উপে যায় ?

এতক্ষণে স্বাগতার দৈর্ঘ্যচ্যুতি ঘটে । তিনি বলে বসেন—তুমি বলসে আমার চেয়ে অনেক ছোট । সম্পর্কও । যদি ভদ্রভাবে কথাবার্তা না বলতে শিখে থাক—

বাধা দিয়ে উমা বলেছিল—সম্পর্কও ! সম্পর্ক তা হলে কিছ একটা আছে ? তা স্বীকার করে নিলেন ?

ব্যারিস্টারের বউ কে ? কথার প্যাঁচে এক ফোঁটা মেয়েটা তাকে এভাবে নাজেহাল করবে নাকি ? মিসেস বস একটা আগ্নেয়াগ্নির মতো ফেটেই পড়তেন হয়তো । কিন্তু তার আগেই মিস্ট্রি হাসি হেসে উমা বলে—দেখুন, আমি এতটা পথ এসেছি বউদির সঙ্গে দেখা করে যাব বলে । আমার দাদা অত্যন্ত অসুস্থ, বউদির সঙ্গে দেখা না করে, সব কথা না বলে আমি তো ফিরে যাব না ।

স্বাগতা এ দৃঢ়সংকল্পের সামনে কেমন যেন অসহায় বোধ করেন । তাড়াতাড়ি একখন্ড মিথ্যার আশ্রয়ে আত্মগোপনে প্রয়াসী হয়ে পড়েন—শমু বাড়ি নেই ।

কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে মরমে মরে গিয়েছিল শর্মিলা । ছি ছি ছি ! মা কেন মিছে কথা বলতে গেল ? সম্পর্ক যদি ছিন্ন করতেই হয়, তা হলে এ লুকোচুরির কী দরকার । এড়িয়ে গেলে তো চলবে না । সামনা-সামনি এসে বলতে হবে সব কথা । বলতে হবে—হ্যাঁ, ব্যারিস্টারের বউ ভুল করলেও ব্যারিস্টারের মেয়ে ভুল করবে না । সামাজিক সম্পর্কটা কীভাবে ছিন্ন করতে হয় তাও জানা আছে তার । আদালত থেকে যথাসময়ে সে নির্দেশ পাবে

তোমরা। কিন্তু কিছূভেই পর্দা সন্নিবেশে সে ঘরে ঢুকতে পারেনি। পা দুটো বেনমেকের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। না, মায়ের ভয়ে নয়—মায়ের মিথ্যা কথাটা ধরা পড়ে যাবে বলে নয়—শর্মিলার মনে হয়েছিল, উমা বোধ হয় সব কথা জানে। আনন্দ নিশ্চয়ই তাকে সব কথা খুলে বলেছে এতদিনে। আর সেই জোরেই উমার আজ এত তেজ। বাড়ি বয়ে ঝগড়া করতে এসেছে। না হলে স্বাগতের মধুমুখি দাঁড়িয়ে অমন বাঁকা-বাঁকা কথা বলার সাহস সে পায় কোথা থেকে? শর্মিলা ঘরে ঢুকলেই উমা জ্বলে উঠবে একেবারে। সরাসরি কৈফিয়ত তলব করে বসবে। বলবে—তুমি, তুমিই উপড়ে নিয়েছ আমার দাদার দুটো চোখ! আর তাই দিয়ে সাজিয়েছ তোমার বউদিকে! তাই আজ আমার দাদা অন্ধ! তুমি পালাবে কোথায়? দাদা আমাকে সব কথা খুলে বলেছে। যা ক্ষতি করে গেছ আমাদের তার খেসারত মিটিয়ে দাও আগে—তারপর সম্পর্ক মান ভালো, না মান, না। তখন কী জবাব দেবে শর্মিলা? যে-কথা আজও বাড়ির কেউ জানে না, সে কথাটা আছড়ে পড়বে ঘরের মেঝেতে। ছড়িয়ে পড়বে সেই মধুরোচক খবরটা নিউ আলিপুন্ডরের এ-বাড়ি থেকে সে-বাড়িতে। এ-পাড়া থেকে সে-পাড়ায়। তারপর যে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবে না শর্মিলার। মরতে আপত্তি নেই, কিন্তু কী অবমাননাকর হবে সে আত্মহত্যা! কিন্তু তার কী দোষ? সে তো সত্যিই দারুনী নয় আনন্দের আজকের এ দশার জন্য।

কিন্তু পরবর্তী কথোপকথন কানে যেতে উৎকর্ষ হয়ে উঠেছিল শম্ভু। উমা হেসে আবার বলেছিল—সত্যিই যদি বউদি বাড়ি না থাকত তাহলে আমি এখানে আপেক্ষা করতাম। আপনি বাড়ি থেকে তাঁড়িয়ে দিলেও বসে থাকতাম ফুটপাথের উপর, যতক্ষণ না সে বাড়ি ফেরে। কিন্তু মাপ করবেন মাঈমা, ট্যান্সি থেকে নামবার সময় আমি যে স্বেচ্ছা দেখতে পেয়েছি তাকে বারান্দায়। তাকে ডেকে দিন, বলবেন, বেশি সময় আমি নেব না।

স্বাগত বললেন—তবে তো বৃষ্টিতেই পারছ সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না, কথা বলতে চায় না। বলবে না।

উমা চুপ করে গিয়েছিল। এ কথার জবাব নেই।

ঠিক এই সময়েই রতনদাদু এক হাতে মিস্টার হাঁড়ি, অন্য হাতে একটা স্নাটকেশ নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। উমা তার অন্তরের সমস্ত নিরুদ্ধ আক্কেশ ঐ নিরীহ বৃদ্ধের উপর ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠেছিল, এগুলো আবার নামাতে গেলে কেন দাদু? তোমার কি কোনকালেই বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না?

ফ্যালফ্যাল করে বোকাম মত তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ।

—এঁরা আমাদের চিনতে পারছেন না। চল, স্টেশনেই ফিরে যাই।

রতনদাদু অবাক বিস্ময়ে একবার উমা একবার স্বাগতের দিকে তাকিয়ে

বলোছিলেন—চিনতে পারছেন না ! তাই তো ! তা এঁরা না চিনত, বউমা তো চিনবেন । তিনি কই ?

ঝাজিয়ে উঠেছিল উমা—না, তোমার বউমাও চিনতে পারছেন না আমাদের ।

রতনদাদু সাদাসিধে ভালমানুষ । তা হলেও ভিতরকার ব্যাপারটা কিছু কিছু জানা ছিল তাঁর । তিনি আনন্দের সম্পর্কে দাদু হন । আনন্দের পৈতৃক ভিটায় বহরমপুরেই থাকেন । নাতবউকে সত্যিই স্নেহ করতেন তিনি । আনন্দ বউ নিয়ে একবার কিছুদিন তার পৈতৃক ভিটায় গিয়ে বাস করেছিল । সেই স্বপ্ন পরিচয়েই বৃদ্ধ ভালবেসে ফেলেছিলেন তাকে । বড়লোকের মেয়ে বলে মনেই হয়নি তাঁর । অপারেশনের বিষয় সময় তিনি এর আগেও একবার এসেছিলেন এ বাড়িতে, সেবারও নাতবউ তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন ; কাছে বসিয়ে খাইয়েছিলেন । গল্প করেছিলেন । সেই বউমা আজ তার রতনদাদুকে একেবারে চিনতেই পারবে না, এটা মেনে নিতে পারছিলেন না বৃদ্ধ । কোনক্রমে বলেন—তা বউমার সঙ্গে একবার দেখাও কি হবে না ?

স্বাগতাকে আর পরিশ্রম করতে হয়নি । উমাই তাঁর হয়ে জবাব দিয়ে দেয় - সে কথা আর কী করে তোমাকে বোঝাব বল ?

রতনদাদু টাকের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—তাইতো, এখন ট্যান্সি পাওয়াও তো হাস্যামা হবে । তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে এ ট্যান্সিটাকে ছেড়ে দেওয়া ভুল হয়েছে আমার । কিন্তু, মানে এঁরা যে আমাদের একেবারে চিনতেই পারবেন না সেটা আমি ঠিক...

টাকের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বৃদ্ধ মাঝপথেই থেমে পড়েন ।

হঠাৎ কি খেয়াল হওয়ায় বলে বসেন—যাক, চল তাহলে যাওয়া যাক । তারপর উমার পরামর্শ না নিয়েই আবার করে বসেন এক কান্ড । সম্ভ্রমের হাঁড়টা স্বাগতের সামনে নার্মিয়ে দিয়ে বলেন—যা হোক, এটা রাখুন । নাতবউয়ের নাম করে এনেছিলাম, বসে বসে তার রতনদাদু দিয়ে গেছে ।

স্বাগতা শানিতস্বরে শুধু বলোছিলেন—না, ওটা আপনি নিয়ে যান ।

স্বাগতের সেই কণ্ঠস্বর যাকে এ-বাড়ির কেউ অমান্য করবার কথা কল্পনাও করতে পারে না । কিন্তু বৃদ্ধের উপর এ অমোঘ আদেশ কোন প্রতিক্রিয়াই করল না । বিবলকেশ বৃদ্ধিটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—সেটা আর পেরে উঠব না মিসেস বোস । যে অপমানের বোঝাটা চাপিয়ে দিয়েছেন কাঁধে, তাই বইতেই এ বৃদ্ধের পা টলছে । সে বোঝার উপর ওই শাকের আঁটিটা আর বইতে পারব না । আর তা ছাড়া ওটা তো আপনাকে দাঁছি না আমি । আমার নাতবউকে দেবেন আঁস্তাকুড়ে টেনে ফেলে দিতে হয় তা তিনিই দেবেন । এস উমা ।

উমা অবাক হয়ে গিয়েছিল। নির্বাক নিকটাত ভালমান্দুশ বলে থাকে জানা ছিল এতদিন, সেই রতনদাদুর মূখে এ ভাষা ঘেন আশাই করেনি। মস্ত-চালিতের মতো সে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে একতলায়।

ও-অখায়ের এখানেই শেষ। তারপর আজ প্রায় দীঘ' এক বছর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি ও-তরফ থেকে। এতদিন পরে যদিও বা এল একখানা চিঠি—মা সেটা পড়তেই দিল না।

কিন্তু একটা কথা। চিঠিটা তো আনন্দ স্বহস্তে রচনা করেনি। আনন্দ আজ দৃষ্টিহীন। স্বহস্তে চিঠি লিখবার ক্ষমতা তার নেই। তাহলে কাকে দিয়ে লিখিয়েছিল সে? রতনদাদু? না, উমা? যাকে দিয়েই লেখাক সংঘত ভাষায় বক্তব্য বলতে হয়েছে তাকে। কানে কানে ডাকার সেই বিশেষ নাম ধরে সম্বোধন করেনি নিশ্চয়। আচ্ছা, আনন্দ যদি আজ দৃষ্টিহীন না হত, তাহলেই কি সেই বিশেষ নামে পাঠ লিখত সে? গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে শম্ভুর এ মধ্যরাত্রি। কে জবাব দেবে এ প্রশ্নের?

সে প্রশ্নের জবাব আর কোনদিন পাওয়া যাবে না।

আশ্চর্য মান্দুশ ছিল আনন্দ। তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেও যেন নিস্তার নেই শর্মিলার। শেষ দিকের আনন্দ নয়, সেই প্রথম যুগের আনন্দ এখনও মধ্যরাত্রি আসে ওর ঘুম কেড়ে নিতে। আজও সারারাত ধরে সে কি শূদ্ধ আনন্দের কথাই ভাববে না কি? হ্যাঁ, তাই ভাববে। এই শেষ। কাল সকালেই এসে পড়বে বিকাশ। সে প্র্যাকটিকাল মান্দুশ, প্র্যাগম্যাটিক। কিন্তু ঠিক কি তাই? শর্মিলা যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে আনন্দের কাছে ধরা দিল তখন বিকাশ কোন অনুযোগ করেনি। নিঃশব্দে সে সরে দাঁড়িয়েছিল। স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে গিয়েছিল দীর্ঘতে, নিজের তদবির করে। তবু আশ্চর্য, অন্য কোন মেয়েকে সে বিয়ে করেনি। সমাজে মেয়ের তো আর অভাব নেই। অভাব নেই মেয়ের চাইতে তাদের মা-দের। তারা উভ্যন্ত করে তুলেছিল বেচারি বিকাশকে। দোষের মধ্যে তার চেহারা হ্যান্ডসম, পৈতৃক সম্পত্তি ততোধিক হ্যান্ডসম। এই দোষে শেষ পর্যন্ত বেচারিকে দেশত্যাগী হতে হতো। সে আজও প্রতীক্ষা করে আছে। শর্মিলা তাকে অস্বীকার করবে কেমন কর? 'উৎকণ্ঠ আমার লাগি বেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে!' তা ঠিক। তবু আজকের এই রাতটিকে সে শেষবারের মত খরচ করবে নিজের খেলারখুঁশি মতো। করুণ মূহূর্ত'গর্দলি গ'ড়ুঘভরে শেষবারের মত পান করবে সারারাত। কাল সকাল থেকে সে হবে অন্য মান্দুশ। বিকাশ, আজকের রাতটুকুর জন্য শর্মিলাকে তুমি ক্ষমা কর। ওর জীবনের একটি বছর যদি তুমি অস্বীকার করতে পার, তবে তার সঙ্গে এই একটি রাতিকেও তুমি অগ্রাহ্য কর। এ সব অবান্তর চিন্তা আর সে কোনদিন করবে না। এই একটি রাতের মতো তুমি ওকে মৃত্তি দাও!

ও একবার আপাদমস্তক অবগাহন করে নিতে চায় শেষবারের মতো স্মৃতির
স্বাগতমানে ।

ঘুম-না-আসা রাতে প্রথম প্রেমে স্মৃতির রোমন্থন করেছে কখনও ? কিছুটা
মনে পড়ে । কিছুটা পড়ে না । কিছুটা আবছা, কিছুটা উজ্জ্বল । কয়েকটা
ভুলে-বাওয়া কথা নতুন করে পাদপূরণ । মনে হয় বয়সটা পিছিয়ে গেছে
মস্তবলে । দেহটা পড়ে থাকে বিছানায়— দেহমুক্ত মন স্মৃতির সরণি বেয়ে আবার
ভুব দিয়ে আসে প্রথম প্রেমের স্রবণাধারায় । শিরশির করে ওঠে সারা শরীর,
চোখ মূদে আসে আবেশে । এক একটা দিন, এক একটা মূহূর্ত যেন ফিরে এসে
বলে আমার কথা ভোলনি দেখছি । তারপর কখন ওদ্ভাভুর স্মৃতিচারণ হঠাৎ
থেমে যায় । ফিরে আসে বাস্তবে, বর্তমানের কালে । বালিশটা ভেজা । নতুন
করে শুনতে পাও রাগিচর দেওয়াল-ঘড়িটার টক্-কারী ।

আনন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথাটা মনে পড়ল হঠাৎ । এ নিয়ে আনন্দ
যে কতবার কত প্রসঙ্গে ঠাট্টা করেছে তার ইয়ত্তা নেই । বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে
জনে শুনিয়েছে এ কাহিনী শর্মিলার উপস্থিতিতে । শর্মিলা রাগ করে বলত— এক
গম্প আর কতবার শোনাবে ?

আনন্দ দমবার পাত্র নয় । তৎক্ষণাৎ বলত— এটা যে ক্লাসিক পর্যায়ে গম্প ।
পুনরাবৃত্তিতে তো এর রসাম্ভাব হওয়ার কথা নয় ।

আনন্দের মূখে বারে বারে শূনে ঘটনার বিন্যাসগুলো শর্মিলা এখনও
আনন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পায় । মনে পড়ে যায় তার গম্প করার দৃশ্যটা,
বন্ধুমহলে, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে শম্ভুর দিকে তাকানোর ভঙ্গি । শম্ভু নিজের
যে ঐ খণ্ডকাব্যের নায়িকা তা যেন তখন আর মনে থাকে না ।

আনন্দ তখনও তার থিসিস্ জমা দেয়নি । ছাত্রই সে । বছর চব্বিশ
বয়স । থাকে বাদুড়বাগানের এক মেসে । সারাদিন শম্ভু বিশ্ববিদ্যালয়,
লাইব্রেরী আর জাতীয় গ্রন্থাগারে পড়ে থাকে । দোহারা চেহারা, চুলগুলো
উশকোখশকো, অযত্নালিত । চোখে একটা মোটা জেমের চশমা । কাচটা
জেমের চেয়েও মোটা । সাধারণত পায়জামা আর পাজাবি পরে থাকতে সে
ভালবাসে । কাঁধে ঝোলে গেবুয়া রঙের একটা শালিকিকেন্তনী কাজকরা ব্যাগ ।
তার মধ্যে ওর নথিপত্র । কিছু সাদা কাগজ, কিছু লেখা, দু একটি বই ও
নোট বই । শর্মিলা তখন প্রেসিডেন্সীতে পড়ে, সেকেন্ড ইয়ার । সকালবেলা
আলিপূর থেকে গাড়ি করে কলেজে আসে, আর বিকালে আবার বাড়ির
গাড়িতেই ফিরে যায় । কোন কোনদিন বাড়ির গাড়ি যায় না, সেদিন ট্যাক্সি
করে । বিকাশ তখনও আসতে শম্ভু করেনি ব্যারিস্টার বোসের বাড়িতে ।

সেদিন আকাশ জুড়ে নেমেছিল বৃষ্টি । বৃষ্টি-বৃষ্টি আর বৃষ্টি । আর তার
সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া । বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই । ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে

অনেকক্ষণ। বাসে তিল ধারণের ঠাই নেই। রাজাঘাটে হাটুজল। মটোর গাড়ির উৎকণ্ঠ জলের আক্রমণ থেকে বাঁচবার প্রেরণায় হ'টর উপর কাপড় তুলে জুতো-হাতে পথচারীর দল সন্তপ্ণে পারাপার হচ্ছে রাজ্য। নিত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া পথে নামছে না মানুষ। বাজার-হাট বসেন। ঘরে ঘরে বোধ করি খিচুড়ি। পাকের রেলিঙে একজোড়া ভিজে কাক। পালকের মধ্যে ঠোঁটের খোঁচা মেরে গা সাফা করছে। রাজ্যের ওপাশে হিন্দু স্কুলের রোয়াকে বসে দুটি ছেলে কাগজের নৌকা ভাসাচ্ছে। বিবাবাদ্যলয়ের গেট থেকে বেরিয়ে একটা কার্নিশের তলায় প্রথম দফায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল আনন্দকে। সেই জলেভেজা পায়জামা আর পাঞ্জাবি—বাঁধে সেই গেরুয়া রঙের ব্যাগ। মোটা চশমার কাছে বার বার জল লেগে যায়। খুলে মুছে চোখে দিতে হচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে। আনন্দ একবার রাজ্যের দিকে, এববার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে। কালো কালো মেঘে আকাশ এখনও ছেয়ে আছে—অঝোর ধারাল ঝরছে বৃষ্টি। কলেজ স্ট্রীটে, বক্সিম চ্যুট্বেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকান বসেন; ফুটপাথের উপর সামান্দ্রিক জ্যোতিষের ছক বেটে তিলবধারী যে বৃদ্ধটি তাঁথের কাকের মতো রোজ বসে থাকে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মূর্তির কাছাকাছি। সেও এ সমুদ্রে হারিয়ে গেছে কোথায়। মনে হচ্ছে সারা বঙ্গোপসাগর বৃষ্টি আকাশপথে তেড়ে এসেছে কলকাতা শহরকে ভাসিয়ে দেবে বলে।

আনন্দের জরুরী কাজ ছিল। কাল পরশু ছুটি। ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে রিজার্ভে রাখা বই দুটি ইস্যু করিয়ে না নিলে ছুটির দিন-দুটোয় পড়াশুনায় ব্যাঘাত হবে। কিন্তু কোথায় কলেজ স্ট্রীট আর কোথায় সেই আলিপূর। মাঝখানে এই মহাসমুদ্র। যাবে কেমন করে? হ্যারিসন রোডের মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালে হয়। ওখানে বাসগদূল অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। যদি সন্ধ্য হয় বাসের রডের সঙ্গে 'একটুকু ছোঁওয়া লাগে' সম্পর্ক পাতাতে। যদি সার্থক হয় বাসের পাদানির উদ্দেশ্যে গাওয়া প্যারাড়ি 'চরণ রাখিতে দিও গো আমারে, দিও না দিও না ফিরিয়ে।'

একটা উজানগামী ডবলডেকার কাকে-খাই কাকে-খাই করতে করতে বেরিয়ে গেল জল কেটে। তিল ধারণের ঠাই নেই তাতে। ঘরমুখো মানুষগুলো বেপরোয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঝুলতে ঝুলতে চলেছে বাসের হাতল ধরে। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ বিঘটিত হলে অবধারিত মৃত্যু। তবু ভ্রক্ষেপ নেই যেন ওদের। ওরা কি সবাই অভিসারে চলেছে? বিশ্বমঙ্গলের মতো সপে' রঞ্জধম হলেও খেয়াল নেই। না হলে বাসের ওই চকচকে মৃত্যুদণ্ড ধরে কেমন করে কোলে ওই ঘরে-ঘেরা মানুষগুলো? মনে মনে হাসল আনন্দ—এই কলকাতা শহর, এই মধ্যবিস্তার সংসার। এই সংসারের প্রেমে মানুষগুলো নিত্য দু'বেলা বিশ্বমঙ্গল সাজে।

হঠাৎ এ দার্শনিক চিন্তায় বাধা পড়ে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আনন্দ। এ কী !
খালি ট্যাক্সি ! হ্যাঁ, তাই তো !

ট্যা—ক্—সি !

আশ্চর্য কান্ড। ঘ্যাচ করে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাক্সিটা ফুটপাথের কিনারে।
আনন্দ তার কাছাকাছি গিয়ে পেঁছবার আগেই দূপাশ থেকে দুজন ছুটে এসে
দুদিকের দরজার হাতল চেপে ধরে। বেচারী আনন্দ ! এসব বিষয়ে সে
চিরকালই অপটু। শান্তিপ্রিয় মানুষ। পিছিয়ে আসে সে। দূপাশের দুজন
ততক্ষণে বচসা শুরু করে দিয়েছেন। ট্যাক্সির সাময়িক মালিকানা নিয়ে।
দুজনেরই বক্তব্য তিনি আগে ডেকেছেন। শেষ পর্যন্ত একজন বলেন, বেশ তো
মশাই ড্রাইভারকেই জিজ্ঞাসা করুন না কার ডাকে সে পার্ক করেছে
গাড়ি।

—করুন, তাই করুন। দ্বিতীয় জন সালিশিটা মেনে নেয়।

আর অমানবদনে ছোকরা ড্রাইভারটি বলে বসে যার ডাকে গাড়ি
থামিয়েছি তাঁকে তো কাছেই ভিড়তে দিচ্ছেন না আপনারা দুজন। আনন্দকে
দেখিয়ে দেয় ছেলোটি।

ঠিক এই সময়েই আর একটি উপচীষমান বিতল দৈত্যান এসে স্টপেজে
ভিড়ল। কয়েকজন নামছেন, দুজন প্রতিযোগীই রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটলেন সৈদিক
পানে। আঃ বাঁচা গেল। ট্যাক্সিটার উপর এখন আনন্দের নিরঙ্কুশ অধিকার।
ছেলোটি বলে—চটপট উঠে পড়ুন স্যার, নাইলে আবার কোন ভেজাল জুটে
যাবে। যাবেন কোথায় ?

—আলিপুর। কিন্তু তোমার পিছনের সীটটা আর ভিজাব না আমি।

ড্রাইভারের পাশেই উঠে বসে আনন্দ। জুতো জোড়া ছিল হাতে, নামিয়ে
রাখে পায়ের কাছে। ট্যাক্সিচালক বাঙালী। অম্প বয়স। ন্যাকড়া দিয়ে
সামনের কাচখানা মূহুতে মূহুতে বলে খুব তাড়াতাড়ি আছে স্যার ?

—না। কেন বলতো ?

—এক কাপ চা গিলে নিতুম তাইলে। হাত পা সব ধেন কালিয়ে গেছে।

—বেশ তো, থেয়ে নাও। এমন কিছ্ তাড়াতাড়ি নেই আমার। ঐ তো
চায়ের দোকান।

—বাঁচলেন স্যার। বাসস্টপ বাঁচিয়ে গাড়িটা পার্ক করে ছোকরা ড্রাইভার
হাট্টির উপর কাঁপড় তুলে ছপ্ ছপ্ করে জল ভেঙে এগিয়ে যায় চায়ের দোকানের
দিকে।

—আরে তোমার মিটারটা নামিয়ে দিলে যাও।

আবার ফিরে আসে ছেলোটি। দরজার উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে ভিজতে
ভিজতে বলে—এটা কী রকম কথা হল স্যার ? আমি খাব চা, আর ট্যাক্সির

মিটার উঠবে আপনার ? এতটা অক্লান্ত ভাববেন না আমাকে ।

—ও আচ্ছা আচ্ছা । ঠিক আছে । যাও যাও, আর ভিজো না শব্দ শব্দ ।

জল কাদা ভেঙে ছেলোট এক ছুটে চলে যায় চায়ের দোকানের দিকে । উপরে পানবিড়র দোকান, নিচে চটের কাঁপ ফেলা চায়ের আয়োজন । তোলা উনুনে ভাড়ের চা । চটের পর্দা সরিয়ে ছেলোট ঢুকে যায় ভিতরে ।

নাঃ । পাঞ্জাবিটা একেবারে ভিজ্ঞে গেছে । আনন্দ একটু ইতস্তত করে খুলে ফেলে সেটা । মেলে দেয় সীটের উপর । বৃষ্টির ছাঁট আসছে বাঁ দিক ঘেঁষে । কাচটা তুলতে গিয়ে দেখে সেটা ভাঙা । সরে এল ডাইনে—প্রায় স্টিয়ারিংয়ের মুখোমুখি । ভিজ্ঞে পাঞ্জাবির পকেট থেকে উদ্ধার করে চারমিনারের প্যাকেটটা । আর দেশলাই । রুমালে জড়ানো ছিল বলে ও দুটো খুব কিছু একটা ভেজেনি । আশা আছে বাকি কটা সিগ্রেট খাওয়া চলবে । বহু আশ্বাসেও কিন্তু জলল না ভিজ্ঞে দেশলাই । ক্রমে আনন্দ বিরক্ত হয়ে ওঠে । হাতের তালুতে ঘষে ঘষে তৃতীয় কাঠিটা জালাবার উপক্রম করতেই খুঁট করে শব্দ হল পিছনে । সবে জলেছে কাঠিটা । সন্তপণে সিগ্রেটটা ধরাতে যাবে, পিছনের সীট থেকে বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হল—নিউ আলিপদ্র ।

যাঃ ! কাঠিটা নিবে গেল ।

বিরক্ত মুখটা আর ঘোরাতে হল না । সামনে ডায়সবোর্ডের উপরে লটকানো ছোট্ট আয়নাটার ফুটে উঠেছে পশ্চাদ্‌পটের দৃশ্য । দেখা যাচ্ছে পিছনের সীটে বসে আছেন একজন আধুনিক । নোটের খাতা আর কী একখানা চটি বই রেখেছেন সীটের পিছনে উঁচু খাপটার । হাতব্যাগ খুলে একটা রুমাল বার করে হাতের মুখের জলবিন্দুগুলি মুছতে বাস্ত । চুল বেয়ে দ্রুত এক ফোঁটা জল এখনও ঝরছে কোলের উপর ।

হত হবে ? আঠারো না উনিশ ? নিঃসন্দেহে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বেরিয়েছে । কলেজের ছাত্রী । বড়লোকের মেয়ে, পোশাক পরিচ্ছদ হাবভাবেই তার বিজ্ঞাপিত । বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা । বেচারি বোধ হয় অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছে বাসে ওঠার । ট্রাম বন্ধ, বাসে প্রচণ্ড ভিড়, হয়তো বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্ঞে এখানে । তাই হবে । রাউন্টটা একেবারে ভিজ্ঞে গেছে । আনন্দের মতো ও বেচারি তো আর সেটা খুলে মেলে দিতে পারবে না । গায়েই শুকোতে হবে জামাটা । দেশলাইয়ের চতুর্থ কাঠিখানিকে হাতের তালুতে তোয়াজ করতে করতে আনন্দ ভাবিছিল, এ মেয়োটকে নেমে যেতে বলা নিতান্ত অভদ্রতা হবে । সে যাবে আলিপদ্র ও নিউ আলিপদ্র ! ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আনন্দ নেমে গেলে মেয়েটি অনায়াসে বাকি পথটুকু চলে যেতে পারবে এই ট্যান্সি নিয়ে । অনেকক্ষণ তোয়াজের পর চতুর্থ কাঠিটা জালাবার চেষ্টা করে আনন্দ । জ্বলছে ।

সতর্পণে সিগ্রেটটা ধরতে বাবে, পিছন থেকে আবার ধমক শোনা গেল, আচ্ছা অভয় তো তুমি ! দেখছ পিছনে মহিলা শোরারি বৃষ্টিতে ভিজ়ে কাঁপছে আর তুমি ফস ফস করে সিগ্রেট খাচ্ছ ?

যাঃ ! কাঠিটা নিবে গেল আবার !

—চল, চল, আর দেরি কর না ।

বিনা বাক্যব্যয়ে আনন্দ তখন পঞ্চম কাঠিটার তারিফ করছে ।

—আচ্ছা অসভ্য তো তুমি ! ট্যান্সি ছাড়বে কিনা বল ?

হঠাৎ মেজাজ খিঁচড়ে যায় আনন্দ্র । ষাড় বৃষ্টির রক্তস্বরে বলে নেমে যান । এ ট্যান্সি বাবে না ।

—যাবে না ! ইয়ার্কি নাকি ! যেতে তুমি বাধ্য । চল বলছি ।

আনন্দ্র মনে মনে এতক্ষণ একটু কৌতুক বোধ করছিল । মেয়েটি তাকে ট্যান্সি চালক ভেবেছে । মেয়েটির দোষ নেই, সে যেমন গেঞ্জি গায়ে স্টিয়ারিংয়ের সামনে জুত করে বসে আছে তাতে তাকে তাই ভাবতে হয় । কিন্তু তাই বলে একি ব্যবহার ! ট্যান্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে যে মেয়ে এমন ভাষায় কথা বলে তার বৃষ্টিতে ভেজাই উচিত । আনন্দ্র স্থির করে, না, কিছুতেই সে এ ধরনের নাক-উঁচু মেয়েকে লিফট দেবে না । দেখতে সদৃশ্রী বলে ও বোধ হয় ধরাকে সরা জ্ঞান করে । না, কোনও করুণা করবে না আনন্দ্র, বলে—নেমে যান গাড়ি থেকে । এ ট্যান্সি বাবে না । ভাড়া হয়ে গেছে ।

—ভাড়া হয়ে গেছে ! ইয়ার্কি নাকি ? মিটার নামানো নেই, প্যাসেঞ্জার নেই—বললেই হল ভাড়া হয়ে গেছে ? মগের মূগ্ধক পেয়েছে ?

আনন্দ্র ছোট কাচের ভিতর দিবে দেখতে পাচ্ছে মেয়েটিকে । কাঁপছে সে । রাগে না শীতে ?

—তুমি বাবে কি না ?

—না । আপনি দয়া করে নেমে যান ।

—নেমে যান ! কতদিনের লাইসেন্স তোমার ? তোমাকে পদ্রলিগে দিতে পারি, তা জ্ঞান ?

আনন্দ্র এবার ষাড়টা বৃষ্টির মৃণোমুখি তাকায় । বলে —আপনি যাবেন ? দয়া করে ডেকে আনুন না । ঐ মোড়ের মাথায় পদ্রলিগ আছে । ডাকলেই আসবে । পদ্রলিগ ছাড়া আপনাকে নামানো বাবে না তা বুঝেছি । কিন্তু যা বৃষ্টি, পদ্রলিগ ডাকি কি করে ?

রাগে হোক, শীতে হোক সত্যি থরথর করে কাঁপছে মেয়েটি । ছাতাটা নিয়ে নেমেই পড়ে সে জলের মধ্যে । বলে—তোমার মতো লোকের শান্তিই হওয়া উচিত । দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি ।

ছাতাটা খুলে এগিয়ে চলে সে মোড়ের দিকে । এমনতেই সদ্য খোলা

সোড়ার বোতলের মতো পেটের মধ্যে হাসির বড়বড়ি কাটছে, তার উপর ঠিক এই সময় ঘটল আর একটা ছোট দর্শনা। বিধাতার রসিকতাবোধ আছে। হঠাৎ দমকা হাওয়ান্ন রঙিন বেষ্টে ছাতাটা গেল উল্টে। ছাতা উল্টে গেলেই মানব বিব্রত হয়ে পড়ে। সে দৃশ্য দর্শককে হাসির খোরাক যোগায়। তার উপর ছত্রধারী যদি হোন ক্রোধোন্মত্তা একজন সিন্ধবসনা আধুনিকা তখন সে গগনভেদী হয়ে ওঠায় কী অপরাধ? হলও তাই। হো হো করে হেসে উঠল আনন্দ। মেয়েটি ঘুরে দেখল একবার। দৃঢ় চোখ দিয়ে তার আগুন ঝরছে। মোজার দাঁড় মসজিদ পর্যন্ত, মেয়েদের মোড়ের পর্দা, ভাবলে আনন্দ। মোড়ের পর্দা সটিরই শরণাপন্ন হল মেয়েটি। পর্দা নয়, সাজেস্ট।

এইবার ধরানো গেছে সিগ্রেটটা। আঃ, কী আরাম। মেজাজটাও খুশী হয়ে উঠেছে এতক্ষণে। আহা, বেচারিকে কষ্টটা না দিলেই হত। ভাঙা-কাচ জানলা দিয়ে দেখা যায় বীরাজনার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে ছপছপ করতে করতে এগিয়ে আসছেন আরক্ষাপদ্রব। আরাম করে প্রায় শুষেই পড়ে আনন্দ। নাটকটা জমছে ভাল। ভালই লাগছে ওর। সেই ট্যান্সি-ড্রাইভার ছোকরা এ অসময়ে এসে পড়ে যেন রসভঙ্গ না করে।

—আপকো লাইসেন্স?

যাক সাজেস্ট-সাহেবের তবু ভদ্রতাবোধ আছে। আধুনিকার কাছে লাইসেন্সও সেন্স হারাননি। ‘তোম’ নয়, ‘আপ’।

—কিসের লাইসেন্স?

—কিসের আবার? ড্রাইভিং লাইসেন্স।

একমুখ খোঁয়া ছেড়ে আনন্দ হেসে বলে - নেই।

—নেই! নেই মানে?

—নেই মানে জানেন না? হিন্দিতে ‘নেহী হ্যায়’, সংস্কৃতে ‘নাষ্টি’, ইংরেজিতে ‘হ্যাভন গট!’

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

—আরে এ তো মহা ঝামেলা দেখি। চার চারটে ভাষায় বললাম, তবু বদ্বলেন না?

—লাইসেন্স নেই তাহলে ট্যান্সি চালাও কি করে? ইয়াকি নাকি?

আনন্দ ড্যাসবোর্ডের ওপর খোয়ার রিং ছাড়ছিল। এ কথায় চকিত হয়ে একবার জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায়। চাকাটাকে দেখে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে বলে — ভয় পাইয়ে দিলেন স্যার! নাঃ, চাকা ঘুরছে না। ট্যান্সি চালাচ্ছি কে বললে? স্ট্যান্ডে-রোখা ট্যান্সিতে বসে সিগারেট খাচ্ছি মাত্র।

সাজেস্ট পকেট থেকে বার করলে নোটবই আর পেম্পসল। গাড়ির নম্বরটা লিখে নিতে নিতে বলল—তুমি একে তোমার ট্যান্সিতে নিয়ে যেতে আপত্তি

করেছে ?

—কাকে ? - আনন্দ ঘুরে বসে ।

—এঁকে ?

—আনন্দ ভাল করে আপাদমস্তক জলে ভেজা মেয়েটিকে দেখে নিল । রাগে অপমানে মেয়েটি যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে । মৃণ্মুখটা ঘুরিয়ে নেয় সে ।

আনন্দ এতক্ষণে বলে—হ্যাঁ ।

—কেন ?

—আমার খুঁশি ।

—খুঁশি ! তুমি সজ্ঞানে বে-আইনি কাজ করছ তা জান ?

—না, জানি না । আমার আইনজ্ঞান যদিচ অল্প ।

—তোমার রসিকতা যে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তা জান ?

আনন্দ একগাল হেসে বলে—তাও জানি না সার্জেণ্ট সাহেব । লাইসেন্স না থাকলেও সেন্স অফ হিউমারটা আমার খুব প্রখর ।

মেয়েটি আর নিজেকে সামলাতে পারলে না । দাঁতে দাঁত দিয়ে গর্জে ওঠে — এ রকম লোকের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত ।

হো হো করে হেসে ওঠে আনন্দ ।

—হাসছ কেন অসভ্যের মত । ধমকে ওঠে সার্জেণ্ট ।

—এঁর সেন্স অফ হিউমারটা আমার চেয়েও বেশি বলে । যার লাইসেন্স নেই, উনি তার লাইসেন্স বাতিল করে দিতে চান । এর চেয়ে ক্লাসিকাল হিউমার স্বয়ং জি. বি. এস এর মাথাতেও আসত না ।

সার্জেণ্ট সে-কথায় কান না দিয়ে বলে—তুমি বলেছ এঁকে যে তোমার এ ট্যাক্সি আগেই ভাড়া হয়ে গেছে ?

গম্ভীর হয়ে আনন্দ বলে—এক্স্যাক্টলি ! তাই বলেছি আমি ।

—কই ? কে ভাড়া করেছে ?

—আমি ।

—মানে ?

—হায় খোদা ! আমি মানে 'আমি । হিন্দিতে মায়, সংস্কৃতে অহম্, ইংরাজিতে আই ।

—হোয়াট ডু য়ু মীন ?

—এবার আমি নাচার সার্জেণ্ট সাহেব ।

ঠিক এই সময়েই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল ছোকরা ড্রাইভার । হাতের খালি ভাড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাছে এসে বলে—এ আবার কি বখেড়া স্যার ? পদলিখ কেন ?

—তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ঠুকে দেখাও—আর এঁকে বল যে, আমি

পূর্বেই তোমার ট্যান্সি ভাড়া করেছি ।

—এ ট্যান্সি তোমার ? —সার্জেণ্টের প্রশ্ন নবাগতকে ।

—হ্যাঁ স্যার । ভয়ে ভয়ে লাইসেন্সটা বার করে বেচারি ।

—আর ইনি তোমার ট্যান্সি ভাড়া করেছেন ? —খাদে নামছে স্বরটা ক্রমশ ।

—হ্যাঁ স্যার ।

—ইয়ে, তবে সামনের সীটে ওখানে ঠুকে বসিয়েছ কেন ? —কণ্ঠস্বর এবার নিখাদে ।

হো হো করে আবার হেসে ওঠে আনন্দ । বলে, এতক্ষণে একটি আইনসঙ্গত কথা আপনি বলেছেন সার্জেণ্ট সাহেব । প্যাসেঞ্জারকে সামনের সীটে বসানোর অপরাধে ওর সাত মাসের ফাঁসি হওয়া উচিত ; এবং বসার অপরাধে আমার না-থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল ।

অপ্রস্তুত সার্জেণ্টটি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে ছোকরাকেই বলতে থাকে—উনি ভাড়াই যদি করে থাকেন তাহলে মিটার নামাওনি কেন ?

—আমি একটু চা খেতে চাইলুম । উনি বললেন, যাও, খেয়ে এস । তা আমি ভাবলুম আমি খাব আর ওঁর মিটার উঠবে এ কেমন কথা ?

সত্যই ভদ্রতাবোধ আছে সার্জেণ্ট সাহেবের । আনন্দের দিকে ফিরে বলেন—আরাম করি ।

আনন্দ বললে—যু অট টু বি । আপনি নিজে সার্ভ চড়ালে বনেন সার্জেণ্ট, খুললে বনেন ভদ্রলোক । আর আমার খেলায় পাজিবি চড়ালে ভদ্রলোক, আর খুললে আপসে তোম !

পিছনের পাল্লাটা খুলে দিয়ে মেয়েটিকে ডাকে, আসুন—মেয়েদের সামনে সিগ্রেট খেলেও একেবারে অসভ্য বর্বর আমি নই । অন্তত এই দরমোগে গঙ্গাসাগরে নবকুমারীকে বিসর্জন দিয়ে পালাব না । উঠুন, আমিও আলিপূরের দিকেই যাব ।

মেয়েটি তখনও কাঁপছে । শীতে, রাগে না লজ্জায় ?

হয়তো তবু সে কিছু বলত, হয়তো প্রত্যাখ্যান করত এ আহবান, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার কেঁপে জল এল । সার্জেণ্ট ছুটল ও ফুটপাতে ।

আনন্দ বললে—হে মাধবী বিধা কেন ?

ভারি ফকর তো ছেলেটা ! শর্মিলা মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল । হ্যাঁ, ভুল সে করেছে, মর্মান্তিক ভুল ; কিন্তু তাই বলে নবকুমারী, মাধবী—এসব কী ? কিন্তু ইতস্তত করবার সময় নেই । মরিয়া হয়ে সে উঠে বসে ট্যান্সিতে ।

ছাড়ল ট্যান্সি ।

কলেজ স্ট্রীট—ওয়েলিংটন—ধর্মতলা—

মুখ না ধুয়েই আনন্দ বলে—সিগ্রেট-গন্ধ সহ্য হয় না বন্ধি ? আচ্ছা

এটা ফেলেই দিই ।

জানলা দিয়ে ফেলে দেয় অর্ধদণ্ড সিগ্রেটটা । শর্মিলা চুপচাপ বসে আছে ।
চোরঙ্গী—ভবানীপদ—

আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আনন্দ বলে—আমি নামব ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে
আপনি ?

শর্মিলা তবু জবাব দেয় না । আনন্দ এবার পিছন ফিরে বলে নিউ
আলিপদ্র যাবেন তো ?

ময়োট বললে—না । আমিও ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে নামব ।

—ও ! তবে তো কথাই নেই ।

আর কোন কথা হয়নি গাড়িতে । ঐ ছোকরা ড্রাইভারের সামনে আর কিছু
বলতে চায়নি শর্মিলা । কিন্তু তার মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের কাছে জনান্তিকে
ক্ষমা চেয়ে না নিলে যেন তার শ্রাস্তি নেই । ছি ছি ছি ! ভদ্রলোককে যা নয়
তাই বলেছে । কী মর্মান্তিক ভুল !

ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গাড়ি দাঁড়াবার আগেই ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে টাকাটা
বার করে রেখেছিলো শর্মিলা । বৃষ্টিটা একেবারে না ধরলেও কমে গেছে ।
দ্রিমি দ্রিমি বোল আর নেই । ইলসেগুড়ির ছিটে । আনন্দ প্রতিবাদ করবার
উপক্রম করতেই শর্মিলা বলে—তা হয় না ।

আনন্দ বিরুদ্ধ করেনি ও বিষয়ে, বলে আপনার না নিউ আলিপদ্রে
যাবার কথা ? এখানে নেমে পড়লেন যে ?

ট্যান্ডিটা ব্যাক ধরেছে । আর লজ্জা করে লাভ নেই । শর্মিলা বলে,
আপনার সঙ্গে যে অভদ্র ব্যবহার করেছি সে জন্য ক্ষমা চেয়ে না নিলে আমি
শাস্তি পাব না ।

—অভদ্র ব্যবহার !—আনন্দের চোখে বিস্ময় । তারপর যেন হঠাৎ মনে
পড়ে যায় ওর । হো হো করে হেসে ওঠে আবার । কৌতুককর ঘটনাটা ভুলেই
গিয়েছিল বুদ্ধি । বলে, এর জন্য আমার চেহারা-ই দায়ী ।

পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে চণ্ডা সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে উঠতে থাকে ।
শর্মিলাও অস্ত্রে অস্ত্রে উঠে আসে তার সঙ্গে । আনন্দ বলে—এর আগে এসেছেন
কখনও ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে ?

—না তো ।

—আচ্ছা ! আপনি ছাত্রী তো ? প্রেসিডেন্সিসর ? কোন ইয়ার ?
সায়ান্স না আর্টস ?

হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সিসই । সেকেন্ড ইয়ার, আর্টস ।

—অথচ কখনও ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আসেননি ? চিড়িয়াখানা দেখেছেন ?
শহরের সব কটা সিনেমা 'হল' ?

শর্মিলা অবাক হয়ে যায়। এ যে রীতিমত ধমক দিচ্ছে! লোকটার মাথার ছিট আছে নাকি? ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শর্মিলা।

আনন্দ হঠাৎ ঘুরে বলে—আবার দাঁড়ালেন কেন? এলেন যখন তখন জন্মের শোধ একবার দেখেই যান, জাত বাবে না।

শর্মিলা আবার চলতে শুরু করে। লাইব্রেরী দেখার শখ যতটা, এই অস্তুত মানুষটাকে আরও ভাল করে দেখার ইচ্ছেটা তার চেয়ে কম নয়। মূখে বলে—চলুন, দেখেই যাই। মন্দিরের দোরগোড়া থেকে ফিরে যাওয়া ঠিক নয়।

একগাল হেসে আনন্দ বলে—তা সত্যি! মন্দিরই! কত সহস্রাব্দীর সাধনা এখানে আশ্রয় পেয়েছে। দেশে বিদেশে যুগে যুগে মানুষ যা ভেবেছে, যা উপলব্ধি করেছে তা এখানে ধরে ধরে সাজিয়ে রাখা আছে। ভেবে দেখুন, যেসব যুগে আমরা বাস করিনি, যেসব মানুষকে দেখিনি, জানি, না তাঁদের কণ্ঠস্বর এখানে অমরত্ব লাভ করেছে। অসংখ্য জ্ঞানীগুণী পাণ্ডিত্যের জয়ের কথা পরাজয়ের কথা, লাভক্ষতির কথা তাঁরা অক্ষরের শৃঙ্খলে বেঁধে এখানে গচ্ছিত রেখে গেছেন। যাকে দেখা যায় না, যাকে ধরা যায় না, তাকেই দেখবার, দেখাবার আর ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। একে আপনি মন্দির বলতে পারেন।

শর্মিলা আনন্দের পায়ে পায়ে সে গ্রন্থ-মন্দিরে প্রবেশ করে। প্রকাণ্ড হল ঘর। মাঝখানে কার্পেট পাতা। দু-পাশে বেতের আরাম কেদারা। আর তারপরে ছাদ-ছোঁওয়া বইয়ের র্যাক। দু-দু-একটি বুদ্ধমূর্তি। ধূপ ধনো নেই, তবু কিসের যেন একটা মৃদু গন্ধ। এ গন্ধ পুরনো বইয়ের। প্রাণ ভরে সেই মৌরভ গ্রহণ করল শর্মিলা। চিন্তা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে সহস্র বৎসরের জ্ঞানী গুনীদের সাধনাকে ধরবার ক্ষমতা ওর নেই—তাই বোধ দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে তাকে স্পর্শ করবার জন্য একটা আকুলতা জাগে মনে।

আনন্দ ওর কানে কানে বললে—The gloomy recess of an ecclesiastical library is like a harbour, into which a far-reaching curiosity has sailed with its freight and cast anchor.

শর্মিলা বলে—পুরানো বইয়ের কী চমৎকার একটা গন্ধ আছে, না?

আনন্দ সেকথায় কান না দিয়ে বলেই চলে—The ponderous tomes and bales of the mind's merchandise, odours of distant countries and times steal from the red leaves the swelling ridges of vellum, and the tittles in tarnished gold.....

শর্মিলা হেসে হেসে বলে—আপনি কলেজে ইংরাজি পড়ান বুঝি?

আনন্দ এতক্ষণ অস্বস্তি ছিল। হঠাৎ ওর কথায় খেলাল হয় সে একা নয়, একটু হেসে বলে—না। আমি পড়াই না, পড়ি। তাও ইংরাজী নয়, ইতিহাস।

—তাহলে লাইব্রেরী দেখে হঠাৎ ইংরাজি উদ্ধৃতি মনে পড়ল কেন আপনার ?
আমার তো মনে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের কথা—

—তাই নাকি ? কী ?

শর্মিলা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে, ‘মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে সমুদ্রমহা-পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাসমুদ্রের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে !’

আনন্দ অবাক বিস্ময়ে কয়েকটা মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল শর্মিলার দিকে তাকিয়ে। সে নীরব দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কিছ্ ছিল যাতে লজ্জা পেয়েছিল শর্মিলা। আজ এতদিন পরেও সেই প্রথম পাওয়া লজ্জার অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে ওর। তখন মনে হয়েছিল, এতটা প্রগলভ হওয়া ঠিক হয়নি। ‘সাধারণ পাঠাগার’ ওদের পরীক্ষার লাস্ট-মোমেন্ট সাজেগন ছিল। তাই রাত জেগে এই উদ্ধৃতিটা মুখস্থ করেছিলো শর্মিলা। সুযোগমত আউরে দেবার লোভ সামলাতে পারেনি। ওর মনে হল, কী দরকার ছিল পাণ্ডিত্য জাহির করতে ষাবার ? সহজ হবার জন্য গলার শব্দটা পালটে নিয়ে বলে—নিচ চলুন, দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন ?

আনন্দ জবাবে বলেছিল—না দেখুন, আমি ভাবছিলাম কথাগুলো তো আগেও শুনছি, কিন্তু আজ আপনার মুখে শুনে মনে হল যেন ওর একটা নতুন অর্থ ধরা পড়ল আমার কাছে।

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য লজ্জিত শর্মিলা তাড়াতাড়ি বলে—আমাকে এই লাইব্রেরীর মেসবার করে দিন না।

আনন্দ সে কথা কানে তোলেনি। আপন মনে বলতে থাকে—‘মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ঠিক যেন রক্তাক্ত রাজকন্যা। সে প্রতীক্ষা করে আছে কেবে আসবে দরদী পাঠক রাজপুত্রের বেশ, তাকে ওই কারাগার থেকে মুক্ত করে সার্থকতা দান করতে। আপনার মুখে এভাবে, এ পরিবেশে না শুনলে কথাটার ঠিক মর্ম গ্রহণ করতে পারতুম না। এ উদ্ধৃতি তো আমার অজানা নয়, তবে আপনার মুখে শুনে আমার কেমন রোমাঞ্চ হয়েছে দেখুন।’

লোকটা পাগলই ! হঠাৎ রোমাঞ্চ বাঁহাতটা বাড়িয়ে দেয় শর্মিলার দিকে। আর অম্লান বদনে ডান হাতে ওর একখানা হাত তুলে নিয়ে সেই রোমাঞ্চ হাতের উপর বুলিয়ে দেয়। শর্মিলা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল লোকটার ব্যবহারে। এভাবে অপরিচিতা কোন ভদ্রমহিলার গায়ে হাত দেয় নাকি কোন সঙ্কলিত

মানুষ ? চাকিতে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নেন। না, কেউ ওদের লক্ষ্য করছে না। বর্ষার দিনে এমনিতেই লোকজন কম। যাঁরা আছেন তাঁরাও যে যার পদক্ষেপে নিবন্ধদৃষ্টি। আশ্বে আশ্বে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল শর্মিলা। আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে নিল আনন্দের দিকে। না, বিসদৃশ কিছু হঠাৎ করে বসলে অপ্রস্তুত ভঙ্গি হয়, তার লেশমাত্র আভাস নেই ওর দৃষ্টিতে। যেন শর্মিলা শ্রীলোকই নয়। আনন্দ বলে—দেখেছেন সত্যি রোমাঞ্চ হয়েছে কিনা ?

শর্মিলা জবাব দেয়নি। সাত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় তারও যে রোমাঞ্চ হয়েছিল অমন হঠাৎ হাতখানা টেনে নেওয়ায়। অপরের হাতে রোমাঞ্চ হয়েছে কিনা বুঝবে কেমন করে ! কিন্তু সে কথা তো আর বলা যায় না। শর্মিলা সহজ হবার জন্য যা হোক কিছু বলতে চায়, বলে—তাই কখনও হয় ?

—কেন হবে না ? ‘বেলা যায়’ কথাটা লালাবাবু জীবনে তো লক্ষবার শুনিয়েছিলেন, কিন্তু কই, কোনবার তো তাঁর বৈরাগ্য জাগেনি। সেই বিশেষ সম্ভাষ্য, বিশেষ পরিবেশে ঐ ‘বেলা যায়’ কথাটাই তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত করে বসেছিল। আমারও আজ ঠিক তাই হয়েছে। মানবাত্মার অমর আলোকের সম্মুখীন যে তীর্থযাত্রীর মতো এখানে আসি সেই সত্যটা আজ যেন নতুন করে অনুভব করলুম ঐ ‘মন্দির’ শব্দটার ব্যবহারে। হয়তো তার জন্যে কিছুটা দাম্পত্যী আজকের এই মেঘলা সম্ভাষ্য বিচিত্র পরিবেশ, কিছুটা আমার মানসিক প্রস্তুতি, কিছুটা আপনার কণ্ঠস্বর, কিছুটা বা আপনার আদ্র সৌন্দর্য !

নিঃসন্দেহে লোকটা পাগল। অথবা বদমায়েস। হয় ‘ফুল’ নয় ‘নেভ’ ! যদি পাগল হয় তো বন্ধ উদ্ভাদ, যদি বদমায়েস হয় তো সুচতুর সম্মানী ! একেবারে বোঝা যায় না। তা সে যাই হোক, শর্মিলা মনোস্থির করে ফেলেছে। নবকুমারী, মাধবী শূনে ওকে সন্দেহ করতে শুরুর করেছিল, এই আদ্র সৌন্দর্যের উল্লেখ সে বুঝতে পারে লোকটা বোধ হয় পাগল নয়, বদমায়েস। ভালমানুষের ভেদ ধরেছে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তাই বলে—শাক, এবার আমি চলি।

—সে কি ! এখনও তো কিছুই দেখেননি।

—না, ভিজ়ে কাপড়ে ঠাণ্ডা লাগবে। আমি বরং যাই। নমস্কার।

আনন্দ প্রতিশ্রুতি করে। হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় যেন চমকে উঠে বলে—ওঃ ! বজ্র দেবী হয়ে গেছে। ইস্যু-কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাবে এক্ষুণি।

হতদন্ত হয়ে সে চলে যায় বিভূতির দিকে।

মনে আছে, অনেকক্ষণ চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়েছিল শর্মিলা। বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। একাট দৃষ্টি করে পড়ুয়ার দল আসছে, যাচ্ছে। চোখ তুলেও কেউ দেখছে না শর্মিলাকে। সবাই আপন মনে ব্যস্ত। শর্মিলা

ভাবছিল লোকটা কে? কী নাম? কোথায় থাকে? এর আগেও কি সে অর্নি অপরিচিতা কোন মেয়ের হাত খপ্পু করে চেপে ধরেছে কখনও? ওঁকি সত্যই অন্যমনস্ক আপন-ভোলা পিঁড়িত মানুষ? না কি আড়াগোড়াই অভিনয় করে গেল? লোকটার কৌতুকবোধ কিন্তু প্রখর। সার্জেন্টটাকে কেমন নাজেহাল করেছিল! আর শুধু কি সার্জেন্টটাকে? তাকে নয়? মদহর্তের পরিচয়ে তাকে কত কি বানিয়েছে। বার্নার্ড শ-র চেয়ে নাকি ওর সেন্স-অব-হিউমার বেশী, নবকুমারের কাণ্ডাম্বষণে ষাবার চেয়ে ওর পক্ষে সার্জেন্ট অম্বষণে যাওয়া নাকি বেশী অ্যাডভেঞ্চারাস! ওর ইতস্তত ভাবে লোকটা বলেছিল—হে মাধবী বিধা কেন? এগুঁলি কৌতুক, এগুঁলি গ্লোব, শর্মিলা তা বোঝে। কিন্তু শর্মিলার আদ্র সৌন্দর্যের প্রশংসা করার সময়ও কি ওর কণ্ঠে কৌতুক ছিল? আবার এই তো শর্মিলার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লোকটা দাঁব্য ছুটে গেল ইস্তা-মিউস্টারের দিকে! একবার ফিরেও দেখল না শর্মিলা গেল, না দাঁড়িয়ে রইল!

এর পরের কয়েকটা দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে ওর। কী যেন হয়েছিল শর্মিলার। কোন কিছুরেই মন লাগত না, সব সময়েই মনে পড়ত সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। একটা উটকো অচেনা লোক ওর মনের বাগানে কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মতো হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাজির হল! ভেঙে তছনছ করে দিয়ে কোথাকার হাওয়া কোথায় চলে গেল। সময়ে অসময়ে সারাদিনই মনে পড়ত সেই অদ্ভুত লোকটার কথা। দোহারা ফরসা চেহারা, চোখে মোটা জেমের চশমা, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, কিন্তু দাড়ি কামায়নি কেন সে? দাড়ি না-কামানো মানুষ দেখলেই ওর রাগ হয়।

ড্যাডি প্রতাহ দাড়ি কামায়, দাদাও কামায়। বে পরিবেশে সে মানুষ সেখানে সকালে দাঁতমাজার মত প্রাত্যহিক দাড়ি-কামানোও নৈত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত! মনে হয়েছিল, লোকটা নোংরা। বস্তুত পাঞ্জাবটা খুলে রেখেছিল বলে নয় ঐ একদিনের দাড়ি না-কামানো গালটা দেখেই শর্মিলা ভেবেছিল ও ট্যান্ড্র-ড্রাইভার।

সাতাই ওকে ভুলতে পারেনি। সেই লোকটার চাহনিতে, হাসিতে, সমস্ত ব্যাক্তি এমন একটা কিছু ছিল যা ভোলা যায় না। কিসের অমোঘ আকর্ষণে সে এসে নাম লিখিয়েছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। কলেজ কামাই করে বসে থাকত ওখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ইস্তা-করা বই কোলে নিয়ে। নিজের পাগলামিতে নিজেকেই ধমক দিত। তবু সংযত হতে পারেনি। আর কিছু নয়, কৌতুহল। জেনে নিতে হবে, কে সেই লোকটা। সে কী? উদাসীন, আত্মভোলা, না লুচ্ছা বদমায়েস! শর্মিলা জানে সে সুন্দরী, অনেকের মন্থ দৃষ্টির আরাগিতে এ সংবাদ সে পাঠ করেছে। অনেক পার্টিতে, অনেক জনান্তক

সুযোগে এ তথ্য নিবেদন করেছে তাকে অনেকে। কিন্তু সেসব স্মৃতিবাণীর সঙ্গে এ লোকটার মৃদু প্রশংসার তফাত আছে। তবু ওর সন্দেহ হয়, সত্যিই কি লোকটা মৃদু হয়েছিল? তাহলে হঠাৎ এমন অদ্ভুত অনাসক্তিতে সে কেন ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল তার সামিথ্য থেকে?

মাঝে মাঝে মনে হত, এ কি ক্যাপামি! কোথাকার কে একটা অযত্নবিন্যস্ত কেশ নোংরা মানুষ, ভাল করে পরিচয়ই হয়নি তার সঙ্গে। তবু তারই জন্যে শর্মিলা কেন রোজ ছুটে আসে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে? তার সঙ্গে দেখা হলে কী বলবে শর্মিলা? ভদ্রলোক যদি ওকে চিনতে না পারে? যদি বলে, কোথায় দেখেছি বলুন তো আপনাকে? অথবা যদি চিনতে পেরেও বলে, ভাল তো? আর বলেই যদি হৃদয়ঙ্গম হয়ে ছুটে যায় ইসদা-কাউন্টারের দিকে? তাহলে শর্মিলা কী করবে? শূন্য আর একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যেই কি এই ক্লাস-পালানোর কৃচ্ছ্র সাধন? একেই কি বলে পূর্বরাগ? প্রেম? অসম্ভব! প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম হয়, এ কথা শর্মিলা বিশ্বাস করে না। এ শূন্য একটা কৌতূহল; হ্যাঁ, তীব্র কৌতূহলই। লোকটার পূর্ণ পরিচয় জেনে নিতে হবে। জানতে হবে কেন সে এমন উদাসীন আনমনা। বুঝে নিতে হবে অদ্ভুত সাক্ষাৎকারের কথা ও লোকটার মনে আছে কিনা।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে ভদ্রলোক মফস্বলে থাকেন। ডাকেই বই নেন, ফেরত দেন। কীচৎ কখনও কলকাতায় এলে নিজেই আসেন গ্রন্থাগারে। নামটা জানা থাকলেও তবু সস্থানের একটা সূত্র পাওয়া যেত। কিছুই যে জানা নেই অথচ তা সন্তেদও কলেজ কামাই করে এভাবে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে এসে বসে থাকার কোন মানে হয়?

দিনকতক পরে আবার অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল। দূর থেকে আনন্দকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল শর্মিলা। আনন্দ ওকে দেখতে পাল্লনি প্রথমটা। খান দূরই বই নিয়ে সে এদিকে আসাছিল হন, হন করে। নিজের অজ্ঞাতসারে আসন ছেড়ে শর্মিলা উঠে দাঁড়ায়। ঠিক তখনই আনন্দ ওকে দেখতে পায়। আর ঠিক তখনই একটা বিসদৃশ কাণ্ড করে বসে যার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না শর্মিলা। ওকে দেখতে পেয়েই আনন্দ বলে ওঠে—এই তো আপনি! ও! কোথায় ছিলেন এতদিন?

শর্মিলা স্তম্ভিত যায় হয়ে। আনন্দ মোটেই নিম্নস্বরে বলেনি কথা কটা। আশপাশের কয়েকজন মৃদু তুলে তাকায়। শর্মিলা লজ্জায় লাল হয়ে যায়। লোকটা পাগল নয়, বন্ধ উন্মাদ। এতগুলো কৌতূহলী চোখ যে ওদের দেখছে তা যেন খেয়ালই নেই। লোকটা বলে—বেশ যা হোক, কদিন ধরে পড়াশোনা আমার মাথায় চড়ে গিয়েছিল।

শর্মিলা বুঝতে পারে এ পাগলকে সামলাতে হলে এখনই বাইরে যেতে

হয়। কি জানি কী কান্ড করে বসে ঠিক কি ! বলে—আপনাকে সঙ্গে করেকটা কথা আছে, বাইরে আসুন।

—কথা তো আছেই, অনেক কথা। চলুন বাইরে যাই।

দুজনে পাশাপাশি চলতে থাকে নিগ'মন দ্বারের দিকে কিন্তু বাধা দিল একজন কর্মচারী। আনন্দের হাতে যে বইখানি আছে সেটাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার ছাড়পত্র নেই। সেটা ওখানে বসে পড়ার জন্য ইস্যু করিয়েছে মাত্র।

—ও হো, তাইতো ! আচ্ছা এটা রেখে এক্ষুনি আসছি— বলে সে ফিরে যায়। কয়েকটা পা গিয়েই আবার ঘরে এসে শর্মিলাকে বলে—আপনি আবার হারিয়ে যাবেন না যেন। এখানেই অপেক্ষা করুন। এক মিনিট।

ভীষণ হাসি পায় শর্মিলা'র। লোকটা একেবারে ছেলেমানুষ। একটু পরেই ফিরে আসে আনন্দ। দুজনে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে আসে। বাগানের একটা বড় রেইন-ট্রি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে। দু'দিন বৃষ্টি হয়নি, ঘাস বেশ শুকনো, বসায় যায়। আনন্দ পকেট থেকে রুমালটা বার করে পেতে দেয়। বলে—বসুন, অনেক—অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আর এক পকেট থেকে বার করে ছোট একটা নোটবুক। ফাউন্টেন পেনটা বাগিয়ে ধরে বলে—ফাস্ট অফ অল, আপনার নাম আর ঠিকানাটা বলুন।

শর্মিলা ভাবে লোকটার ব্যবহারে উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছে সে নিজেকে। কিন্তু তার চরম ক্লাইম্যাক্স কোথায় ? এইটাই কি সবচেয়ে বেশী স্তম্ভিত হবার মূহূর্ত ? গম্ভীর হয়ে বলে—সেই কথা শুনবার জন্যেই কি তখন হলের মধ্যে অমনভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ?

—না, চেঁচাইনি তো।

—আমি যদি তখন বাইরে আসার কথা না বলতাম, তাহলে ওখানেই আপনি নোটবই বার করে এ প্রশ্ন করতেন তো আমাকে ?

অদ্ভুতভাবে হাসল লোকটা। বললে—আমি কি পাগল ? ওখানে সবাই পড়াশুনা করছেন, আমি তাঁদের ডিসটার্ব করতে যাব কেন ? কিন্তু কি জানেন, নাম আর ঠিকানা জানা না থাকলে এই কলকাতা শহরে একটা আশ্রয় মানুষ একেবারে বেমালুম না-পান্তা হয়ে যায়। এ কদিন ধরে কেবলই মনে হয়েছে—কী বোকা আমিই করেছিলুম সেদিন আপনার নাম ঠিকানা জেনে নিইনি বলে। আপনি শূন্য বলেছিলেন, আপনি প্রিন্সডেন্সির ছাত্রী, সেকেন্ড ইয়ার, আর্টস। এই দেখুন আপনার র‍্যাটন। এ তিনদিনই চারটে পরীক্ষাশে আপনাদের ক্লাস ভেঙেছে অগত্যা আপনাকে ধরতে পারিনি। বোকার মত পায়চারি করেছি কলেজ স্ট্রীটে।

শর্মিলা স্থির করল, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় রাখতে হলে বিশ্বাসের অন্তর্ভূতটাকে আরও ভোঁতা করে দিতে হবে। কোন কিছুতেই অবাক না হবার মতো মনের গঠন চাই। সে যখন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে অলসভাবে পাতা উলটে গেছে তখন ও লোকটা প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে ক্রমাগত পায়চারি করে গেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ কদিন সে ক্লাসে যান্নি। গেলে হয়তো পাগলটা ওর সহপাঠীদের সামনেই ট্রাম রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম করে নোটবুক বার করে হাঁকত—আপনার নাম আর ঠিকানাটা? তাহলে কলেজ থেকে নাম কাটাতে হত তাকে।

কিন্তু এতে কত হাসির বা কি আছে? লোকটা সরল ভাবে স্বীকার করেছে বলেই হাস্যাস্পদ? আর সে কি কিছু কম করেছে? কলেজ কামাই করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে থাকে নি? সেটাও কি কলেজ স্ট্রীটে পায়চারি করার চেয়ে কম হাসির খোরাক?

—ওঃ! খুব ভুগিয়েছেন আপনি!

—কিন্তু এভাবে ভুগবার দরকার কি ছিল?

—আরে বাঃ! কী যে বলেন! এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারেনি। চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মূছবার জন্যে রুমালের সম্মানে বারকয়েক এ-পকেট সে-পকেট হাতড়ালো। সেটা যে এইমাত্র ঘাসের উপর পেতে দিয়েছে তা বোধ হয় মনে নেই। শেষ পর্যন্ত অন্যান্যমনস্কভাবে শর্মিলার লড়াটিয়ে পড়া অঁচলটা তুলে নিয়ে কাচটা মূছতে মূছতে বলে—আপনার কম্বিনেশান কি?

অঁচলটা ওর হাত থেকে সন্তর্পণে ছাড়িয়ে কাঁধের উপর ফেলে শর্মিলা বলে-সংস্কৃত, সিভিক্‌স্‌ আর লজিক।

- আশ্চর্য!

--আশ্চর্য কিসের?

—আপনি হিষ্টির নেননি?

—না। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

—না, হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন, আমি ভেবেছি আপনি ইতিহাস নিয়েছেন, এবং আই. এ পাশ করে ইতিহাসেই অনার্স নেবেন।

—এ রকম অস্বভূত ধারণা হল কেন আপনার? আপনি যেহেতু ইতিহাস পড়েন, তাই দুর্দিন্নার তাবৎ সুন্দরী মেয়ে ইতিহাসে অনার্স নেবে, এ কেমন কথা?

অন্য কেউ হলে এই 'সুন্দরী' বিশেষণটা নিশ্চয় ব্যবহার করত না সে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে ওকে খানিকটা চিনতে পেরেছে—তাই একটু বাজিয়ে

নেবার জন্য ঐভাবেই কথাটা বলেছিল শর্মিলা। লোকটা কিন্তু সে ইঙ্গিতের ধার কাছ দিয়েও গেল না। বললে—না না, তা কেন? দুর্নিয়ম সবাই নেবে কেন? আমি ভেবেছিলাম আপনি শৃঙ্খল নেবেন।

—আমার প্রতি হঠাৎ এ অনুগ্রহ কেন?

—না না, অনুগ্রহ নয়, কিন্তু সেদিন আপনি এমন দরদ দিয়ে ঐ কথাটি বলেছিলেন যে, আমার মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই আপনি ইতিহাস ভালবাসেন।

শর্মিলা বলে—সেটাও আপনার অন্যান্য। এ লাইব্রেরীতে শৃঙ্খল ইতিহাসের বই-ই থাকে না। মানবাত্মার অমর আলোক কি শৃঙ্খল ইতিহাসের পাভাতেই সীমিত? দর্শনে নেই, সায়েন্সে নেই, কম্প্যারটিভ রিলিজিয়নে নেই?

কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল লোকটা। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—ঠিক কথা। না, আমারই ভুল। হ্যাঁ, তা তো বটেই। আচ্ছা চলি।

নোট বইখানা পকেটে পুরে ফেলে। যেন এটুকু জ্ঞানবার জন্যেই আজ কদিন ধরে সে ক্রমাগত পায়চারি করেছে কলেজ স্ট্রীটে।

শর্মিলার কি-জানি কী হল, একেবারে মিছে কথা বলে বসল একটা—আপনি ঠিকই ভেবেছিলেন। সত্যিই ইতিহাসকে ভালবাসি আমি। তবে কি জানেন, হিন্দুতে নম্বর তোলা ভীষণ শক্ত। তাই ওটা নিইনি।

আবার বসে পড়ে আনন্দ, বলে—এ একেবারে ভুল ধারণা। আর তাছাড়া নম্বর-ফম্বর সব বাজে কথা। ওই তোমাদের এক বাতক। পরীক্ষার নম্বর দিয়ে কি ধুয়ে খাবে? অত নম্বর-নম্বর কর কেন?

শর্মিলা জবাব দেয় না। সিনেমায়-গল্পে-উপন্যাসে সে দেখেছে দুটি অপরিচিত মেয়ে-পুরুষের প্রথম পরিচয়ে দু-পক্ষই আপনার ব্যবধানে আলাপ-চারী শূন্য করে। তারপর কোন একটি বিশেষ মূহুর্তে সেই আপনি হয় তুমি। শিল্প-সাহিত্যের কল্যাণে সেই তুমি-ডাকার মূহুর্তটির মূল্য সম্বন্ধে শর্মিলা সচেতন ছিল। অথচ ওদের ক্ষেত্রে সেই পর্যায়েটা এল না, আসবে না। প্রথম দর্শনেই শর্মিলা ওকে তুমি সম্বোধন করেছিল, আবার উঠেছে 'আপনি'তে; কে জানে আবার কোনদিন 'তুমি'তে, নামতে পারবে কিনা! আর ঐ লোকটা আজ অনায়াসে নেমে এল 'তুমি'তে! কিন্তু কই, রোমাঞ্চ হল না তো শর্মিলার সর্বাঙ্গে!

আনন্দ তখনও বলছে—কিন্তু তোমাদের সে ধারণা ভুল। ইতিহাস মানেই কতকগুলো সাল-তারিখ আর নামের তালিকা নয়। তার গোপনকথা আবিষ্কার করার আনন্দ গুরুত্বপূর্ণ খঁজে পাওয়ার চেয়ে কিছু কম নয়। ইতিহাসের আলো-আধারি অলি-গলিতে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ সত্যের মূখোন্মুখি হলে সত্যিই রোমাঞ্চ হয় ইতিহাসবেত্তার।

রোমাঞ্চের কথাতে শর্মিলার মনে পড়ে গেল আগের দিনের কথা। এখনই রোমাঞ্চ হবে নাকি ওর? আর তাই পরখ করবার জন্য শর্মিলার হাতখানা টেনে নেবে সে? না, সে-রকম কিছুর ঘটল না। ব্যাগ থেকে একতাপা কাগজ বার করে শর্মিলাকে দিল আনন্দ। বললে—বিশ্বাস না হয় পড়ে দেখুন। লেখাটা এখনও প্রকাশ করিনি কোথাও। শেষও হয়নি লেখাটা। জাস্ট এ স্কেচি ড্রাফ্ট!

আবার তুমি থেকে আপনি। শর্মিলা সে কথা গ্রাহ্য না করে বলে কী ওটা:

—মৌষ'ব্দগের স্ত্রী-স্বাধীনতা। বিষয়টা পুরানো, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিটা নতুন। পড়েই দেখুন আপনি।

পরমুহুর্তেই ওর হাত থেকে পান্ডুলিপিটা ফের কেড়ে নিয়ে বলে—আচ্ছা, আমিই বরং পড়ে শোনাই। কতক্ষণই বা লাগবে।

শর্মিলা কিন্তু রাজী হতে পারে না। সে তো আর পাগল নয় ঐ লোকটার মত? ন্যাশনাল লাইব্রেরীর রেইন-ট্রি গাছের নিচে বসে শুনবে মৌষ'ব্দগের স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা। এদিকে সম্বন্ধেও হয়ে আসছে। বলে—আমি বরং ওটা নিয়ে যাই। এখানে অশ্লীলতার পড়া যাবে না। পড়ে পরে আপনাকে ফেরত দেব।

—তার চেয়ে আমার মেসে চলুন না। সেখানে বাতি আছে।

—কোথায় মেস আপনার?

—বাদুরবাগান।

—সেখানে সবাই ছাত্র বর্দিষ?

—না সবাই নয়, যদুবাবু, কেরানী, মহেন্দ্রবাবু ইনসিওরেন্সের দালাল।

—তা সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে মৌষ'ব্দগের স্ত্রী-স্বাধীনতার আলোচনা করলে তারা কিছুর মনে করবেন না?

আনন্দ বিহবল হয়ে বলিছিল—কেন? কী মনে করবেন?

—কিছুর না! কিন্তু একটা কথা। মৌষ'ব্দগের স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্বন্ধে আমার ধৈর্য কোন ধারণা নেই, এ বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী ঘরের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনারও তেমন কোন ধারণা নেই, মিস্টার...

নিরাশ হতে হল শর্মিলাকে। ভদ্রলোক তার অসমাপ্ত বাক্যের পাদপূরণ করে দিলেন না। চোখ থেকে চশমা খুলে পাজাবির প্রান্তে তার কাটো মূছতে মূছতে বলেন—বেশ! আপনিই ওটা নিয়ে যান। পড়ুন। তারপর একটা অ্যাকাডেমিক ডিসকাশান করা যাবে, বুঝেছেন! আলোচনার পরে ওটা আবার রিরাইট করব বরং।

শর্মিলা কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিল—কোথাও লেখকের নাম

ঠিকানা লেখা নেই। বললে—লেখাটা পড়ে ফেরত দেব কাকে ?

—কেন, আমাকে।

—তাহলে আপনার নাম আর ঠিকানাটা জেনে রাখতে হয়। নাম-ঠিকানা জানা না থাকলে এই কলকাতা শহরে একটা আশ্চর্য মান্দ্রব বে-পাক্তা হয়ে যায় কিনা।

একগাল হেসে লোকটা বলেছিল—তা ঠিক। এই যেমন আপান হারিয়ে গিয়েছিলেন। আচ্ছা দিন—

পান্ডুলিপিটা টেনে নিয়ে তার ওপরে লিখে দিল : আনন্দ মিত্র।

বাদুড়বাগান মেসের ঠিকানাটাও লিখে দিল। এরপর আরও অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করেছিল সেই গাছতলায়। আলিপূর রোড দিয়ে দ্রুতগামী মটোরের ধাবমান ছন্দ। সন্ধ্যার স্নান আলোয় ঘনসবুজ ঘাসের ওপর যেন একটা যাদুস্পর্শ। কয়েকটা শালিক এসে বসেছে অদূরে কী নিয়ে যেন তাদের প্রচণ্ড বচসা বেধেছে। একটা ঝাড়ুদার চলে গেল কাগজের টুকরো আর বাদামের খোলা কুড়িয়ে নিয়ে। লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে একজন বৃদ্ধ চলে গেলেন। লাইব্রেরী থেকে একে একে বেরিয়ে আসছে পড়ুয়ার দল। আবার ঘণ্টা বাজল গ্রন্থাগারে।

উঠে পড়ল ওরা। সেই আশ্চর্য সন্ধ্যার কথা ভুলবার নয়। শর্মিলার মনের মণিকোঠায় সেই অশ্রুত সন্ধ্যাটির স্মৃতি সোনার জ্বলে লেখা আছে। অথচ তার উপকরণ অতি সামান্য, উপচার নগণ্য। ভেবে দেখতে গেলে কিছুই নেই। তবু প্রথম পারচয়ের সেই অবাক মূহুর্তগুণিল অশ্রুত মোহময়। দুটি বিভিন্ন সস্তা দুটি ভিন্ন ধারায় এসে মিশেছে এক সঙ্গমে। উদাসীন আনমনা আনন্দের অনেক কথাই জেনে নিয়েছিল শর্মিলা। আনন্দ শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। থাকবার মধ্যে আছে এক ছোট বোন। উমা। দেশের বাড়িতে থাকে। দেশ কোথায়? বহরমপুর। সঙ্গে সঙ্গে লালবাগ আর পলাশীর প্রসঙ্গে চলে যেতে চেয়েছিল আনন্দ। কিন্তু শর্মিলা তাকে রাশ টেনে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় তার নিজের কথায়। বহরমপুরে ওদের পৈতৃক ভিটের দুটি ঘর পেয়েছে আনন্দ। উমা সেখানেই থাকে। রতনদাদু তার দেখাশোনা করেন। রতনদাদু কে? আনন্দের পিতামহের বৈমাত্রেয় ভাই। আনন্দ একটা চাকরি পেলে উমাকে নিয়ে আসবে ওখান থেকে। তারপর দেখেদুনে বোনের একটা বিয়ে দিতে হবে। লেখাপড়া? না, উমার আর লেখাপড়া হল কোথায়? কোথায় পাবে অত পয়সা? আনন্দেরও হত না, নেহাৎ বরাবর শ্কেলারশিপ পেয়েছে বলেই বন্ধ হয়নি পড়াশুনাটা। তা সে যাই হোক, বোনের বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই আনন্দ নিশ্চিন্ত। তখন সে কায়মনোবাক্যে সমাহিত হতে পারবে তার সাধনায়। যে ইতিহাস আজও লেখা হয়নি— তারই

উপাদান সংগ্রহ করতে বসবে সে। একা নয়, তার মতো আরও অনেক সাধক
 আছেন—যাঁরা অতদ্ভূত সাধনায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই হারানো ইতিহাসকে।
 আগাগোড়া নতুন করে লিখতে হবে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতো যা কিছু
 ভারতীয় তাকেই ছোট করে দেখলে চলবে না। তাই দেখাতে গিয়েই ভারতবর্ষের
 ইতিহাস বিকৃত হয়ে গেছে। দোষ ইতিহাসের নয়, দোষ ইংরাজের আমদানী
 করা ঐ ‘কনক্বেভ মিরার’টার। ঐ বাঁকা আয়নাটার সব কিছুই বিকৃত হয়ে
 প্রতীতিবিশ্বত হয়। যাঁরা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তাঁদের ওই আয়নায় মনে হয়
 দেশদ্রোহীর মতো। আবার যারা সত্যিকারের সর্বনাশ করে গেছে দেশের
 তাদের প্রতিচ্ছবি পড়েছে দেশভক্তের ভঙ্গিমা—যেহেতু তারা শাসক সম্প্রদায়ের
 সহায়তা করে গেছে। তাদের নামে ট্যাবলেট, তাদের নামে রাস্তা, তাদের কথা
 ওদের ইতিহাসের পাতায় সোনার জলে লেখা। এ ইতিহাস, আনন্দের মতে
 একেবারে পুঁড়িয়ে ফেলবে না। এরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। একটা
 পরাধীন জাতির ইতিহাসকে শাসক সম্প্রদায় কীভাবে গোপন করে, বিকৃত করে,
 তারই দলিল হয়ে থাকবে এসব গ্রন্থ।

নতুন করে লিখতে হবে আগাগোড়া। ঢেলে সাজাতে হবে। সে চেষ্টা
 যে হয়নি তা নয়। কিন্তু, আনন্দের ধারণা, সেটা করতে যারা উদ্যোগী হয়েছেন
 তাঁরা আবার উল্টোদিকে বাড়াবাড়ি শূন্য করেছেন। সদ্য-স্বাধীন এ উপদ্বীপের
 নয়া-ইতিহাসবেত্তার দল যেন বেশিমাাত্রায় উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। যা কিছু
 প্রাচীন, যা কিছু ভারতীয় তাই ভাল, এ কথা প্রচার করতে তাঁরা বন্ধপরিকর।
 এ যেন ঐ ‘কনক্বেভ মিরার’টিকে সোজা করতে গিয়ে তাকে ‘কনভেক্স’ করে
 ফেলা! প্রতিচ্ছবি এখনও স্বভাবিক নয়, উল্টোদিকে ভুল। আনন্দ বলে—
 ইতিহাসকারকে হতে হবে ন্যায়াধীশের মত, বিচারকের মত। যুক্তির কণ্টপাথরে
 বিচার করে যেটুকু নিছক সত্য তাকেই তুলে ধরতে হবে। সে সত্য কঠোর হয়
 হোক, অপ্রিয় হয় হোক—তারই মূল্য দিতে হবে। সে বিচারে যদি দেখা যায়
 যা সম্ভব হত্যা করেছে—অসম্ভব মনে হলেও সেকথা লিখে যেতে হবে রায়ে;
 সে বিচারে যদি দেখা যায় আজন্ম অপরাধীর কোন একটি বিশেষ অভিযোগ
 প্রমাণিত হয়নি তবে সে অপরাধ থেকে তাকে বেকসুর খালাস দিতে হবে।
 সেন্টিমেন্ট নয়—ন্যায়বিচার।

একনাগাড়ে অনেক কথাই বলে গিয়েছিল আনন্দ। শর্মিলা মন দিয়ে
 শুনছে তার সব কথা। রাতি গভীর হতে শূন্য করার বিদায় চেয়েছে। উঠে
 পড়েছিল আনন্দ। রুমালটার কথা তার মনে ছিল না। শর্মিলাই সেটা
 কুঁড়িয়ে দিল ওর হাতে। কথা বলতে বলতে ওরা হাজরা পর্যন্ত চলে এল।
 সেখানে একটা খালি ট্যান্সি পেয়ে শর্মিলা রুদ্ধল সেটাকে। আর আশ্চর্য, ট্যান্সি
 যখন ছেড়ে দিল তখন আনন্দ যুক্তকরে বিদায় দিল তাকে সহাস্য বদনে।

শর্মিলার মনে হল, লোকটা আজ ঘণ্টা-চারেক গম্ব করার পরেও জানে না শর্মিলার নাম, খাম, ঠিকানা !

নাঃ, আজ ঘুম কি আর আসবে না ? আবার উঠল শর্মিলা । বাথরুমে গেল । মূখেচোখে জল দিল । শোবার আগে আবার একবার চেয়ে দেখল ঘড়িটার দিকে । দূটো দশ : আশ্চর্য ! ওদের ঝগড়া কখন মিটে গেছে, শর্মিলা টেরও পায়নি । ওরা তো আর মনের নয়, ঘড়ির কাঁটা । শীতকাতুরে বড় কাঁটাটা জড়িয়ে ধরেছে ছোট কাঁটাটাকে । সাড়ে এগারোটায় ওদের যে দাম্পত্য কলহ নজরে পড়েছিল শর্মিলার, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই । জড়াজড়ি করে দূটো দশের ঘরে শূন্যে পড়েছে দুজনে ।

ঘড়ির কাঁটা যা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পারে মনের কাঁটা তা একবছরেও পারে না কিন্তু !

পরদিন সকালে রম্ভা যখন ওকে ডেকে দিল তখনও ঘুমের জড়িমা লেগে আছে শর্মিলার চোখে । মাথাটা ভার ভার, চোখ দুটো ভারি ভারি । রাতে ঘুম হয়নি ভাল । একেবারে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন । রমলার ডাকে বিরক্ত হয়ে উঠে বসে । একনাগাড়ে সে ডেকেই চলেছে—এই দিদি, তোর চা জুড়িয়ে গেল, নে ওঠ । মূখে-আগুন চা না হলে তো আবার চলে না !

অগত্যা উঠতে হয় । সকাল হয়ে গেছে । কলকাতার প্রথম শীতের সকাল । ঘোঁওয়া ঘোঁওয়া কুয়াশা জড়ানো । আলসেমোর সকাল । রাস্তায় জল দেওয়া শেষ হয়েছে । খবরের কাগজের হকারদল ছুটেছে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে । লোকজনের চলাফেরা শূন্য হয়ে পথে । পাশের ঘরে শ্বাগতাও উঠেছেন । খুটখাট ঠুকঠাক শব্দ শোনা যাচ্ছে । একতলার স্টোভ জ্বলছে এখনও । কভবার বলেছেন শ্বাগতা কিন্তু জনার্দনের ওই এক বাতিক । কিছুতেই হীটারে জল বসাবে না । স্টোভ জ্বালা চাই । কোথায় কে বৃষ্টি ইলেকট্রিক হীটারের শব্দ খেয়ে মারা গেছে তাই জনার্দন ওটার বারে কাছে থাকবে না । যেন স্টোভ জ্বালতে গিয়ে দুর্নিয়ার কেউ কখনও মরেনি । কিন্তু তা হোক । স্টোভই ভাল । এমনি ভোর ভোর সকালে স্টোভের একটানা শব্দটা কেমন যেন নেশা ধরায় । চায়ের গন্ধ আর শ্বাদের সঙ্গে ঐ শব্দটার কেমন যেন অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে । ওটাও যেন নেশার একটি আবশ্যিক উপাদান । বোধ করি দীর্ঘদিনের অভ্যাসে তাই এ শব্দটা এত ভাল লাগে । হুগলীর বাসাতেও সে সকালবেলা স্টোভ জ্বালতো ।

না, আজ আর নয় । স্মৃতিচারণ কাল রাতেই শেষ হয়ে গেছে । আজ থেকে ওসব কথা আর নয় । জীবনের মাঝখানে দু-দুটো বছরকে একেবারে মূছে

ফেলতে হবে স্মৃতি থেকে। সেই বৃষ্টিঝরা দিনটি থেকে শব্দ করে ওর এ বাড়িতে ফিরে আসা পর্বন্ত দিনগুলোকে মনে দিতে হবে মন থেকে। নতুন দিনের সূর্যের আলোকে সে কিছতেই ঢেকে দিতে দেবে না ঐ দূরটো বছরের কোনও মেঘের আড়ালে।

শর্মিলা নেমে পড়ে খাট থেকে। রমলার ইতিমধ্যে মদ্যটুকু খোওয়া সারা। চায়ের কাপটা শর্মিলা টেনে নেয়। সত্যিই একটু জুড়িয়ে গেলে সে আর চা খেতে পারে না। আর সকালের এই চায়ের কাপটি না হলে ঠিক মাথা ধরবে। তখন যতই অ্যাসপিরিন আর স্যারিডন খাও, সেই রাত পর্বন্ত অধ-কপালে ধরে থাকবে।

রমদু এই সাতসকালে চুল খুলে ফেলেছে। দিদির চেয়ে ওর চুলগুলো লম্বা, গদ্বিহতেও বেশী। বড় চিরুণীটা দিয়ে চুলগুলো আঁচড়াচ্ছে রমলা।

—কোথাও বেরুবি নাকি ?

—হ্যাঁ, গীতাদের বাসায় যাব একবার।

—কলেজ নেই আজ ?

—আছে তো। সে তো এগারোটার।

চাম্বে চুমুক দিতে দিতে শর্মিলা বলে--হ্যারে, নিম'ল তো আজ আর কদিন আসছে না। কী হল, ঝগড়া করেছিস ?

দাঁত দিয়ে ফিতে কামড়ে ধরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বিরক্ত কণ্ঠে রমদু বলে—নিম'ল আসুক না আসুক আজকে সেটা নিউজই নয়। আজ সকালের বিশেষ খবরের বুলেটিন বলছে, বোসবার্ভিতে নিউ বট্লে ওল্ড-ওয়াইন আজ বিকশিত হচ্ছেন।

শর্মিলা হেসে বলে—ফাজিল।

রমদুও হেসে বলে—আমি তো ফাজিল, তুই কি ? দাদাকে নাকি বলোছিস গাড়ি চাই না ?

—গাড়ি কী হবে ?

—বিকাশদাকে আনতে যাবে কে ? দমদমে ?

—কেন, তুই ?

—তাহলে এয়ারোড্রোমেই বসে থাকবে সে। পরের প্লেনে ফিরে যাবে।

শর্মিলা জবাব দেয় না। জুত করে চা খেতে থাকে। মনে মনে সারাদিনের কাজগুলোর কথা একবার ভেবে নেয়। আজ তার অনেক কাজ। কাল কামাই করেছে। মাস্টারমশাই সম্ভবত ব্যস্ত হয়ে আছেন। মিঠুয়া নিশ্চয় ভীষণ রাগ করে বসে আছে। কাল শব্দ শব্দ কামাই করল সে। সমস্ত দিনটা কেমন মেনে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছিল। সকালের ডাকে চিঠিখানা

আসতেই কেমন যেন সব গদুলিয়ে গিয়েছিল। তারপর মা যখন বললে চিঠিখানা না পড়ে পড়াড়িয়ে ফেলেছে তখন আর তার মাথার ঠিক ছিল না। সারাটা দিন কোথায় কোথায় ঘুরেছে। শান্তি পায়নি। বাড়িতে খায়নি, অফিসে যায়নি। দোতলা বাসের মাথায় বসে শূন্য শূন্য শ্যামবাজার ঘুরে এসেছে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে; বেলা একটা নাগাদ চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে ঢুকে কী-যেন খেয়েছিল। তারপর চলে এসেছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। চূপ করে বসেছিল সেই পরিচিত রেইন-ট্রি গাছের তলায়।

দিদি!

কী রে?

—কাল অফিসে যাসনি যে?

—কে বললে?

—সম্প্রায়েলা সেই মিনি মিন্তির এসে হাজির। বললে, তুই নাকি ফোন করে জানিয়েছিস যে জ্বর হয়েছে। তাই খবর নিতে এসেছিল।

ছি ছি ছি! মিনিটার সবতাতেই বাড়াবাড়ি একদিন কামাই করেছে তাতে এত হৈচৈ করার কী আছে? নাকি মাস্টারমশাই তাকে পাঠিয়েছিলেন নিজেকে থেকে? অসম্ভব নয়। যা ব্যস্তবাগীশ মানুষ! ভগবান জানে, মিনিটা ফিরে গিয়ে কী বলেছে তাঁকে! কিন্তু তার আগে জানা দরকার এরা মনিকে কী বলেছে।

—তা তুই কী বললি?

—আমি আর কিছুর বলার স্কেপ পেলুম কোথায়? তার আগেই আমাদের বক্তৃত্যার খিলজি বৌদি যে একগঙ্গা কথা বড় বড় করে বলে গেল।

—একগঙ্গা কথা মানে?

—মানে আজ বিকাশদা আসছে, তাই তুই কী সব মাকে-টিঙে গেছিস। আসল কথাটা বলেনি অবশ্য।

আসল কথা মানে?—হুঁ, দুটো কুঁচকে ওঠে শর্মিলার।

আসল কথা মানে, আসল কথা। আনন্দদার চিঠির কথা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় শম্ভু।

—রাগ করলি?

শর্মিলা জবাব দেয় না। রম্ভু ঘনিয়ে এসে ডাকে—দিদি!

শর্মিলা চট করে উঠে পড়ে। ওর এই আদরের ডাকটাকে ভয় করে সে। রম্ভুটার কোন কান্ডজ্ঞান নেই। এখনি হয়তো ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলবে, আচ্ছা তুই আজও বিকাশদাকে আগেকার মতো ভালবাসিস? অথবা হয়তো, বিকাশদা আসছে শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে? কিংবা হয়তো একেবারে কান্ডজ্ঞান

হাঁনের মতো বলে বসবে, বিকাশদাকে তুই বেশী ভালবাসিস না আনন্দদাকে ?
রমুকে বিশ্বাস নেই। ও সব পারে।

—নে সর্। আমার দেরি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ঘর
ছেড়ে।

চায়ের টেবিলে উপস্থিত হতেই সরমা বললে—কাল তোমার একখানা
টেলিগ্রাম এসেছে।

—টেলিগ্রাম ? কে করেছে ?

অপরেণ ব্যাপারটা লব্ধ করে দেয়, বলে—বিশেষ কিছু নয়। বিকাশই
करेছে দিল্লী থেকে। আজ সম্ভার প্লেনে আসছে সেটাই কনফার্ম করেছে।

শর্মিলা হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামখানা নিল। এক নজর দেখে নিয়ে রেখে
দিল ফের টেবিলে। কেমন যেন রাগ হল তার। আবার টেলিগ্রাফ করার
কী ছিল ? দুদিন আগেই তো চিঠি লিখে জানিয়েছে সে কথা। কবে, কখন,
কোন ফ্লাইটে সে আসছে। তাহলে আবার বিশেষভাবে ওকে টেলি করার
মানে ? এয়ারোড্রোমে উপস্থিত থাকবার প্রচ্ছন্ন নির্দেশ ? বিকাশের মনে কি
সন্দেহ আছে যে শর্মিলা নিজে না গিয়ে আর কাউকে পাঠাবে ? তাই যদি সে
স্থির করে থাকত তাহলে এ টেলিগ্রাম এলেও তাই করত। কিন্তু শর্মিলা অত
অভদ্র নয়। তারই জন্য বিকাশ আসছে, তাকে নিভেই আসছে। সারা
জীবনের জন্য যখন লোকটাকে বরদাস্ত করতে রাজী হয়েছে তখন এ সাধারণ
সৌজন্যবোধটুকুও আছে তার। ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি পাঠাতে না। কাল
অবশ্য রাগের মাথায় দাদাকে বলেছিল গাড়ি চাই না। জানত তা সত্ত্বেও দাদা
ঠিক সময়মত গাড়িটা পাঠিয়ে দেবে। শর্মিলার মনে হল টেলিগ্রামখানার
মধ্যে কেমন যেন একটা কাঙালপনা আছে। ওগো, আমি যাচ্ছি, তুমি নিজে
একবার এয়ারোড্রোমে এস, আমাকে রিসিভ করবে। না হলে আমার মান থাকবে
না। এ নেহাত হ্যাংলাপনা। আত্মবিশ্বাসের অভাব। কিন্তু পরমুহুর্তেই
মনে হল তাই বা কেন ? আনন্দও কি ঠিক এমনি করত না ? প্রেসিডেন্সি
কলেজের গেটের সামনে সে কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করেনি ? কই, তখন
তো সেটাকে হ্যাংলাপনা মনে হয়নি শর্মিলার। সে নিজেও কি ন্যাশনাল
লাইব্রেরীতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করেনি কারও প্রতীক্ষায় ? ইস্যুকরা
বইয়ের একটি ছত্র না পড়ে বসে থাকেনি দরজার দিকে দৃষ্টি মেলে ? সেসব তো
কাঙালপনা মনে হয়নি সেদিন।

স্বাগতা কিন্তু খুব খুশী হয়েছিলেন মনে মনে। খুব সময়মতো এসে
পড়েছে তারটা। এরপর আর শমু বলতে পারবে না, আমি যাব না রিসিভ
করতে। সেটা অভদ্রতার পর্যায়ে পড়বে। স্বাগতা বলেন—বিকাশের জন্যে
দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটা একটু পরিষ্কার করে রাখিস।

এ নির্দেশ নিঃপ্রয়োজন নয় ঠিক। দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটা পরিষ্কারই আছে। বড়জোর একগোছা ফুল রেখে আসতে হবে ফুলদারীতে। এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে, বিকাশ একতলার গেস্টরুমে থাকবে না। বিকাশ গেস্ট নয়, বাড়িরই একজন।

বাদল হঠাৎ বলে বসে—দিদি, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব দমদমে। বিকাশদাকে রিসিভ করে আনতে যাব।

স্বাগতা রীতিমতো ধমকের সুরে বলে ওঠেন—না না। তোমার আর গিয়ে কাজ নেই।

কিন্তু স্বাগতার মনের কথা বাদল বেচারি বদ্বাবে কেমন করে? বিকাশ আর শর্মিলা আজ দেড়বছর বাদে পরস্পরের মন্থোন্মুখি দাঁড়াবে। এই আঠারোটি মাসের মধ্যে অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে দুজনের উপর দিয়ে। এতদিন পরে দুজনে পরস্পরকে মেনে নিয়েছে, মনে নিয়েছে। প্রথম সাক্ষাতে উচ্ছ্বাসটা হঠাৎ একটু বেশী হয়ে পড়তে পারে। হয়তো প্রথম সাক্ষাতের উদ্দীপনায় দুজনে দুজনের মনের কাছাকাছ এসে পড়বে। সেটাই চাইছিলেন স্বাগতা। বাদলের উপস্থিতি শূন্যমাত্র একটা অন্তরায়। বাদল অভিমান করে বললে—কেন, আমি গেলে কী হয়?

স্বাগতা বলেন—তোমার কি কোন বুদ্ধিসুদ্ধি আছে? তুমি কী বলতে কী বলে বসবে তার ঠিক কি?

—কেন, সেবার যখন দাদা আনন্দদাকে নৈমন্ত্য করতে গেল আমি সঙ্গে ছিলাম না বুঝি? কি দিদি, কোন অসভ্যতা করেছিলাম?

হঠাৎ আনন্দের প্রসঙ্গটা এসে পড়ায় সবাই কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ে। কেমন স্বল মনে হয় ঘটনাটা। অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়। শর্মিলা আজ একজনকে আমন্ত্রণ করতে যাচ্ছে, বাদল তার সঙ্গে যেতে চায়; কারণ অপরের আর একবার আর একজনকে নিমন্ত্রণ করতে গিবেছিল যখন তখন বাদল সঙ্গে ছিল, এবং সেবার তার ব্যবহারে কোনও খঁত ছিল না। তুলনাটা ঐটুকু পর্যন্তই টানা চলে। অন্তত বাদলের দৃষ্টি ভঙ্গি তাই।

রমলা ধমক দিয়ে ওঠে—তুমি চুপ করত। সব তাতেই খালি বায়না।

শর্মিলা সামলে নেয় নিজেকে—না না, বাদলও যাবে আমার সঙ্গে।

—না, বাদল যাবে না, রায় দেন স্বাগতা। কোথায় কী বলতে হয়, কী করতে হয়, তা কি ও জানে?

—জানি না? কেন, আমি কখন কাকে বেফাঁস কথা বলেছি বল?

—বলনি? ধমকে ওঠে রমলা, সেবার মিসেস খান্ডেলওয়ালাকে বলনি—মাকপথেই সামলে নেয় রমদ। মায়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে জিব কাটে। সকলেই চোখে চোখে তাকায়। স্বাগতা ধমকে ওঠেন সরমাণে—তখন থেকে কী

নাড়হ অনবরত ? ঢাল না । জুড়িয়ে জল করে ফেলেবে দেখছি তুমি ।

শর্মিলার ভীষণ হাসি পায় । সে দেখতে পেয়েছে । বৌদি হাসি চাপতে পারেনি । প্রকাশ্যেই ফিক্ করে হেসে ফেলেছে । আর তাই একেবারে ক্ষেপে গেছেন স্বাগতা ।

প্রসঙ্গটা হাস্যকর সন্দেহ নেই । বছর চারেক আগেকার কথা । বাদল তখন আরও ছোট । একদিন কোথায় বুদ্ধি পার্টি ছিল স্বাগতার । বাসু সাহেবের যাবার কথা ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাটনা হাইকোর্টে যেতে হল বলে পার্টিতে যাওয়া হল না । কথা ছিল মিস্টার এবং মিসেস্ থাম্বেলওয়ালা যাবার পথে মিসেস্ বাসুকে তুলে নিয়ে যাবেন । স্বাগতা নিজের ড্রেসিংরুমে সাজগোজ করছেন, শব্দ রব্দ পড়ার ঘরে পড়াশুনা করছে । থাম্বেলওয়ালা দম্পতি কার্লং বেল বাজাতে বাদল ছুটে এসেছিল তাঁদের আপ্যায়ন করে ড্রইংরুমে বসাতে ।

থাম্বেলওয়ালা সাহেব বাঙলা জানেন অল্প । বলেছিলেন—ইজিস্ট মামী রেডি ? মা কি করিতেছেন ?

বাদল অমানবদনে বলেছিল—অলমোস্ট রেডি । ভুরু আঁকিতেছেন ।

থাম্বেলওয়ালা সাহেবের বাঙলাজ্ঞান সীমিত । ‘ভুরু আঁকিতেছেন’ বাক্যটির মর্ম গ্রহণ করতে পারেননি বাদল তখন আঙুল দিয়ে দোঁখয়ে দিযোঁছিল কায়দাটা । আই রো পেনসিলের মতো একটা পেনসিল নিজের ঈর্ উপর বুদ্ধিরে বুদ্ধিরে দিযোঁছিল প্রক্সিয়াটা । হো-হো বরে হেসে উঠোঁছিলেন থাম্বেলওয়ালা দম্পতি ।

এ নিয়ে এককালে অনেক হাসাহাসি হয়েছে এ বাড়িতে । কিন্তু ছেলের বউয়ের সামনে এ প্রসঙ্গটা রুচিকর মনে হয়নি স্বাগতার । আর বউদিটাও শোকা । তার উচিত হয়নি ওমন ফিক্ করে হেসে ফেলা ।

অপরের জানে, এসব ক্ষেত্রে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ । না হলে সরমাকে আরও হুমকি খেতে হবে । তাই বলে—সাতটায় প্লেনটা ল্যান্ড করবে । পাঁচটার মধ্যে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব তাহলে । বাড়িতেই থাকবি তো ?

—না, আজ অফিসে যাব । কিন্তু গাড়ি তোমাকে পাঠাতে হবে না দাদা । আমি বরং একথানা ট্যাক্সি নিরেই চলে যাব ।

কাল গাড়িটা প্রত্যাখ্যান করে আজ একেবারে এক কথাতেই স্বীকার করে নিতে কেমন ঘেন সঙ্কোচ হল শর্মিলার । অপরের বাধা দিয়ে বলে—আবার ট্যাক্সি করতে যাবি কেন বাড়ির গাড়ি থাকতে ?

স্বাগতা এবারও ধমক দিয়ে ওঠেন—আজ্ঞা, তোরই বা এত জেদ কেন ? ও যদি ট্যাক্সিতে যেতে চায় থাক্ না ।

অপরেণ খতমত থেয়ে যায়। কিন্তু তেই বন্ধে উঠতে পারে না অন্যায়টা সে কী বলেছে। মান্যবর অতিথিকে আনতে হলে বাড়ির গাড়ি নিয়েই লোকে যায়। না হলে বিকাশকে তো দমদম থেকে সেন্সট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত ওরাই পৌঁছে দেবে। সেখানে গিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনের অফিসের সামনে ট্যাক্সি নিয়ে শর্মিলা অপেক্ষা করুক এই কি স্বাগতের মনোগত ইচ্ছা?

না, স্বাগতের মনোগত ইচ্ছা তা নয়। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার পশ্চাদ্ধাবন করবার ক্ষমতা নেই অপরেণের মতো নাবালকের। স্বাগত ভাবছিলেন, বাড়ির গাড়ির চেয়ে ট্যাক্সিই তো ভাল। বাসু-সাহেবকে তিনি কতবার বলেছেন একটা পাজীবী কি মাদ্রাজী ড্রাইভার রাখতে। তা তিনি কানে তোলেননি কোনদিন। মহেন্দ্রকে যে তিনি কী চোখে দেখেছিলেন তা তিনিই জানতেন। এজন্য ভুগতে হয়েছে স্বাগতাকেই চিরকাল। গাড়ির মধ্যে মন খুলে কোন কথা বলার উপায় ছিল না। মহেন্দ্র বাঙালী। পিছনে ফেরে না অবশ্য, কিন্তু কান তো খোলাই থাকে। দমদম থেকে নিউ আলিপুরের দূরত্ব তো বড় কম নয়। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ওরা যদি জনান্তিকে দুটো কথা বলে নিতে চায় তো বলুক না। চাই কি হয়তো গঙ্গার ধার ঘুরেও আসতে পারে। ইচ্ছে হলে ঘাসের উপর বসতেও পারে দু-দুই। মহেন্দ্র গাড়ি চালালে কি তা সম্ভব? শেল্লার ঘেঁটে ঘেঁটে ছেলেটার মনের রসকম্ব সব গেছে শেষ হয়ে। যাবে না? নিজেকে পছন্দ করে বউটিও যে জুটিয়েছেন এক আকাট মৃদুতা। বউ নিয়ে যেদিন বের হয় সেদিনও নিজেকে গাড়ি চালায় না বলে—চল মহেন্দ্র, আমরা একটু মাকেঁটে যাব। মাকেঁট, মাকেঁট আর মাকেঁট—এ ছাড়া যেন দুনিয়ায় আর যাবার জায়গা নেই কোথাও!

অনেক ভেবেচিন্তে কিছু আন্দাজ করতে না পেরে অপরেণ আবার বলে—না, আমি ভাবছিলাম ঠিক সম্মুখবেলায় আবার ট্যাক্সি পাওয়াও মর্শকিল হয়ে পড়ে কিনা। আমি তো শত চেষ্টা করেও পাই না।

রমু হেসে বলে—তুমি পাও না, কারণ তোমার জন্য সর্বদা মহেন্দ্র গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে। আগরা পাই, কারণ না পেলে ট্রামে-বাসে খুলতে হয় আমাদের। কি বল দিদি?

পৈতৃক গাড়ি একখানাই। এজমালি সম্পত্তি। বোনেদের অভিযোগ সেটা দাদার পিছনেই খাড়া থাকে সর্বক্ষণ। অপরেণ সেটা মানে না। এ অভিযোগের উত্তরে তার সরব প্রতিবাদ সর্বদা উদ্যত। সে কিছুর বলতে যাবার আগেই শর্মিলা বলে—সে কথা ঠিক বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ট্যাক্সি চাপি আমি, আর তাপরে রমু—

অর্থাৎ বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাড়ির গাড়ি ব্যবহার করে দাদা, এই তো বলতে চাস?

শর্মিলা সকৌতুকে বলে—ওটা তোমার গিল্টি-কন্‌সাস মনের ইন্‌ফারেন্স, আমার স্টেটমেন্ট সে কথা বলেনি।

নিছক কৌতুক। ভাইবোনের খুনসুটি। অনাবিল পারস্পরিক লেগ-পুলিং। কিন্তু তাতেও হঠাৎ যেন জ্বালা ধরে গেল অপরেরে। কাঁজের সঙ্গে বলে—আমি তো জানি, জীবনে একবারই ট্যাক্স ডেকেছ তুমি এবং জলকাদার মধ্যে ড্রাইভার তোমাকে কোন খানা-খন্দের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

রাগের মাথায় কথাটা বলেই মনে মনে জিব কেটেছিল অপরের—ছিঁ ছিঁ ছিঁ। এ কথা কি এভাবে বলার? এই পরিবেশে! বিশেষ আজকের মতো শূভদিনে?

ঘরটা থম্‌থম্‌ করছে। ঠিক কালকের মতো কি একটা ছুতো করে সরে পড়ল সরমা আর রম্‌। শর্মিলা কোন ছুতো করলে না, ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল সে। স্বাগতা শূধু আত্মগতভাবে বললেন—বাদলের আর দোষ কি? কোথায় কি বলতে হয় খেড়ে ছেলে তুমিই তা শিখলে না অ্যান্ডিনেও!

মরমে মরে গেল অপরের।

রোজ অপরের সাড়ে আটটায় অফিসে চলে যায়। গাড়ি নিয়ে ফিরে আসে মহেন্দ্র। শম্‌-রম্‌কে নিয়ে যায়। একজন নামে প্রেসিডেন্সিতে আর একজন হেদোর কাছাকাছি। ওখানেই শর্মিলার স্কুল। স্কুল নয় আশ্রম, বিব্ববন্ধু আশ্রম। সাড়ে দশটার মধ্যে শর্মিলাকে হাজিরা দিতে হয়। ফেরার পথে শর্মিলা সাধারণত বাসেই ফেরে। অথবা ট্যাক্সে। আজ কিন্তু শর্মিলা জিদ ধরল তাকে সকাল করে যেতে হবে। স্বাগতা বললেন। গাড়িতে না যাবার জন্যেই এই জিদ। রাগ হয়েছে মেয়ের। দাদার উপর শোধ তোলা হচ্ছে। কে জানে কতদিন চলবে এখন এই জেদাজেদির পালা। বাড়িতে আজ বাইরের লোক আসবে, আর গাড়ি নিয়ে এই জেদাজেদি চলতে থাকবে। অপরের একবার ভয়ে ভয়ে বললে—আমিই না হয় আজ ট্যাক্স নিয়ে যাই। তুই বরং মহেন্দ্রকে নিয়ে যা।

শর্মিলা জ্বাবে বলেছিল—তুমি কিসে যাবে তা নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই। আমার গাড়ি লাগবে না।

সত্যিই ন’টার মধ্যে বেরিয়ে যাবে সে। বাসেই যাবে। স্বাগতা কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। জানান ব্যারিস্টার-সাহেবের আদরেই হয়েছে এসব। যা ধরবে তাই করবে।

চাকরি নেওয়া নিয়েও একদিন এই রকম জেদাজেদি হয়েছিল। কারও কথায় কান দেয়নি জেদি মেয়েটা। জিদ করে চাকরিটা নিল। কটা টাকাই

বা পায় ? যা পায় তা বোধ হয় যাতায়াতেই খরচ হয়ে যায় । প্রথমটা আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত স্বাগতা রাজী হয়েছিলেন । আনন্দের সঙ্গে রাগারাগি করে চলে আসার পর চূপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকত । স্বাগতার চেষ্টার চূড়ি ছিল না - কিন্তু কোন কিছুর্তেই সে মাথা গলাবে না । লাইব্রেরীতে যাবে না, পাড়ার মেয়েদের নিয়ে একটা মহিলা-সমিতি গড়ে তুলেছিলেন স্বাগতা - শর্মিলাকে সেদিকেও ভেড়ানো গেল না । সবাই মিলে একটা চ্যারিটি শো করবেন স্থির করেছিলেন, শূদ্ধ শর্মিলাকে কোন ভাবে কাজে কর্মে ভুলিয়ে রাখার জন্য । কিন্তু শর্মিলা কিছুর্তেই কোন দায়িত্ব নিতে রাজী হল না । আনন্দের সংসার থেকে শর্মিলা যে রাগারাগি করে চলে এসেছে সে কথাটা বুঝতেই পারেননি প্রথমটায় । ঠর দোষ নেই । তখন অপরের বিয়ের ব্যাপারে সত্যি বাস্তব ছিলেন তিনি । প্রথম খটকা লাগল বিবাহে একমাত্র জামাই না আসায় । ভয়ানক অপমানিত বোধ হয়েছিল স্বাগতার । অপরাধ নিজেকে গিয়ে নিমন্ত্ৰণ করে এসেছে । তার না আসার মানে ? কিন্তু কোন কথা তিনি বলেননি । মনে মনে শঙ্কিত ছিলেন অবশ্য জামাইয়ের ব্যাপারে । এলেও বিব্রত বোধ করতেন । ভদ্রলোকদের সামনে বার করবার মতো মানুষ তো নয় তাঁর বড় জামাই । তবু সে যে আসবে না, এটা ভাবতেই পারেননি । আরও বিস্মিত হয়েছিলেন তার পাঠানো প্রজেক্টশানটা দেখে । শর্মিলার উপহারটাই টেকা দিয়েছিল সবার উপর । মনে মনে খুশী হয়েছিলেন স্বাগতা । শর্মিলাকে ডেকে বলেছিলেন—এবার একদিন আনন্দকে আনতে গাড়ি পাঠাই ?

শর্মিলা দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল—না ।

—না মানে ?

—এ বাড়িতে সে আসবে না । এ বাড়ি ছেড়ে আমিও যাব না ।

শুভিত হয়ে গিয়েছিলেন স্বাগতা । ধীরে ধীরে সব কথা জেনে নিয়েছিলেন । শর্মিলা স্বীকার করেছিল সব অপরাধ,—হ্যাঁ, ভুলই করেছিল সে । বলেছিল মাকে—ও মানুষকে নিয়ে ঘর করা যায় না ।

জন্মে উঠেছিলেন স্বাগতা - সেটা এতদিনে বুঝলে ?

শর্মিলা হাসপাতাল থেকে একা ফিরে আসার পর আশার আলোক দেখতে পেয়েছিলেন তিনি । নতুন ধারায় বহিতে শূদ্ধ করল তাঁর চিন্তা । শর্মিলার আবার বিয়ে দেবেন । সে কথা বলতেই জন্মে উঠেছিল শর্মিলা । স্বাগতা বুঝেছিলেন, কালে সবই সয়ে যাবে । ক্রমে শর্মিলা রাজী হবে । সমস্ত ভুলিয়ে দেবে তাকে । তখন থেকেই বিকাশের কথা মনে হয়েছিল তাঁর । এতদিনে তাঁর সে স্বপ্ন স্বার্থক হতে বসেছে । কিন্তু এই কয় মাস সে জন্যে কী অপরিমিত মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে । হাসপাতাল থেকে

ফিরে আসার পর শর্মিলা একেবারে অনাসক্ত হয়ে পড়েছিল। কারও সঙ্গে কথা বলে না, কোথাও বের হয় না। সে এক অশুভ মেলাজ্যোতিষায় পেয়ে বসেছিল শম্ভুকে। সেটা শর্মিলার 'ব্লু-পার্লিড'! স্বাগতা শেষে একদিন রাগ করে বলেই ফেললেন—তুই কী চাস্ বল তো?

অবাক চোখে তাকিয়ে শর্মিলা বলেছিল—কী চাই মানে?

—তুই কোথাও বের হবি না, হাসবি না, খেলবি না—তুই কি আত্মঘাতী হতে চাস্?

শর্মিলা একটু অশুভভাবে হেসে বলেছিল—আমি একটা চাকরি নেব ভাবছি।

—চাকরি! কেন, তোর কি খাওয়ার পরস জুটছে না?

—না, সেজন্যে নয়, কিন্তু একটা কিছু নিয়ে তো আমাকে থাকতে হবে।

একটু ভেবে নিয়ে স্বাগতা বলেছিলেন—কাজটা কী? কোথায়?

যতটুকু না বললে নয় ততটুকুই বলেছিল শর্মিলা। কাজটা কোথায়, কী জাতীয় তা বলেছিল, শম্ভু বলেন জগদানন্দবাবুর সঙ্গে কেমন করে আলাপ হল তার। বলেন, এই জগদানন্দবাবু আনন্দের মাস্টারমশাই এবং আনন্দের মাধ্যমেই সে প্রথম পরিচিত হয়েছিল জগদানন্দবাবুর সঙ্গে।

স্বাগতা শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন। শম্ভু আতুর নিয়ে ভুলে থাকতে চায়, থাকুক না—ভাবখানা তাঁর এই রকম। এও তো এক ধরনের দেশ-সেবা।

শর্মিলা যোগ দিয়েছিল তার কাজে।

জগদানন্দবাবু ছিলেন আনন্দের জেলাশুলের হেডমাস্টার। দিলখোলা আত্মভোলা মানুষ। যেমন ছাত্র তেমনি মাস্টারমশাই। জীবনের শুরুর করেছিলেন ঐ শুলের খার্ড মাস্টার রূপে। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়েছেন ঐ একই বিদ্যায়তনে। শেষ বারো বছর হেডমাস্টার হিসাবে। তাঁর ছাত্ররা ছাড়িয়ে আছে সারা দেশে। তারা বড় বড় চাকরি করে, ব্যবসা করে। জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তারা। জগদানন্দবাবু তাতেই খুশী। ভদ্রলোক বুনো রামনাথের জাতের মানুষ। যে পরিবেশে যখন থাকেন, তখন তাতেই সন্তুষ্ট। ছাত্রেরা মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, দেখা হলে নত হয়ে প্রণাম করে—বৃদ্ধ তাতেই তৃপ্ত। অগেই চোখে জল আসে তাঁর। সোস্টমেন্টাল মানুষ। সংসারে কেউ নেই। স্ত্রী গত হয়েছেন অনেকদিন। মেয়ে দুটির বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে নেই। নেই, তিনি স্বীকার করেন না, বলেন আমার ছেলে তো সারা দেশে ছড়ানো। জগদানন্দবাবু স্থির করেছিলেন, প্রাইভেট-ফান্ডের টাকাটা হাতে এলে কাশী চলে যাবেন! বার্ষিক্যে বারাগসী। কিন্তু সে সুযোগ তাঁর আর হল না। তাঁর একটি প্রাক্তন-ছাত্র এসে হাজির হল রিটার্ন করার পরেই, বিচিত্র এক প্রস্তাব নিয়ে।

মনীশ বাগচি ঠর একজন প্রিয় ছাত্র। প্রিয় এবং কৃতী। স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেছিল বহরমপুর থেকে। ঠর স্কুলের গৌরব। বরাবর ফাস্ট হয়ে ডিঙিয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপের পর ধাপ। পরবর্তী যুগে ছাত্রদের তিনি মনীশের উদাহরণ দেখাতেন, বলতেন ঐ রকম হতে হবে তোমাদের! সেই মনীশ একদিন এসে দাঁড়াল তাঁর দরজায়, দীর্ঘ পনের বছর পর। বললে— হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি স্যার। চিরদিনের মতো দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই যাবার আগে প্রণাম করে যেতে এসেছি আপনাকে।

ওকে বন্ধু জড়িয়ে ধরে বন্ধু বলেছিলেন—শুনছি তোমার দুঃখের কথা। আশীর্বাদ করি ঈশ্বর তোমাকে এ দুঃখ বইবার শক্তি দিন।

হাত দুটি জোড় করে মনীশ বলেছিল—একটি ভিক্ষা আছে স্যার।

বল মনীশ। তোমাকে অদ্যে আমার কিছুই নেই।

—কিছু পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিলুম, কিছু নিজেও করেছি। সেটা সংকাজে দান করে যেতে চাই। আপনাকে তার ভার নিতে হবে।

—কী জাতীয় ভার?

মনীশ তার প্রস্তাব পেশ করে। তার ভদ্রাসনখানি সে দান করে যেতে চায়। শব্দ ভদ্রাসনই নয়, স্বাবর অস্বাবর যাবতীয় সম্পত্তি। সামান্য পাথেরটুকু নিয়ে সে স্বেচ্ছানিবাসনে চলে যেতে চায় এ দেশ ছেড়ে। মনীশের ইচ্ছে ঠর পৈতৃক ভিটার খোলা হবে একটা শিক্ষায়তন। মনীশের ঠাকুরদা ছিলেন উত্তর কলকাতার একজন নামকরা ধনী। প্রচুর ধনসম্পত্তি করেছিলেন তিনি। হেদোর কাছাকাছি তৈরী করিয়েছিলেন প্রাসাদোপম ভদ্রাসনটি। মনীশের বাবাও যথেষ্ট উপার্জন করেছেন। মনীশ নিজেও এম করেনি। কিন্তু কিছুই তার ভোগে লাগল না। মনীশের ইচ্ছা তাদের সেই পৈতৃক ভিটার একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হবে। জনা দশ-পনের ছাত্র থাকবে তাতে। কিন্তু সেখানে ভর্তি করা হবে একমাত্র বিকলাঙ্গদের। যারা অঙ্গহানিজনিত কারণে সাধারণ স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে পারে না, তাদের। শিক্ষার ব্যবস্থাও হবে তদনুযায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত ক্যারিকুলাম অনুসরণ করা হবে কি হবে না, তা নির্ধারণ করবেন মাস্টারমশাই। উদ্দেশ্য হবে, সেই সব বিকলাঙ্গদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। উপার্জনক্ষম করে তোলা। ভাষা, বিজ্ঞান ইতিহাস, ভূগোলও হয়তো তাদের পড়াতে হবে—যাতে পূর্ণাঙ্গদের সমাজে মেলেমেশা করার সমস্ত তারা কথাবার্তায় অসুবিধা বোধ না করে; কিন্তু প্রধান লক্ষ্য হবে দুটি। প্রথমত এবং প্রধানত তারা যেন উপার্জনক্ষম হয়—পরিবারের ঘাড়ে যেন তারা বোঝাম্বরপ না হয়। দ্বিতীয়ত একটি বা দুটো অঙ্গহানিজনিত কারণে তারা যেন পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দরস থেকে বঞ্চিত না হয়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মনীশ তার যাবতীয় সম্পত্তি দান করে যেতে চায় একটি ট্রাস্টকে—আর

জগদানন্দবাবুকে করে রেখে যেতে চায় তার কর্ণধার। সলিসিটরকে দিয়ে একটা খসড়া সে তৈরি করে এনেছিল। সেটি তার হাতে দিয়ে বলে—পড়ে দেখুন।

জগদানন্দবাবু অস্বীকার করতে পারেন নি। বলেছিলেন—বেশ, তোমার দেওয়া এ দায়িত্ব আমি নিলাম; কিন্তু তুমিই বা চলে যাচ্ছ কেন? এ তো আমার মতো বুদ্ধের একার কাজ নয়। তুমিও থাক না এতে জড়িত।

হাত দুটি জোড় করে মনীশ বলেছিল, ওটি আদেশ করবেন না স্যার। অনেক ভেবে দেখেছি। সে আমি পারব না কেন পারব না তা বুঝতে পারবেন এই ডায়েরিখানা পড়লে। এটা আমি আপনার কাছে রেখে যেতে চাই সেটি সিমেন্টাল কারণ নয়, এটা একটা হিউম্যান ডকুমেন্টারি। অপরিণত একাট বিকলাঙ্গ মানুষের মানসিক পরিবর্তনের দলিল। আমি আপনাকে অনুরোধ করব মাস্টার মশাই, যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে আসবেন, তাঁদের আপনি এটা পড়তে দেবেন। তাহলে তাঁরা বুঝতে পারবেন, একটি অপরিণত কিশোর কী ভাবে, কী চায়, কী করে।

—কিন্তু তুমি কেন নিজের মনকে শক্ত করছ না মনীশ? মশুর শ্মৃতিরক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইছ, নিজের হাতে কেন তা বানাচ্ছ না?

একটু চুপ করে থেকে মনীশ বলেছিল—আমি অক্ষম, আপনি আমাকে মাপ করবেন। এ বাড়িতে, এ দেশে আমি আর টিকতে পারছি না। বছর কতক বাইরে থেকে ঘুরে আসি। মাসে মাসে সেখান থেকে আমি টাকাও পাঠাব। টাকারও তো দরকার হবে আপনাদের। মনে যদি শান্তি পাই, তাহলে ফিরে আসব আবার। কিছুদিনের মত শ্রম, মজ্জা দিন আমাকে।

শর্মিষ্ঠা কাজে যোগ দেবার পর সেই দিনার্জিপথানি পড়তে পেয়েছিল। পড়েছিল সে যত্ন করে আদ্যোপান্ত। একবার নয়, বারে বারে।

মনীশ বাগচি ইকনমিক্সের ছাত্র। পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিল প্রচুর, নিজেরও রোজগার করেছে যথেষ্ট। বিবাহ করোঁছিল, সন্তানও হয়েছিল একটি। মশু। ভাল নাম বিশ্ববন্ধু বাগচি। তার নামেই এ প্রতিষ্ঠানের নাম। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল মশু। হিন্দু স্কুলের ফাস্ট বয়। মাস্টার-মশাইরা আশা করতেন বাপের মতো সেও রেকর্ড মার্ক নিয়ে পাশ করে যাবে সব পরীক্ষা। প্রতিষ্ঠিত হবে জীবনে। ছেলেকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত মনীশ। ছেলেকে কেন্দ্র করেই ঘুরত ওদের দাম্পত্য জীবন। প্রাইভেট টিউটর ছিল না। বাবা মাই পালা করে পড়াতে তাকে। মাও ভাল ছাত্রী। আশা ছিল, এ ছেলে একদিন দেশের আর দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। মনীশের স্নেহের সংসার একটি মুহূর্তে ভেঙে চূরে খানখান হয়ে গেল। সর্বস্বান্ত হয়ে গেল সে এক মোটর দুর্ঘটনায়। মশুর মা ঘটনাক্ষেত্রেই মারা

গেলেন। হাসপাতালে পৌঁছাবার আগেই! আর মটু সেখান থেকে ফিরে এল বটে কিন্তু দুটো পাই কেটে বাদ দিতে হয়েছে হাঁটু থেকে। গ্যাংগ্রিন হয়ে যাচ্ছিল। আর আশ্চর্য! কয়েকটা কাটা দাগ ছাড়া মনীশের দেহের চামড়ায় আর কোন চিহ্ন নেই সেই কণিক বিভীষিকার।

মোড় ঘুরে গেল জীবনের। স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে ছেলেকে বাড়িতে এনে রাখতে হল। তার সঙ্গী নেই, সাথী নেই, মনীশ দীর্ঘ দিনের ছুটি নিল। সেই তখন একমাত্র সঙ্গী বিকলাঙ্গ পুত্রের। সারাদিন তাকে ভুলিয়ে রাখে, গল্প বলে, বই পড়ে, ক্যারাম খেলে। কিন্তু কতদিন আর এভাবে চলে? শেষ পর্যন্ত আবার একদিন কর্মজগতে ফিরে যেতে হল মনীশকে। দীর্ঘ পাঁচটি বছর কেটে গেল তারপর। এ পাঁচ বছরের প্রতীদানের ইতিহাস মনীশ লিখে গেছে তার খাতায়। মটু কী করে, কী চায়, কী বলে। কেমন করে তাকে সঙ্গদান করবার চেষ্টা করেছে, কেমন করে তাকে কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে তার ইতিবৃত্ত। হাতে-চালানো তিন চাকার সাইকেল বানিয়ে দিয়েছিল, তাই চালিয়ে বাড়ির বাইরেও যেত। বাইরের দুনিয়াটার প্রতি তার আকর্ষণ ছিল বেশি। সময় পেলেই সে বেরিয়ে যেতে চাইত। আবার কখনও কখনও পাঁচ-সাত দিন একেবারেই গের হত না। মনীশ ভাবত, হয়তো কেউ ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলেছে, হয়তো নতুন করে আঘাত পেয়েছে সে। মটু ভারি চাপা ছেলে, কোন কথাই সে বলতে চাইত না। পাড়ার কয়েকটি ছেলেও আসত। মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে মেতে উঠত, কিন্তু আবার কখনও তাদের উপর অভিমানে চুপচাপ পড়ে থাকত বিছানায়। মনীশ আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সবকিছু সত্ত্বেও মটুকে খুশী রাখতে। কিন্তু, কিছুতেই কিছু হল না। পনের বছর বয়স তখন মটুর। দশ বছরে সে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। সেই পনের বছর বয়সের কিশোরটির কী যে হল হঠাৎ, বাপের উদ্দেশ্যে একটি ছোট্ট চিঠি লিখে রেখে আত্মবাতী হল বিশ্ববন্দু। সেই ছোট্ট চিঠিখানি এ প্রতিষ্ঠানের মূল দলিল। তাতে লেখা আছে—‘এ দেশে বিকলাঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।’

মটুর কাছে হেরে গিয়েছিল মনীশ। পুত্রের কাছে পরাজয়ই নাকি কাম্য। কিন্তু এ কি সেই পরাজয়? মনীশ সে হার স্বীকার করেনি। জীবনে কখনও কারও কাছে হার স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না সে। স্কুলে-কলেজে কর্মজীবনে সে চিরকাল মাথা উঁচু করেই থেকেছে। পুত্রের কাছেও এ পরাজয় সে মেনে নিতে পারেনি। তার লেখা শেষ-চিঠির স্ট্রেটমেন্টালিটিকেও সে অস্বীকার করেছিল। তার আজীবনের সপ্ন দিয়ে তা প্রমাণ করবার এই প্রচেষ্টা মনীশের।

জগদানন্দবাবু মাথা পেতে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গড়ে উঠল নতুন

প্রতিষ্ঠান। স্বতঃস্ফূর্ত দান এল কিছুর আপনা থেকেই। যারা মনশীলকে চিনত, মশুকে জানত, তারা অস্বাভাবিকভাবে দান করল সাধ্যমতো। এমনকি মশুর শুলের ছেলেরা, মাস্টারমশায়েরা চাঁদা তুলে তার এ স্মৃতিকে সম্মান দেবার চেষ্টা করলেন। জগদানন্দবাবুর আর কাশীবাসী হওয়া হল না, মনেপ্রাণে তিনি ভুবে গেলেন এ প্রতিষ্ঠানের কাজে।

আনন্দ শিয়ের পরে এ গম্পটা করেছিল শর্মীলাকে। ওরা তখন হুগলীতে। শর্মীলা দেখতে চেয়েছিল। একটা ছুটির দিন ওরা তিনজনে গিয়েছিল মাস্টার মশাইয়ের কাছে। শর্মীলা, আনন্দ আর উমা। জগদানন্দবাবু খুব খুশী হয়েছিলেন পুরাতন ছাত্রকে পেয়ে। শর্মীলা তাঁকে প্রণাম করে বলেছিল, আমিই কিন্তু আপনার ছাত্রকে ধবে এনেছি।

মাস্টার-মশাই খুশী হয়ে বলেছিলেন, তাই তো আনতে হবে মা। এ তো তোমাদেরই কাজ। ওরা এখন কাজের মানদুঃ, তোমরাই তো মনে করিয়ে দেবে।

তারপর ওকে বলেছিলেন আনন্দ ছেলেটা ভারী ভাল, বন্ধু। তুমি সুখী হবে।

সে কথা মনে পড়লে আজও হাসি পায় শর্মীলার। মাস্টার-মশায়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি। আনন্দ ভাল ছেলে সন্দেহ নেই, কিন্তু বড় বেশী ভাল সে। অত ভালকে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা যায়, শো-কেসে বসিয়ে দূর থেকে তারিফ করা চলে। তাকে নিয়ে ঘর করা চলে না। শর্মীলা তাই সুখী হতে পারেনি।

কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে যখন সে দৃষ্টিচ্যুত দর্ভাবনায় পাগল হয়ে যেতে বসেছিল তখন এই মাস্টার-মশাইটির কথাই আবার মনে পড়েছিল তার। ছুটে গিয়েছিল তাঁর কাছে একদিন।

জগদানন্দবাবু আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—আজ যে আমার মা একা এসেছে? কই, আমার ছেলে কই, তাকে আনানি?

উত্তর দিতে গিয়ে জবাবটা আটকে গিয়েছিল ওর গলায়। তবু থামেনি। বলেছিল কিছুটা। সব কথা বলা যায় না। তবু যতটুকু বলেছিল ততটুকুই শুনিয়েছিলেন বন্ধু। জানতে চাননি কেন এ বিরোধ, কেন আনন্দকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করে এসেছে শর্মীলা। কেন তার আশ্রয়ে ফিরে যাবার সম্ভাবনাটাকে একেবারেই আমল দিতে চায় না সে। বলেছিলেন, কিন্তু মানদুঃের মন তো, কেমন করে জানলে যে আজকের তোমার দৃঢ় সংকল্পটাও শরতের মেঘের মতো ভেসে যাবে না।

শর্মীলা মাথা নিচু করে বলেছিল—জীবনে এমন বাধা আছে যা অনতিক্রম্য। এমন ভুল হয়, যা শোধরাবার উপায় নেই।

বৃদ্ধ চূপ করে গিয়েছিলেন।

শর্মিলা কুণ্ঠাভরে বলেছিল—ভারি কোন চিঠিপত্র পান না?

—সে যে পাগল ছেলে মা, তা তো তুমি জানই। কোনদিনই সে চিঠিপত্র লেখে না।

হাত দুটি জোড় করে শর্মিলা বলেছিল—একটা ভিক্ষা আছে মাস্টার-মশাই।

ভিক্ষা কেন মা? আমার উপর যে তোমার দাবী আছে। বল।

আমাকে আপনি কিছ্ কাজ দিন। চূপচাপ বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে আমি পাগল হয়ে যেতে বসেছি।

—এই কথা? তা নাও না, কত কাজ করবে তুমি কর।

একটা চাবির গোছা বাড়িয়ে ধরে বলেন—নাও, ধর।

—কী এটা?

আমাদের সিদ্দুকের চাবি।

পিচিয়ে এসেছিল শর্মিলা—না না, টাকা পয়সা নয়, আমি ছোটদের মধ্যে থাকতে চাই—ওই যাদের হাত-পা-চোখ নেই। আমি ওদের কয়েকটা ক্লাস নিতে চাই মাত্র।

বৃদ্ধ হেসে বলেছিলেন—ক্লাস নেবার লোকের আমার তো অভাব নেই মা। মেটা আমি নিজেই পারি। সারাজীবন ঐ একটা কাজই তো শিখেছি। কিন্তু বিশ্বাসী একটি লোকের হাতে এই চাবির গোছাটা তুলে দিতে না পারলে যে আমি মন খুলে ওদের নিয়ে ক্লাস করতেও পারি না।

অগত্যা সেই দায়িত্বই নিতে হয়েছিল শর্মিলাকে।

বৃদ্ধ বলেছিলেন—তুমি এলে, আমি বাঁচলাম। গত মাস থেকে তিনটি মেয়েকেও ভর্তি করেছি আমরা। একটি মহিলা কমাই খুঁজিছিলাম। বিশেষত মিঠুয়ার জন্য।

—মিঠুয়া কে?

—এখনই আলাপ হবে। উপরে আছে, চল, দেখা করে আসি।

সেই প্রথম দিনই মিঠুয়াকে ভালবেসে ফেলেছিল শর্মিলা। মেয়েটি ছোট। বছর আটেক বয়স। পোলিও হয়ে নিম্নাঙ্গটা অবশ হয়ে গেছে। পা দুটি আছে, কিন্তু তাতে জোর নেই। চাকাগাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্যে।

শর্মিলা প্রথম প্রথম যেত শূদ্ধ সময় কাটাতে। ক্রমে ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে ভালবেসে ফেলেছে সে। জগদানন্দবাবু ওকে পেয়ে বেঁচেছেন। তার উপর ধীরে ধীরে ন্যস্ত করেছেন সব দায়িত্ব। এখন একদিন যদি সে না আসে বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়ে পড়েন। ঠিতমধ্যে শহরের গণ্যমান্য কয়েকজন ব্যক্তিও বৃদ্ধ হয়েছেন প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা হিসাবে। সরকারী সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। তাহলে আগতনে এটাকে বাড়াতে হবে। মনশী বিদেশ থেকে

লিখেছে হয়তো কিছু বৈদেশিক সাহায্যও পাওয়া যেতে পারে। লিখেছে এদেশের প্রতিষ্ঠানের কথা। ওরা খজকে দিয়ে পৰ্বত লম্বন করছে। ফটো তুলে পাঠিয়েছে একটি চিত্রকরের। তার দুটি হাতই কাটা। মৃত্যু তুলি খরে সে যে ছবি এঁকেছে, কয়েক হাজার ডলারে তা বিক্রি হয়েছে ৬দেশের বাজারে। জগদানন্দবাবু জনে জনে সে ছবি দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্তে বলেছেন—ভাবছ কি, আমাদের দেশের ছেলেরাও তা পারবে।

শর্মিলা ঠিক বিশ্বাস করে না; আবার জগদানন্দবাবুর উৎসাহ দেখে অবিশ্বাস করতেও পারে না।

দিদি, তুই আগে যাবি, না আমি ঢুকব ?

—না না, আমি আগে সেরে নিই। কাল কামাই করেছি, আজ সকাল সকাল যেতে হবে।

—তাহলে ঢোক্। আমাকেও একটু সকাল করে বেরতে হবে। গাঁতাদের বাড়ি হয়ে যাব।

—কলেজ থেকে ফেরার পথেই বরং সেখানে যাস্ না ?

—ওরে বাবা। তা হবার নয়। মা আজ সকাল করে ফিরতে বলেছে। একগাদা বাজার করতে পাঠিয়েছে জনাদ'নকে। ওবেলা মা যে গ্রান্ড ডিনার খাওয়াবে।

—তাই নাকি ? তুই তো অনেক খবর রাখিস।

—রাখতে হয়। বাড়িতে আজ সম্মানিত আতিথি আসছেন শ্রীমদ'সিনি ?

শর্মিলা জবাব দেয় না। শাড়ি-রাউস-তোয়ালে নিম্নে বাথরুমে ঢেকে। শয়নকক্ষের সঙ্গে লাগাও শ্রানঘর। দু-বোনের একমাল সম্পত্তি। বন্ধুত্ব শর্মিলা'র বিয়ে হয়ে যাবার পর এ ঘর এবং লাগাও বাথরুমটির উপর বছরখানেক রমলা'র ছিল অসপত্ত্ব অধিকার। শ্রমু ফিরে আসার পর আবার দুজনে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করছে ঘরখানা, ছেলেবেলায় যেমন করত। রমদুর তাতে আপত্তি নেই।

বাথরুমে এই ছোট্ট পরিবেশটি শর্মিলা'র ভারি পছন্দসই। ওড়িকোলন, ক্যান্থারাইডিন আর জবাকুসুমের একটা মিলিত মন্দ গন্ধ। রমদু ক্যান্থারাইডিন মাখে। শর্মিলা কিন্তু বরাবর জবাকুসুমের ভক্ত। এমন কি আনন্দের অভাবের সংসারেও সে বরাবর তার এই প্রিয় তেলটি ব্যবহার করত। আনন্দকেও সে মাখতে বলত কিন্তু তার কি মাথার ঠিক আছে ? আজ সরষের তেল, কাল নারকেল তেল তো পরশু রুদ্ধশ্রান। ওঃ বা ! তেল মাখতে জ্বলে গেছি !

ককককে ওলাশ-বসিন। ফেনশ্রম শাওয়ার। মোজাইক মেঝে

আর ড্যাডো। তাছাড়া একটি প্রমাণ আরনা। বাথরুমের এই প্রমাণ আয়নাটা বড় প্রিয় শম্ভুর। ওর সামনে দাঁড়ালে যে মেয়েটি আজও শম্ভুর সামনে এসে দাঁড়ায় তাকে ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে সে। কতবার কতভাবে দেখেছে তাকে। প্রথম কৈশোরের সেই অবাধ দিনগুলিতে ওকে কত কথা বলেছে শর্মিলা শাওন্সার বাথ খুলে দিয়ে। আজও সে মেয়েটি এসে দাঁড়ায় ও বাথরুমে ঢুকলে বিয়ের আগে কতবার ওরা দুটি বোন এই বাথরুমে একসঙ্গে স্নান করে'ছে। গম্প করতে করতে সাবান মেখেছে। একজন আর একজনের মাথাশ শ্যাম্পু করে দিয়েছে। এখন আর তা পারে না। এখন কেমন যেন লজ্জা করে। এখন ওরা বড় হয়ে গেছে। যদিও সবই জানা, তবু কেমন যেন সংকট হয় একজনের পর একজন স্নান সেরে নেয়। ঐ আয়নাটার কতবার পড়েছে ওদের যুগল স্নানের ছবি। এখন আর শর্মিলা আয়নাটার দিকে বিশেষ তাকিয়েও দেখে না। তার কৌতূহলেরও বোধ হয় অবসান ঘটেছে। আচ্ছা, রম্বু কি আজও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঐ আয়নাটার দিকে? বিয়ের আগে সে যেমন কবে স্নাড়োথে দেখত নিজেকে? দেখত, দিনে দিনে বিকশিত হয়ে ওঠা আপনার যৌবনকে।

হুগলীতে ওদের বাড়ির পিছনে ছিল পুকুর। একটু বেলায় স্নান করতে যেত ওরা। ও আর উমা। বেলা দশটার মধ্যেই পুরুষদের স্নান শেষ হত। পাড়ার এটি এজমালি পুকুর। পাড়ার অধিকাংশই ডেলি প্যাসেঞ্জার। সবাই সকাল সাতটা আটটার মধ্যে দুটি নাকে-মুখে গুঁজে ছুটতো লোকাল ট্রেনের উদ্দেশ্যে। আনন্দও দশটার মধ্যে আহাৰাদি সেরে নিয়ে ছুটতো কলেজে। তারপর ওরা দুটি নদ ভাইবৌ যেত পুকুরবাটে। শম্ভু সাঁতার জানে না। কলকাতার মানুষ। ঘাটেই টুপ টুপ করে ডুব দিত। আর হাঁক পাড়ত, এই উমা অত জলে ঘাসনি!

উমা ছুঁক্কেপও করত না। চিং সাঁতারে ভেসে যেত মাঝপুকুরে। ছোট পুকুর, কিন্তু কী পরিষ্কার জল। ছোট ছোট মৌরলা মাছ এসে ঠোকর মারত গায়ে। প্রথম প্রথম ভারি ভয় পেত শম্ভু। উমা খিল খিল করে হেসে উঠত ওর সেই ভয়-তরাসে ভাবখানা দেখে, বলত, ওরা কামড়ায় না বৌদি।

—না, কামড়ায় না। তোদের পোষা মাছ কিনা।

সেই পুকুরটার জন্য আজও মাঝে মাঝে মন কেমন করে শর্মিলার। আর জীবনে সে জলে স্নান করার সুযোগ আসবে না। শর্মিলার বাস উঠেছে আনন্দের সংসার থেকে, তাছাড়া আনন্দের সংসার উঠে গেছে হুগলীর বাসা থেকে। সেই পুকুরটার যেন একটা সন্তা ছিল। তাকে যেন মনের সব কথা খুলে বলা যায়। বলতও শম্ভু। যে কথা কাউকে বলা যায় না, একগলা জলে নেমে সে কথাই পুকুরটাকে বলত সে। এমন কথাও বলেছে, তোমাকে সব

কথা কেন বলে রাখছি জ্ঞান ? যদি কোন দিন সহ্য করতে না পারি তোমার কোলেই আশ্রয় নেব আমি । গলায় ফাঁস দিতেত পারব না, গায়ে আগুনও দিতে পারব না । তার চেয়ে তোমার এই ঠান্ডা জলই ভাল । তাই না ?

দিদি, তোর হল ?

চমকে ওঠে শর্মিলা । আবার এলোপাভাড়ি চিন্তায় কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছিল সে । রমদুর ডাকে সন্নিবৎ ফিরে পায় । তাড়াভাড়ি গা হাত মূছে নেয় শূকনো তোয়ালে দিয়ে । ব্রেসিয়ার পরে, শাড়ি পড়ে, ব্লাউজের বোতাম লাগায় ! দোর খুলে বেরিয়ে আসে বাইরে ।

—কত দেরি করে দিলি বলত ?

শম্ভু জবাব দেয় না । এগিয়ে যায় জেসিং টেবিলটার দিকে । রমলা বাথরুমে ঢোকে ।

পেট্রল পাম্পে গিয়ে যে বাসটায় উঠে বসল শর্মিলা সেটা এখনও খালি । ছাড়তে দেরি আছে । তার আগে আর একখানা দাঁড়িয়ে । সেটা ভর্তি । তা হোক, ও বসেই যেতে চায় ! অনেকটা রাস্তা । টার্মিনাস থেকে ওঠার এইটুকুই তো সুবিধা । একটি দুটি করে যাত্রী আসছে । অফিস টাইম । বাস ভর্তি হয়ে যেতে দেরি হয় না । জানলার ধারে লোডজ সীটে গিয়ে বসে ।

বাস ছাড়ল । সেই চেনা রাস্তা । সেই সাড়ি সাড়ি চেনা বাড়ির মািছল । সেই কন্ডাকটরের হাঁক । যাত্রীদের হাঁকপাঁক । বাইবের দিকে চেয়ে বসে থাকতে থাকতে আশ্রমের কথাই মনে পড়ে গেল আবার । জগদানন্দবাবু ক্রমেই যেন বৃদ্ধ হয়ে পড়ছেন, নিজের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে নানান দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন শর্মিলার কাঁধে । সেই এখন ওদের এ প্রতিষ্ঠানের মূল স্তম্ভ । হিসাব-পত্র রাখা, চিঠিপত্র লেখা, সবই সে করে । মাঝে মাঝে ক্লাসও ও নেয় । ও ছাড়া আরও একটি মেয়ে আছে । মিনি মিস্ত্রি । এখন তিনটি ছোট ছোট মেয়েও যে ভর্তি হয়েছে ওদের আশ্রমে । পনেরটি ছেলে, তিনটি মেয়ে । মেয়ে তিনটিকে নিয়ে মিনি থাকে দ্বিতলে একটি বড় ঘরে । মিনি আবাসিক শিক্ষিকা । তার ইতিহাসটাও করুণ । সমাজে তার ফিরে যাবার উপায় নেই । শর্মিলা ভাবে মিনিও যেন বিকলাঙ্গ । বাইরে থেকে তার কোন অঙ্গহানি লক্ষ্য করা যায়নি ; কিন্তু ওর কি যেন একটা নেই । আর সে কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে । তাই নিজের বাঁড়তে আর তার ফিরে যাবার উপায় নেই । এখানে সে শূদ্ধ জীবিকা নয় নতুন জীবনও পেয়েছে । মেয়ে তিনটিকে পেয়ে সে বেঁচেছে । ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যেটি, মিঠু, সেটা আবার শর্মিলার ন্যাওটা । মাতৃহীন মেয়েটার দুটি পা-ই পোলিও হয়ে অকর্মণ্য হয়ে গেছে । ওর বাপ ওকে পেঁছে দিয়ে গেছে মাস্টার-মশাইয়ের কাছে । হস্টেলে যেমন বাপেরা রেখে আসে মেয়েকে । মিঠু ভারি চাপা, শান্ত মেয়ে । শর্মিলার মধ্যে

সে যেন তার মরা-মাকেই ফিরে পেয়েছে। মিনির সঙ্গে তার তেমন ভাব নেই। শর্মিলাও ভালবেসে ফেলেছে ঐ একফোটা বিকলাঙ্গ মেয়েটাকে। জ্বলজ্বলে দুটি চোখ, কোকিড়ানো টাকা-টাকা চুল, ভারি মিষ্টি চেহারাটা। মিঠুর কাছে তার মায়ের একখানি ফটো আছে। মাঝে মাঝে সে লুকিয়ে দেখে সেটা। শর্মিলাকে ফটোখানা দেখিয়েছে সে। ওর মা সুন্দরী ছিলেন। সেই মায়ের মূখখানাই পেয়েছে মিঠু। বছর আশ্টেক বয়স, পা দুটি যাওয়ার পর যেন বুদ্ধিটা আরও প্রখর হয়ে উঠেছে। সব বোঝে। পড়ায় লেখায়, অঙ্কে সিন্ধুহস্ত। মাস্টার-মশাই বলেন, একটি অঙ্গ খোয়া গেলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ভগবান এক হাতে নিয়ে আর এক হাতে ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেন। যার পা নেই, তার হাত দুটি বেশী শক্তিশালী হয়, যে অশ্ব তার ঘ্রাণ আর শ্রবণশক্তি হয় প্রখরতর। বলেন, ঐ যে মার্কিন ছেলটি মূখ দিয়ে তুলি ধরে অপূর্ব ছাঁব এঁকেছে, হয়তো সে তা পারত না যদি তার ডান হাতখানি অক্ষত থাকত। এ খিয়ারিটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারে না শর্মিলা। প্রথম কথা, ঈশ্বর করুণাময়, তিনি এক হাতে নিয়ে আর এক হাতে ফিরিয়ে দেন এই হাইপোথিসিসটাই হাস্যকর মনে হয়। ঈশ্বর যদি করুণাময় তাহলে মিঠুয়ার পা-দুটি ধরে টান দিতে গেলেন কেন? কিন্তু একথা সত্য যে, মিঠুয়ার চলশক্তি যতটা গেছে বোধশক্তি ততটা বেড়েছে। বাড়িতে কেন যে তার ঠাই হল না তাও বোঝে। এমনকি বাপের অসহায়ত্বকে সে করুণা করতে শুরু করেছে ইদানীং—ঐ একফোটা মেয়েটা।

শর্মিলাকে অনেক কথা বলেছে মিঠুয়া। শর্মিলা তার মা-মণি। তার সখী, বাম্ববী। মিঠুয়ার বাপ মিস্টার নাগের বড়-বাজারে বিরাট ব্যবসা। গত যুদ্ধে লোহার কারবারে প্রচুর রোজগার করেছেন তার ঠাকুর্দা। মিস্টার নাগ সেই কারবারের একমাত্র মালিক। আর মিঠুয়া তাঁর একমাত্র মেয়ে। অথচ সব থাকতেও মিঠুয়া আজ নিঃশ্ব। নাগমশায়ের অতবড় প্রাসাদোপম বাড়িতে ঐটুকু মিঠুয়ার ঠাই হল না। তাকে চিরদিনের মতো চলে আসতে হয়েছে এই আগ্রামে। ওর বাপ মাঝে মাঝে আসে মেয়েকে দেখতে। মিঠু তার চাকা-গাড়ি চালিয়ে সে হাজির হয়। বাপ ওকে আদরে-আদরে মাতিয়ে তোলে। চুপ করে সে অত্যাচার সহ্য করে যায় মিঠু। কিছু বলে না। বড় বড় প্যাকেট খুলে বাপ বার করে দেয় খেলনা, লজেক্স, পুতুল। মিঠু শুধু হাত পেতে নেয় তাই নয়, সে যে খুশী হয়েছে তাও অভিনয় করে দেখায়। তারপর বাবা চলে গেলে সেগুলো দিয়ে দেয় নন্দা অথবা শিখাকে। শর্মিলা বলে--সবগুলো দিয়ে দিল যে?

ঠোট উল্টে মিঠুয়া বলে—ওসব আমার চাই না। ভাল লাগে না।

—চাই না তো নিলি কেন হাত পেতে?

—না নিলে বাপি শব্দ শব্দ দ্বন্দ্ব পেত যে !

শর্মিলা অবাক হয়ে যায়। অবাক হওয়ার কারণ আছে যে। মিঠুয়ার যে বয়স তাতে পদতুলের প্রতি মোহ থাকাটাই স্বাভাবিক। শর্মিলা তাকে যে পদতুলটা এনে দিয়েছে, নন্দাবাবু যে রামাবাড়ির সেট-টা তাকে দিয়েছেন সেগদুল নিয়ে মিঠুয়া আপন মনে খেলা করে আজও। স্কুলের আলমারিতে কিছু কিছু খেলনা কেনা হয়েছে। সেগদুলির প্রতি মিঠুয়ার তীব্র আসক্তি আছে। মাঝে মাঝে সেগদুলি তাকে বার করে দেওয়া হয়। সেদিন মিঠুয়ার সংসারে ভারি হৈ চৈ পড়ে যায়। সে রান্না করে, পদতুলকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। নন্দা, শিখা, মিনি আর শর্মিলাকে নিমন্ত্রণ করে তার খেলাঘরের প্রেটে খাবার বিতরণ করে। অথচ মিস্টার নাগের পদতুলগুলো নিয়ে সে কোনদিন খেলা করতে বসে না। শর্মিলা সেগদুলিকেও সাজিয়ে রাখে পদতুলের আলমারিতে। এমনকি পাঁচসাত দশদিন বাদেও যদি আলমারি থেকে সে পদতুল বার করে দেয়, মিঠুয়া বলে—না, ওগুলো নয়, তুমি ঐ চীনে পদতুলটা দাও বরং।

শর্মিলা চাইল্ড সাইকলজির বই ঘেঁটেছে, মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছে। এখন সে বুঝতে পারে ব্যাপারটা। বাপের প্রতি তার মনোভাব দুটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। বাপকে সে করুণা করে, বাপকে সে ঘৃণা করে। মিস্টার নাগের দুটি সত্তা সে দেখতে পেয়েছে। একটা তার মায়ের স্বামীরূপে, একটা তার বিমাতার স্বামী হিসাবে। ওর মায়ের মৃত্যুর পর যে বাপ ওর মাথাটা বন্ধে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল, ওর সেই অতীত বাপকে সে আজও করুণা করে, তার স্নেহের অত্যাচার সে সহ্য করে, তার এনে দেওয়া খেলনা হাত পেতে নেয়, মুখে ফুটিয়ে তোলে খুশীর আমেজ। কিন্তু ওর বর্তমান-বাপকে সে ঘৃণা করে। তার দেওয়া খেলনা-পদতুল নিয়ে খেলতে বসে না। স্পষ্ট মাত্র করে না আর।

মাস্টার-মশায়ের দেওয়া এ ব্যাখ্যাটাও মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল শর্মিলার। এতটুকু মেয়ের মধ্যে অমন ঐক্যসত্তা থাকতে পারে? মিঠুয়ার মাসির কাছে গম্প শব্দে মনে হয়েছিল হয়তো তাও সম্ভব। মিঠুয়ার মাসি প্রায়ই আসেন। শর্মিলাকে তিনি বলেছিলেন ওর পূর্ব ইতিহাস। মাসিকে মিঠুয়া ভারী ভালবাসে। বোধ হয় তাঁর মধ্যে হারানো মায়ের মৃত্যুর কিছুটা আদল পায়। মাসির আদরে পায় মায়ের সোহাগের ছোঁওয়া। সেই ভদ্রমহিলাই গম্প করেছিলেন, ওর বাপের ভীষণ ভয় ছিল মিঠুয়াকে। দ্বিতীয়বার যে বিয়ে করতে যাচ্ছেন এই সত্য কথাটা কিছুতেই মৃত্যু ফুটে বসতে পারেননি একফোটা ঐ বিকলাঙ্গ মেয়েটাকে। এদিকে সব ঠিকঠাক; অথচ মিঠুয়াকে কেমন ভাবে খবরটা জানানো যায় ভেবে উঠতে পারেন না। মিঠুয়া যখন মাতৃহীন হয় তখন তার বয়স বছর-চারেক। তারপরে সে অসুখে পড়ে। এবং তারপরই

সে পঙ্গু হয়ে যায়। বিকলাঙ্গ মেয়েটিকে কেমন ভাবে মানুষ করবেন ভেবে উঠতে পারেন না। আত্মীয় পরিজনদেরা ব্যবস্থা দিলেন দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে। প্রথমটায় তাঁর মত ছিল না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন। মাত্র পঁচাত্তিশ বছর বয়স তাঁর। দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে। অন্তত মিঠুয়ার মার্স সে জন্য তাঁকে দোষ দেন না। দোষ দেন তাঁর নির্বাচনের। যে মেয়েটির প্রেমে পড়ে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন সে প্রথমই শর্ত আরোপ করল মিঠুয়ার ঝামেলা সে ভোগ করতে রাজী নয়। ফলে যে জন্যে বিবাহ করতে যাওয়া সেই উদ্দেশ্যটাই প্রথমে ব্যর্থ হল। অথচ মনের লাগাম তখন ছিঁড়ে গেছে মিঠুয়ার বাপের। শেষকালে নাগমশাই মাসির শরণ নিলেন। মার্স বলোছিলেন, দেখুন, বিয়েটা যখন মিঠুর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেছে না তখন তাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান। আমার কাছে সে থাকুক আপাতত। তারপর সুযোগমতো একদিন তাকে সব কথা খুলে বললে হবে।

ভদ্রমহিলা বলেন, বৃদ্ধলেন দাঁদি, আমার ভাগিনীপতি আর দ্বিরুক্তি করেননি। মেথেকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন আমার বাসায়। আমরা কেউই মিঠুকে কিছু বলিনি। কেন যে সে হঠাৎ এ বাড়িতে এল তা তাকে বৃদ্ধতে দেওয়া হয়নি। আমার ছেলেমেয়ে, বাড়ির কি-চাকরদের বলে দিয়েছিলাম মিঠুয়ার বাপ যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে এ কথা যেন তাকে কেউ ঘণাক্ষরেও জানবার সুযোগ না দেয়। ওর বাপও লজ্জায় আমাদের বাড়িতে আসত না। মিঠুয়াকে আমরা নানা ভাবে ভুলিয়ে রাখি আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে থাকে, খেলা করে। ও চিরকালই শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। তাই ওর কোন ভাবান্তর হয়ে থাকলেও তা আমাদের কারও নজরে পড়েনি। আশ্চর্য, ও কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবার নামও করে না। বাপের কথাও জিজ্ঞাসা করে না একেবারে। শেষে একদিন স্থির করলাম ওকে ব্যাপারটার ইঙ্গিত দিতে হবে। একটু একটু করে কয়েকদিনের মধ্যে ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে কত বড় পরিবর্তন হয়ে গেছে ওর জীবনে। সাত আট বছরের মধ্যে সবটা বৃদ্ধতে পারবে না, তবু তাকে বৃদ্ধবার সুযোগ দেওয়া উচিত যে, এতদিনের আবাসের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা অনেক ক্ষীণ হয়ে গেছে। তাই মাসখানেক পরে একদিন নিজে থেকেই বললাম, হ্যাঁরে মিঠু, তোর বাবার জন্য মন কেমন করে না?

ও চুপ করে রইল।

বলি, তোর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না?

বললে, ইচ্ছে করলেই বা সেখানে আমাকে যেতে দেবে কেন?

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন রে? যেতে দেবে না কেন?

এর জবাবে ও কী বললে জানেন? বললে, বাপি তো আবার বিয়ে করেছে।

আমাকে সেখানে ঢুকতেই দেবে না।

আমি তো অবাক ! বন্ধুণ কাণ্ড । মাঠ সাড়ে-সাত বছরের মেয়ে । কেমন করে আন্দাজ করল সে ? আড়াল থেকে আমাদের কোন কথাবাতা শুনছে, না একটা অঙ্গ খঁতো হওয়ায় ওর কোন ঝঠ হাঁশ্চর্য প্রখর হয়ে উঠেছে ? তা সে যাই হোক, সব জেনেও সব বন্ধেও সে তো একেবারে চূপচাপ ছিল । কাঁদোন কোনদিন । রাগ করেনি, অভিমান করেনি । এমন অনাসক্তভাবে কেমন করে সে গ্রহণ করল এতবড় দঃসংবাদটাকে ?

বলি, তুই কেমন করে জানলি ?

মুখটা নিচু করে বলে, আমি জানি ।

—বিয়ে করেছে তো কি হয়েছে ? তাই বলে তুই বাড়ি যাবি না ?

বেণী ঝাঁকিয়ে মিঠুয়া শূধু বসলে, না ।

বললুম, কেন রে ?

ও জবাব দিল না । মুখটা নিচু করে বসেই রইল তার চেয়ারে । বড় বড় জ্বলের ফোঁটা এতক্ষণে টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ল ওর আনত গাল বেয়ে ।

হু-হু করে উঠল বন্ধের মধ্যে । ওকে দহাতে জড়িয়ে ধরে বলি, দর বোকা মেয়ে । কাঁদে নাকি । নতুন মা তোকে কত ভালবাসবে । কত খেলনা কিনে দেবে, পতুল কিনে দেবে, আদর করবে—

ও শূধু মুখটা নিচু করে বলে, না ।

—না কেন ? তুই মেয়ে, তোকে ভালবাসবে না ?

—না ।

—না কেন রে ?

এতক্ষণে ফর্দিয়ে কেঁদে ওঠে মিঠুয়া । আমার বন্ধে মুখ লুকিয়ে বলে, আমি যে খোঁড়া !

শর্মিলা প্রগ্ন করেছিল —ওর নতুন মা ওকে নিয়ে যান্নি একবারও ?

মাসি দীর্ঘবাস ফেলে বলেছিলেন—না ।

—এমনকি মেয়েকে দেখতে আপনাদের বাড়িতেও আসেনি ?

মিঠুয়ার মাসি হেসে বলেছিলেন—কই আর এল বলুন ! মিঠুয়া আজও দেখেনি তার বিমাতাকে । আমাদের বাড়ি থেকেই তো সে এখানে চলে আসে ।

—মিস্টার নাগ ওকে নিয়ে যেতে চেষ্টাই করেননি ?

—চেষ্টা করেছিলেন, মিঠুয়া যান্নি । এদিকে দেখতে খুব শান্ত সরল, কিন্তু আসলে ভারি জেদী আর একগুঁয়ে । ওর বাপকে খবর দিয়েছিলাম, জানিয়েছিলাম, মিঠুয়া সব কথা জানতে পেরেছে । ভদ্রলোক ছুটে এসেছিলেন খবর পেয়ে, একগাদা দামী দামী খেলনা পতুল নিয়ে । কিন্তু কি যে হল মেয়ের ।

বাপ এসেছে খবর পেয়েই হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল বাথরুমে। দরজার নিচের দিকে একটা ছিটকিনি করিয়েছিলাম ওর জন্যে। সেটা বন্ধ করে বসে রইল একটা বেলা। বাড়িসুদ্ধ কেউ বাথরুমে যেতে পারে না। ঘণ্টা-তিনেক অপেক্ষা করে মদ্য কালো করে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন, তখন দরজা খুলে দিল মেয়ে। আমরা কত বোঝালাম, বোবা জন্তুর মতো ও মদ্য বদজে চুপ করে রইল। একটা কথাও বলল না, একফোটা জল পড়ল না ওর চোখ দিয়ে। ভাবলাম এতক্ষণে বোধ হয় রাগটা পড়েছে। একটা প্রকাণ্ড ডল-পদ্মুল ওর কোলে দিতেই মট করে তার মদ্য ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

আজও শর্মিলার ভয় হচ্ছে তাই। সে ওদের শুল ছেড়ে চলে যাবে শুনবে মিঠুয়া কি আবার বাথরুমে গিয়ে ঢুকবে? সেই নাটকটার পুনরাবৃত্তি হবে আবার? মিঠুয়া কি আর কথা বলবে না তার মা-মণির সঙ্গে? দুরন্ত আভ্যমানী মেয়েটাকেই আজ সবচেয়ে ভয় হচ্ছে শর্মিলার।

মিস্টার নাগ অবশ্য এখন প্রায়ই আসেন। শর্মিলা একদিন বাধ্য হয়ে বলেছিল—দেখুন মিস্টার নাগ, কথাটা হয়তো ভাল লাগবে না আপনার, তবু প্রতিষ্ঠানের মদ্য চেয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে, এতসব খেলনা পদ্মুল আপনি রোজ রোজ নিয়ে আসবেন না।

মিস্টার নাগ অবাক হয়ে বলেছিলেন—কেন বলুন তো?

একটু কঠিন হয়ে শর্মিলা সেদিন বলেছিল এখানে সবাই তো বড়লোকের মেয়ে নয়। আমরা ওদের একভাবে মানুষ করতে চাইছি। আপনার এসব উপহার তার মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

মিস্টার নাগ একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন—আপনাদের তো মাত্র তিনটি মেয়ে আছে। আমি যদি এর পর থেকে ওদের তিনজনের জন্যেই উপহার নিয়ে আসি?

শর্মিলা বলে—কী দরকার? এদের জন্য যদি সত্যি আপনি টাকা খরচ করতে চান তাহলে আমাদের ডোনেশন দিন না। চাঁদার খাতা তো আমরা বাড়িয়েই আছি। আর শুধু যদি মেয়েকে ভালবাসা দেখাতে চান তাহলে তাকে বাড়ি নিয়ে যান।

অনেকক্ষণ জবাব দিতে পারেননি নাগমশাই। তারপর বলেন—সব কথা তো আপনাকে বলা যায় না। সম্ভব হলে মেয়েকে নিয়েই যেতুম কিন্তু—

শর্মিলা একটু নরম হয়ে বলেছিল—জানি। আপনি না বললেও আপনার পারিবারিক সমস্যাটা কিছু কিছু শুনছি আমি। কিছুটা আপনার মেয়ের কাছে কিছুটা তার মাসির কাছে থেকে।

ভদ্রলোক হঠাৎ বলে ওঠেন—আচ্ছা, আমি যদি ওকে মাস-কয়েকের জন্য আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই, আপনারা হেঁড়ে দেবেন?

—মাস কতকের জন্য ? ওর নতুন মা—

কথাটা সে শেষ করতে পারেনি। সন্ধ্যাে খেয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক মাথাটা নিচু করে বলেন—তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন। মাস তিনচার সেক্ষানেই থাকবেন।

ইতস্তত না করে শর্মিলা প্রসন্ন করেছিল—ইস শী ইন এ ফ্যামিলি ওয়ে ?

ভদ্রলোক স্বীকার করে বলেছিলেন—সুতরাং মাস তিনচারের জন্য মিঠুয়াকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই মানে যতদিন না ওর মা—

শর্মিলা বাধা দিয়ে বলেছিল, তা হয় না। দেখুন মিস্টার নাগ, অপ্রিয় হলেও কথাটা আমাকে বলতে হচ্ছে। ট্রান্সপ্লান্টেশনে গাছ বাঁচে, কিন্তু টানা-ছেঁড়ায় বাঁচে না। ওকে এত শৈশবে আমরা তুলে এনে এখানে রোপন করেছি যে, আমাদের আশা আছে এখানেই একদিন ফুলে ফলে ও বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু বারে বারে এ টানাপোড়েন তো ও সহ্য করতে পারবে না। যে পরিবেশে ওর কোনদিনই স্থান হবে না সে পরিবেশটা ওর স্মৃতি থেকে মুছে যেতে দিন। শুনতে খুবই খারাপ লাগবে আপনার, কিন্তু আপনার দেওয়া খেলনাগুলো ও স্পর্শ মাত্র করে না। নেহাৎ আপনি আঘাত পাবেন, তাই সেগুলি হাত পেতে নেয়।

অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকেন মিঃ নাগ। বলেন—আমাকে সে খুব বুঝে করে, নয় ?

শর্মিলা বলে—ও শিশু। মাত্র সাত-আট বছরেই কতগুলো আঘাত সে পেয়েছে মনে করে দেখুন। দৈহিক আর মানসিক। ওকে আপনি মৃদু দিন।

ভদ্রলোক চশমাটা খুলে ফেললেন। রুমালে চোখটা মুছে নিয়ে বলেন—বাপ হয়ে এ যে কত বড় শাস্তি তা আপনি বুঝবেন না।

শর্মিলা হুপ করে থাকে।

একটু সামলে নিয়ে ভদ্রলোক আবার বলেন—আচ্ছা, এখনি আপনি বলছিলেন, মিঠুয়া এখানে ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। কতদূর আশা করেন আপনারা ? কী হবে ওর ?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল শর্মিলা—এখনই তা অবশ্য বলা খুব কঠিন। প্রথমত এ জাতীয় কাজ এ দেশে আগে বিশেষ কিছু হয়নি। আমাদের এটা এ অঞ্চলে পায়োনিয়ার কাজ বলতে পারেন। ফলে আমরা কত দূর সাফল্য লাভ করব তা বলা দুষ্কর। দ্বিতীয়ত এখন ওকে আমরা সাধারণ লেখাপড়া শেখাচ্ছি। ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, গাছ-ফুল-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য। একটু বড় হলে ওকে আমরা কারিগরী শিক্ষা দেব। শেলাই শিখতে পারে, কাটিগের কাজ, উইভিং-নিটিং, চামড়ার কাজ—কত কি শিখতে পারে। মোট কথা, একটা

পেট চালাবার মতো কারিগরী শিক্ষা তাকে আমরা দিয়ে দেব।

মিস্টার নাগ তার জবাবে বলছিলেন—কিন্তু তাতে কী লাভ? ওর একটা পেট চালাবার মতো ব্যবস্থা তো আমিই করে দাব। এসব না শিখলেও বাতে দূবেলা দূ-মুঠো খেতে পারে সে ব্যবস্থা কি আমিই করব না? বতই কেন না ভুলে যেতে বলুন আমাকে—এ কথা তো ভুলে যেতে পারব না যে, আমি ওর বাপ!

শর্মিলা আহত হয়ে বলে—আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন না। আমি এদের নিয়ে আছি তাই এদের মনের কথাটা আমি যে ভাবে জেনেছি সেভাবে জানবার সুযোগ আপনার হবে না। এদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আত্মনির্ভর হতে পারা। অর্থনৈতিক স্বাধীনভরতা। তা না হলে এদের মনে একটা ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স থেকে যাবেই—এবং সেজন্য এরা কিছুতেই মানসিক শান্তি পাবে না। বিকলাঙ্গ একটি মানুষ কিছুতেই শান্ত হতে পারে না বতক্ষণ না সে বুঝতে পারে সে কারও করুণার ভিখারী নয়।

—বেশ তো, ওকে উপার্জনক্ষম করে মানুষ করতে চান করুন তাতে আমি আপত্তি করব কেন। কিন্তু তা হলেই কি জীবনে সব কিছু পাওয়া হয়? আপনি কি মনে করেন, ও কোনদিন ঘর পাবে, বর পাবে?

শর্মিলা বললেন—ঘর বর পাবে কিনা জানি না, কিন্তু সম্ভাবনা যে পাবে না তা আপনিও জানেন, আমিও জানি।

—তবে? তা সত্ত্বেও আপনি আশা করেন ওর বিয়ে হবে একদিন?

—কেন আশা করব না? হয়তো অমাদের শুলের কোন ছেলেই বিয়ে করবে ওকে। ও কোনদিন তার সম্ভানের জননী হবে না একথা জেনেও—

—এ আপনার আকাশ-কুসুম কল্পনা।

—মোটাই নয়। আমাদের প্রাতিষ্ঠানে এমন ছেলে আছে, যে শারীরিক কারণে কোন সুস্থ সবল মেয়েকে বিয়ে করলেও সম্ভানের জনক হতে পারবে না কোনদিন। তেমন ছেলের হয়তো ঐ একই কারণে বিয়ে হবে না। কেন আমরা আশা করতে পারব না মিস্টার নাগ, যে সে রকম একটা ছেলে মিতুমাকে ভালবেসে জীবনসঙ্গিনী করবে না? দুটি অঙ্গহীন নরনারীর পক্ষে একটি সুখের সংসার গড়ে তোলা এমনকি আকাশকুসুম? এমনকি হয়তো দেখবেন তারা দত্তক নেবে কোন পিতৃমাতৃহীন অনাথকে। হয়তো কোন বিকলাঙ্গকেই! সম্ভানের অভাবও ভুলবে ওরা।

ভদ্রলোক উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলে ওঠেন—আপনার এ স্বপ্ন সার্থক হোক। সেদিন কোন খেদ থাকবে না আমার।

একটু থেমে আবার বলেন—সেই ভাল। তাই হোক। সুস্থ সবল কোন ছেলের সঙ্গে ওর জীবন যুক্ত না হলেই ভাল। দুটি অপূর্ণ মানুষ পূর্ণ করে

তুল্য একটা সুখের সংসার ।

শর্মিলা জবাবে বলেছিল—তাই বা কেন ? হয়তো কোন সুস্থ সবল ছেলেই বিয়ে করবে ওক, সব জেনেশুনে । ভালবাসায় কি না সম্ভব ?

মিস্টার নাগ প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলেছিলেন—তা হয় না । পূর্ণাঙ্গ কোন মানুষ কখনও বিকলাঙ্গ কোন মেয়েকে নিয়ে সুখী হতে পারে না ।

শর্মিলা এবারও প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল । মনীষাবাবু গত সপ্তাহে এমনই একটি ঘটনার কথা সবিজ্ঞারে লিখেছেন মাস্টার-মশাইকে । আর মাস্টার-মশাই তা জনে জনে দেখিয়েছেন বিম্ববৃক্ষে আহত একটি ছেলেকে বিয়ে করেছে ওদেশের একজন ধনকুবেরের কন্যা । ডেভিড ছিল পাইলট ; দুর্ঘটনায় দুটি পা-ই কাটা যায় তার । বিমানবহরে ছেলোট ছিল নামকরা পাইলট ; তার বীরত্বের কথা শুনে, তার সঙ্গে আলাপ করে মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে যায় । ছেলোট ওখানকার একটি বিকলাঙ্গদের স্কুলে শিক্ষকতা করত । মেয়েটি তাকেই ভালবেসে বিয়ে করেছে ।

সেই কথাই বলতে যাচ্ছিল শর্মিলা । থেমে পড়ল ভদ্রলোকের কথায়—সে হয় না মিসেস মিত্র ।

মিসেস মিত্র ! তাই তো ! এই তো ওর পরিচয় । আর যে বলে বলুক ও গম্প মিনেস শর্মিলা মিত্র বলতে যাবে কোন অধিকারে ? অন্তত যতদিন ওর পরিচয় হচ্ছে ‘মিসেস মিত্র’ !

কম্বাকটার এসে দাঁড়ায় ওর সামনে ।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে খুঁচরো পয়সা বাব করে শর্মিলা । টিকিট দিয়ে কম্বাকটার এগিয়ে যায় সামনের দিকে ।

আবার চিন্তার সমুদ্রে ডুব দেয় । সে মন স্থির করে ফেলে । আর দেরী করা উচিত হবে না । জগদানন্দবাবুকে আজই সব কথা খুলে বলতে হবে । সব কথা না বললেও কিছুটা বলা দরকার । তাঁকেও তো খানিকটা সময় দেওয়া উচিত । ক্রমে ক্রমে স্কুলের যাবতীয় দায়িত্বই যে শর্মিলার স্বক্শে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন মাস্টার-মশাই । শর্মিলার অবর্তমানে কী ব্যবস্থা করবেন তা তাঁকে স্থির করবার সুযোগ দেওয়া দরকার । মাস্টার-মশাই বেশ অথর্ব হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যে । নিশ্চয় মুষড়ে পড়বেন তিনি, খবরটা পেয়ে । তবু দেরী করে লাভ নেই । অনিবাধ্য আঘাত থেকে তাঁকে যখন বাঁচানো যাবে না তখন অপ্রিয় কাজটা যত শীঘ্র সম্ভব সেরে ফেলাই ভাল । বিকাশ আজই সম্ভাষ্য আসছে । আজ হোক, দুর্দিন পরে হোক বিকাশের সংসারে শর্মিলাকে চলে যেতে হবে ।

কিন্তু ভয় তো জগদানন্দবাবুকে নয়, ভয় তার মিত্ররাকে । জগদানন্দবাবু অর্থাহত হবেন, মুষড়ে পড়বেন মনে মনে, তবু মন্থে তা স্বীকার করতে পারবেন

না। মৌখিক সৌজন্যটুকু তাকে বজায় রাখতে হবে, আশীর্বাদ করতে হবে হাসি মুখে। কিন্তু মিতুয়া? সে লৌকিকতার ধার ধারে না। সামাজিকতার বালাই তার নেই। আদিম প্রবৃত্তির বশে সে চলে। অশ্ব আবেগে শিশুমনের প্রতিক্রিয়া কী রূপ নেবে কে জানে! হঠাৎ দোর দিয়ে বসে থাকবে। কথাই বলবে না তার মা-মণির সঙ্গে। সেবার যেমন করেছিল তার বাপের সঙ্গে। দুরন্ত অভিমানী মেয়েটাকেই আজ সবচেয়ে ভয় হচ্ছে তার।

মাস্টার-মশাই বসেছিলেন নিচের অফিস ঘরেই। ওকে দেখে বলে ওঠেন—এই তো তুমি আজ এসে গেছ। বাচলাম। আমি ভেবেছিলাম আজ বৃদ্ধি তুমি আসতে পারবে না।

শর্মিলা গ্লান হাসে। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে রেজিস্টার খাতাখানা তুলে নেয়। বৃদ্ধ বলেন—ওসব খাতাপত্র রাখ। শোন, জরুরী খবর আছে। আজ বিকালে একবার রাইটার্স বিল্ডিংসে যেতে হবে আমাদের। গভর্নমেন্ট বোধ হয় আমাদের কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারেন। যোগীন্দ্রনাথবাবু জানিয়েছেন, বিকালবেলা এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।

শর্মিলা মরিয়া হয়ে বলে ফেলে—কিন্তু আজ বিকালে আমার যে একটা জরুরী কাজ আছে স্যার।

—কাজ আছে? সেটা কাল হয় না?

—না স্যার। একজন আসবেন দিল্লী থেকে। তাকে রিসিভ করতে দমদমে যেতে হবে।

—ও। আচ্ছা তবে থাক। আমি একাই যাব না হয়।

শর্মিলা ভাবে এই কি সুযোগ? এখনই কি বলে ফেলবে কথাটা? যাকে আনতে যাচ্ছে দমদমের বিমানঘাটিতে সেই ওর ভাবী স্বামী! কিছুদিনের মধ্যেই তার দিল্লীর সংসারে শর্মিলাকে চলে যেতে হবে। বলতে গিয়েও মুখে বেধে যায়। যদিও এর মধ্যে একদিনের জন্যও জগদানন্দবাবু তাঁর ছাত্রের নাম মুখে আনেননি তবু শর্মিলা অনুভব করতে পারে বৃদ্ধ মনে মনে আশা পোষণ করেন যে, শম্ভু একদিন আবার তার অশ্ব স্বামীর কাছে ফিরে যাবে। আচ্ছা, আনন্দ যে অশ্ব হয়ে গেছে এ খবর কি মাস্টার-মশাই জানান? বোধ হয় না। কেমন করে জানবেন? সেই প্রথম দিনের পর থেকেই তিনি তাঁর ছাত্রের কথা শর্মিলার সঙ্গে আর কোনদিন আলোচনা করেননি। আনন্দ এমনিতেই চিঠিপত্র বড় একটা কাউকে লিখত না। এখন তো তার লিখবার ক্ষমতাই নেই। ফলে জগদানন্দবাবুর পক্ষে এ সংবাদ জানবার কথা নয়।

শর্মিলা কিছু বলার আগেই জগদানন্দবাবু অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। বলেন—কাল তুমি আসনি, আমি সারাদিন একটা বড় ইন্টারেস্টিং বই পড়ছি শম্ভু।

একজন আমেরিকান ডাক্তারের আত্মজীবনী। আত্মজীবনী অবশ্য ঠিক বলা চলে না তাকে। ভদ্রলোক পঞ্চাশ বছর সাফল্যের সঙ্গে আমেরিকায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেছেন। নামকরা সার্জেন একজন। সম্প্রতি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি তাঁর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন। বিভিন্ন সময়ের কতকগুলি কেস হিশ্ট্রি। তাঁর সুন্দর লেখা। পড়ে দেখে তুমি।

হাত বাড়িয়ে বইটি শর্মিলা গ্রহণ করে।

ভিতর বাড়িতে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল অঞ্জনের সঙ্গে। কিশোর ছেলেটির ডান পা-টা হাটু থেকে কাটা। ক্রাচে ভর দিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছিল। বললে—মা-মণি, কালকে আসেননি কেন? কাল আপনার জরিমানা হয়ে গেছে।

শর্মিলা হেসে বলে—বেশ, জরিমানাই দেব। কত জরিমানা?

—তাহলে আমাদের স্টুডিওতে চলুন, সেখানে আপনার বিচার হবে।

শর্মিলা বলে—এ ব্যবস্থাটা ভাল। জরিমানাটা হয়ে গেছে কালকে আর আত্মকে হবে বিচার! বেশ চল।

অঞ্জনের পিছন পিছন শর্মিলা স্টুডিও ঘরে ঢোকে। বেশ বড় 'হল-কামরা' একটা। ছেলেরা এখানে হাতের কাজ শেখে। কেউ মডেলিং করে, কেউ ছবি আঁকে, কেউ বা বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, চামড়ার কাজ শেখে। ও পাশে আর একটি ছোট ঘর। হ্যান্ড-প্রেস আছে সে ঘরে। ছাপাখানার কাজ হয়। তার লাগাও বুক বাইন্ডিং সেকশান। নন্দবাবু ছেলেদের কাজ শেখাচ্ছিলেন। হাত তুলে নমস্কার করেন শর্মিলাকে।

অঞ্জন বলে—মা-মণিকে ধরে এনেছি স্যার। কাল উনি ক্লাস পালিয়েছিলেন। আজ তাই ঠাঁর শাস্তি হবে।

নন্দবাবু হেসে বলেন—ব্যাপার মন্দ নয়, আজকাল কি ছাত্ররাই শিক্ষককে শাস্তি দিচ্ছে নাকি?

অঞ্জন বলে—অন্যায় করলেই জরিমানা দিতে হয় স্যার।

শর্মিলা বলে—বেশ তো, জরিমানাটা কত, আগে শুন।

বোধ হয় আগে থেকেই শেখানো ছিল। অঞ্জনের ইঙ্গিতমাতে সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে—ঠাঁর জরিমানা এক গম্প।

—এক গম্প! মানে?

—মানে ক্লাস হয়ে গেলে আমাদের একটা জমাটি ভূতের গম্প শোনাতে হবে।

শর্মিলা বলে—এই কথা? বেশ, জরিমানা দেব আমি। কিন্তু এখন আমাকে ছেড়ে দাও। মিতু-মার কাছে বাই এয়ার। দেখি, তিনি আবার কী জরিমানা করে বসে আছেন।

ছেলেরা পথ ছেড়ে দেয়। শর্মিলা পায়ে পায়ে ঝিলে উঠে আসে। মনশিবাব্দ সৌখিন লোক ছিলেন মনে হয়। সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ শ্বেতপাথরের টেবিল, তার উপর পিতলের ভাস। ক্যাকটাস লাগানো আছে তাতে। দেওয়ালে সারি সারি ছবি। প্রাকৃতিক দৃশ্য। ল্যান্ড শ্কেপ। সমস্ত ঝকঝক তকতক করছে! ছেলেরা সৈদিক থেকে শাস্ত বলতে হবে। ছবির কাঁচ ভাঙেনি, দেওয়ালে হিজিবিজি কার্টেনি।

মিনির আস্তানা ঝিলে। মশুর জন্য দোতলার সব চৌকাঠ কেটে ফেলা হয়েছিল। যাতে সমস্ত ঝিলটাতেই সে তার চাকাগাড়িতে ধরতে পারে। মিঠুয়ারও নিম্নাঙ্গ একেবারে অবশ। সে দাঁড়াতে পারে না। চাকাগাড়িতে সেও ঘোরে সারাটা দোতলায়।

মানদা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিল। হঠাৎ থেমে পড়ে বলে—ছোড়দি ভীষণ রাগ করেছে। কাল রাতে কিছতেই খাওয়ানো যায়নি তাকে। যান, রাগ ভাঙান গিয়ে।

ছোড়দি অর্থে মিঠুয়া।

—মিনি কোথায় রে?

—এই তো বেরুলেন।

সামনের ঘরেই শিখা আর নন্দা পড়তে বসেছে। টাস্ক দিয়ে মিনি বেরিয়ে গেছে কোথায়। ওকে দেখে নন্দা হাত তুলে নমস্কার করল। শিখার দহাত তুলবার উপায় নেই—এক হাতেই সেলাম করে সে।

—মিঠুদিদি কই রে?

শিখা চোখের ইঙ্গিতে দেখায়। মিঠুয়া খাটে শূয়ে আছে। দেওয়ালের দিকে মুখ করে। শর্মিলা আস্তে আস্তে গিয়ে বসে ওর শিয়রের দিকে। মিঠুয়া টের পেয়েছে নিশ্চয়। সাড়া দেয় না। মড়ার মতো পড়ে থাকে।

—কাল রাতে মিঠুদিদি নাকি খায়নি? কেন? রাগ হয়েছে?

মিঠুয়া কোন সাড়া দেয় না।

শর্মিলা জোর করে ওকে এদিকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। দহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মিঠুয়া। সে কী কান্না! ফুলে ফুলে কান্দছে সে বালিশে মুখ গুঁজে। শর্মিলা একটু অবাধ হয়ে যায়। ব্যাপার কি? এর আগেও তো সে কান্নাই করেছে। এতটা বাড়াবাড়ি তো করেনি কখনও মিঠুয়া! ওকে আদর করে, বুঝিয়ে কত রকমে শাস্ত করতে যায়। কিন্তু একগুঁয়ে জেদী মেয়েটা বিছতেই এদিকে ফেরে না, কথা বলে না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই শর্মিলা উঠে পড়ে। থাক, একটু সময় থাক। তারপর আপনিই রাগ পড়বে। উঠে এসে বসে শিখা আর নন্দার কাছে।

—মিনিদি কি পড়া দিয়ে গেছেন দেখি?

ওরা পড়া দেখায় ।

—আমি যে টাস্ক দিয়েছিলাম, তা হয়েছে ?

হ্যাঁ, তাও করে রেখেছে ওরা । দেখায় সে সব । শর্মিলা ভুল সংশোধন করে দেয় । বলে—আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিচের ছেলেরা গল্প শুনতে আসবে—

—জরিমানা তো ? আমরা জানি । বললে নন্দা ।

শর্মিলা একটু অবাক হয়ে বলে—তোমরা কেমন করে জানলে ?

—অজ্ঞানদা এসে জেনে জনে শিখিয়ে দিয়ে গেছে যে ।

—ও, তাই বল

ওরা দুজনে পড়া তৈরী করতে থাকে । একগুঁয়ে জেদী মিঠুয়া দেওয়ারলের দিকে মন্থ করে শব্দেই থাকে । শর্মিলাও রাগ করে মনে মনে বলে—থাকুক । এত অস্প কারণে এত অভিমান হলে সাধাসাধি করতে যাওয়া মর্খামি । বেশী আদর দেওয়া ঠিক নয় ।

শর্মিলা একটা চেয়ারে গিয়ে বসে । মাস্টার-মশাইয়ের দেওয়া বইটা খুলে পড়তে থাকে । অস্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বইয়ের মধ্যে ডুবে যায় একেবারে । অজানা পাঠপাঠীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যায় ক্রমে ।

আমেরিকান ডাক্তার ভদ্রলোক ভূমিকায় বলেছেন তিনি যখন এ গ্রন্থটি লিখতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স একাত্তর । সারাজীবনে যত বেশ ঘেঁটেছেন তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাঁর অসংখ্য বেস ডায়েরীতে । তাঁর থেকে পেছে বেছে কয়েকটি ঘটনা তিনি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন ভাবীকালের ডাক্তারদের জন্য । তাঁর অভিজ্ঞতার নিরিখে আগামী দিনের চিকিৎসক যেন সেইসব ভুল না করেন যেগুলি তিনি একদিন করেছিলেন । প্রথম দিকেই একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলা আছে :

তিনি তখন মিশিগানের একটি বিখ্যাত হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত । সে তাঁর প্রাথমিক যুগ । বয়সে তরুণ । হাসপাতালের শল্যচিকিৎসক । ওরই ওয়ার্ডে একটি রোগী এল একদিন । মিসেস স্মিথ । তাঁর স্বামীও এসেছিলেন সঙ্গে । ভদ্রলোক অটোমোবাইল এঞ্জিনিয়ার । মিশিগানের একটি কারখানায় যুক্ত আছেন । দুজনেরই অস্প বয়স । মাত্র বছর-খানেক হল বিয়ে হয়েছে তাঁদের । স্ত্রী আসন্নপ্রসবী । কারখানার ডাক্তারবাবু রোগীকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু আশঙ্কা করে মিস্টার স্মিকে বলেছেন অবিলম্বে বড় হাসপাতালে রোগীকে স্থানান্তরিত করতে ।

ডাক্তারবাবু মিসেস মার্গারেট স্মিথকে পরীক্ষা করলেন । অকুণ্ঠিত হল তাঁর । তাঁর সে পরিবর্তন মিস্টার স্মিথের নজর এড়াননি । সাগ্রহে বলেন—কী বলছেন ডক্ ?

—আরও চাবিশ ঘণ্টা আগে আপনি এলেন না কেন ?

—কেন ? বাচ্চা কি বেঁচে নেই ?

—এখনও বেঁচে আছে, তবে প্রসবকাল পর্যন্ত বোধ হয় থাকবে না ।

স্মিথ একেবারে মুষড়ে পড়েন । এইটাই ঔদের প্রথম সন্তান । বলেন—
কোন রকমেই কি বাচ্চাকে বাঁচানো যায় না ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু বলেন—কঠিন কেস, তবু চেষ্টা আমাদের করতেই হবে ।

—চেষ্টা করবেন ?

—নিশ্চয় । স্বাভাবিক প্রসব সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলে বাচ্চা বাঁচবে না ।
এখনই ওকে সিজারিয়ান করে বার করে আনব ।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে অপারেশন থিয়েটারে পাঠিয়ে দিতে বলেন ।

জ্যেৎসিং গাউনটা গায়ে চড়াতে চড়াতে ডাক্তারবাবু ফের প্রস্থ করেন—একটা
কথা মিস্টার স্মিথ, যদি দৃষ্জনকেই একসঙ্গে বাঁচাতে না পারি—

তাকে কথটা শেষ করতে না দিয়ে মিঃ স্মিথ বলেন—তাহলে শুদ্ধ বাচ্চার
মাকেই বাঁচাবেন ।

ডাক্তারবাবু সায় দিয়ে বলেন—ঠিক কথা । এ আপনাদের প্রথম সন্তান ।
নেহাৎ যদি না বাঁচে, কী করা যাবে ? তবে আপনার স্ত্রীকে পরীক্ষা করে
দেখলাম—তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । পরের বার সুস্থ সবল সন্তান না হবার
কোন কারণ নেই ।

—কিন্তু এবারই বা এমন হল কেন ?

ডাক্তারবাবু অপারেশন থিয়েটারে যাবার জন্য উঠে পড়েছিলেন । বলেন
—সে একাডেমিক ডিস্কাশানটা না হয় ফিরে এসে করা যাবে ।

—আল্যাম সরি ! লিঙ্কত হয়েছিলেন স্মিথ সাহেব ।

আলোকোজ্জ্বল অপারেশন থিয়েটারে এসে প্রবেশ করেন সার্জেন ।
রোগীকে তার আগেই তোলা হয়েছে টেবিলে । যন্ত্রপাতির চলমান ট্রেখানা
যথাস্থানে নীত । আ-সেপটিক গ্রাভস্টা পরতে পরতে ডাক্তারবাবু এগিয়ে
আসেন । অ্যানাসথেটিস্ট মিসেস স্মিথের মুখের কাছে সম্মোহনীয় চোঙাটা ধরবার
উপক্রম করতেই রোগিণী বলে ওঠেন—টেল মি ডক, ইস্ ইট ডেড ?

ডাক্তারবাবু সে প্রশ্নের জবাব দেননি । প্রয়োজন ছিল না, কারণ জবাব
দিলেও তা শুনতে পেতেন না মিসেস স্মিথ । অচেতন ঘুমে ঢলে পড়লেন
রোগিণী ।

দ্রুতহস্তে অস্ত্রোপচার করে চলেন তিনি । ছুরি তো নয় যেন মীরজাপ,
—বীণকার যেন দ্রুতচ্ছন্দ ঝালা বাজাচ্ছেন । আলতো আঙুলে একটার পর
একটা অস্ত্র তুলে নিচ্ছেন । আসন্নপ্রসবার উদরদেশে নিপুণ হাতে ছুরিটি
বিসিয়ে দিলেন । ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো, রোজই যেমন রাঙিয়ে দেয়

তাকে। একটার পর একটা অশ্রু যোগান দিয়ে যাচ্ছে সহকারী নার্স। জোয়ারালো আলোর বন্যার ভেসে যাচ্ছে গর্ভের অশ্রুকার। তারই ভিতর থেকে উদ্ধার করে আনলেন সেই মাংসপিণ্ডটাকে। দিলেন তুলে নার্সের হাতে। দ্রুতহস্তে আবার সেলাই করে চলেন ক্ষতমুখ। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। অভ্যস্ত ছন্দে কাজ হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্বত থামল তেহাইএর বোল। সামনে এসে থামলেন সার্জেন। ঝুরে দাঁড়ালেন, ঐকি! নার্স চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কেন শিশুটিকে নিয়ে! হাত বাড়িয়ে শিশুটিকে গ্রহণ করেই বৃষ্ণতে পারেন তার কারণ। এত পরিশ্রম সবই বার্থ হয়েছে। শিশুটি বেঁচে নেই। স্টিলবর্ন বেব। কন্যাসন্তান। কিন্তু এ আবার কি? শিশুটির বাঁ-পায়ের ‘ফিমার বোনটা’ নেই। বাঁ-পায়ের হাড়ি কোমরের কাছে গজিয়েছে—জানু বলে কোন কিছু নেই বাম অঙ্গে। ডান পায়ের তুলনায় তাই বাঁ পা-টা অনেক ছোট। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ঠর। এ ভালই হয়েছে যে, এ মেয়ে জীবিত জন্মগ্রহণ করেনি। শিশুটিকে ভাল করে পরীক্ষা করবেন বলে তুলে ধরেন আলোর সামনে। আবার চমকে উঠতে হল তাকে। ঐ কি! শিশুটি তো মৃত নয়, মৃন্মূর্ষ, কিন্তু এখনও বেঁচে আছে। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হয়নি; কিন্তু হৃৎস্পন্দনও বন্ধ হয়নি ওর। মায়ের সঙ্গে রক্তের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে, অথচ স্বাভাবিক শ্বাসকর্ষ শুরু হয়নি এখনও। ওকে বাঁচাতে হলে এখনই ওর মূখটা খুলে দিতে হবে। বাচ্চাকে কাদাতে হবে। অভ্যাসবশত সে কাজ করতে গিয়েই হঠাৎ থেমে পড়েন ডাক্তারবাবু।

কী দরকার? ওর বাপ জানে সন্তান মৃত মায়েরও তাই আশঙ্কা; নার্স তো ধরেই নিয়েছে বাচ্চা প্রাণহীন! অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যদি তিনি বলেন যে, বাচ্চাকে বাঁচানো গেল না, মা ভালই আছে, তাহলেও শক্তির নিঃশ্বাস ফেলবে শিশু। মাগারেট হয়তো কাদবে কিছুদিন; তারপর ভুলে যাবে। সদ্য বিবাহিত একটি রুমণী বেশী দিন এ কথা মনে রাখবে না। আবার নতুন সন্তান আসবে ওর কোল জুড়ে ভুলিয়ে দেবে নান্দেখা প্রথম সন্তান হারানোর দুঃখ। বিশেষ যখন সে জানতে পারবে ওর প্রথম সন্তানটি ছিল বিকলাঙ্গ।

কিন্তু যদি এ মেয়েটি বেঁচে ওঠে! ঐ বিকলাঙ্গ বাচ্চা মেয়েটির অনাগত ভবিষ্যৎজীবন যেন মৃত্যুর মধ্যে ভেসে উঠল ডাক্তারবাবুর চোখে। ডাক্তারবাবু লিখেছেন—‘ওর সমস্ত জীবনটা যেন দেখতে পেলুম এক কহমায়। স্কুলের মেয়েরা ওকে ঠাট্টা করে, ভ্যাংচান সবাই চুটোছুটি করে, স্কিপিং করে, খেলে— আর ও চুপচাপ বসে থাকে একা উইলো গাছের ওলায়। আরও বড় হয় মিস স্মিথ, বাড়িতে সদ্যটার আসে না, ল্যাংড়া মেয়েকে নিয়ে বাপ মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি শেষ নেই। বিয়ে হয় না ওর, হওয়া সম্ভব নয়। শেষ পর্বত হয়তো মনের

দুঃখে আত্মহত্যা করে বসে একদিন।

“লিখতে বতক্কণ লাগল তার একশো ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই এত কথা মনে হয়েছিল আমার। বাচ্চাটাকে ধরে রেখেছিলুম আমার গ্লাভস-পরা দুটি হাতের তালুতে। ডান হাতের বড়ো আঙুলটা ওর কণ্ঠনালীতে পশ করে আছে। নিজের অজ্ঞাতেই নেটা কাঁঠন হয়ে উঠল। আর দশ সেকেন্ড তার পরেই অক্সিজেনের অভাবে ওর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। যদি নেহাৎ না যায় একটু চাপ দিলেই হবে আঙুলের! হ্যাঁ, আর দেরী করা উচিত নয়। মেয়েটির সমস্ত জীবনব্যাপী অপমান, লাঞ্ছনা আর হাহাকারের চরম শাস্তি আমার হাতেই ঘটে যাক। ওকে আমি মৃত্তি দিচ্ছি। ডান হাতের বড়ো আঙুলটায় একটু চাপ দিতে গেলুম।

“কী বিচিত্র এ জীবনের খেলা! কী অপূর্ব পারিকল্পনা দীন-দুনিয়ার মালিকের। ঠিক সেই মুহূর্তেই অপারেশন থিয়েটার বিদীর্ণ করে কে যেন চীৎকার করে উঠল মার্ভার! খুন! খুন!

“আমি এমনভাবে চমকে উঠেছিলুম যে আমার হাত থেকে বাচ্চাটা হস্তোত্তপন্ন হয়ে পড়েই যেত আর একটু হলে। কে এমনভাবে চীৎকার করে উঠল? আমার বিবেক” ইঠাৎ লক্ষ্য হল আমার হাত থেকে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিচ্ছে নাস। ‘দুঃখের প্যারলুম ঘটনাটা। না, আমার বিবেক নয়, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে সদ্যোজাত শিশুটিই আত্ননাদ করে উঠেছে। না, আত্ননাদ নয়, জয়গ্লান! জীবনের বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে সে চীৎকার করে।

“এ কথা আজও কেউ জানে না। ঠিক সেই চরম মুহূর্তে বাচ্চাটা যদি কেঁদে না উঠত, তাহলে এই আত্মজীবনীতে আমাকে আজ স্বীকার করে যেতে হত—আমি খুনে, মার্ভার! ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন এক মুহূর্তের জন্য। তবু আজও মনে হয়, ‘অ্যাটেনশন টু মার্ভার’ অপরাধে আমার শাস্তি হওয়া উচিত। আমার এ স্মৃতিকথা পড়ে পাঠক যদি আমাকে ঘৃণা করেন, তাহলে সেই ঘৃণাই হবে আমার শাস্তি। তাঁদের তিরস্কারেই হবে আমার প্রায়শ্চিত্ত।”

— মা-মণি।

শর্মিলা মুখ তুলে তাকায়। পড়তে পড়তে একেবারে ভ্রম হয়ে গিয়েছিল। বাস্তবে ফিরে আসে এতক্ষণে। শিখা উঠে এসেছে তার কাছে। কনুই থেকে কাটা হাতখানা দিয়ে সে ওকে মৃদু মৃদু ঠেলেছে। বই মৃদু উঠে বসে শর্মিলা, বলে—কী রে?

—মিঠুয়া আজ সকালেও কিছুর খায়নি মা-মণি। কাল থেকে না-খেয়ে আছে।

শর্মিলা বিরক্ত হয়ে বলে—তা না খেলে আমি কী করব?

তাকায় সে মিঠুয়ার দিকে । দেওয়ালের দিকে মূখ্য করে তেমনি ভাবেই শূন্যে আছে মিঠুয়া ।

শিখা বলে— মিঠুয়া কাদিতে কাদিতে ঘুমিয়ে পড়েছে ।

শর্মিলা উঠে পড়ে । হাতঘড়িতে দেখে প্রায় বারোটা বাজে । এবারে ওদের খেতে দেবার সময় । এখনই ঘণ্টা পড়বে একতলার পেটা ঘড়িতে । বলে— হঠাৎ মিঠুয়া এত চটে গেল কেন রে ?

শিখা জবাব দেয় না । শর্মিলার আঁচলটা বাঁ হাতের আঙুলে জড়াতে থাকে— কিরে, কথা বলছিস না যে ?

কি জানি কেন লজ্জা পায় শিখা । মূখ্য লুকিয়ে বলে— মিঠুয়া জানতে পেরেছে ।

—জানতে পেরেছে ! কী জানতে পেরেছে ?

—আমরা সবাই জানি । দিদি যখন বড় মাস্টার-মশাইকে বলছিলেন তখন পাশের ঘর থেকে আমরা সব শুনছি ।

শর্মিলা কৌতূহলী হয়ে ওঠে— কী বলছিলেন মিনি ?

—তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে । তুমি আমাদের ছেড়ে দিল্লি চলে বাবে ।

স্তম্ভিত হয়ে গেল শর্মিলা !

আশ্চর্য । তবু মাস্টার-মশাই তাকে কিছু বলেন নি ! আর তাই আজ মিঠুয়ার এই দুরন্ত অভিমান ! ও যে ঘরপোড়া গরু । বাপকে ভালবেসেছিল ; সেই বাপ ওকে ফেলে পালিয়েছে বিয়ে করতে । আজ সে তার মা-মণিকে ভালবাসে । আজ আবার তার মা-মণি তাকে ফেলে পালাবার তাল করছে । এবারও সেই বিয়ে করতে ।

কেন যেন বৃকের মধ্যে মূচড়ে ওঠে শর্মিলার । একবার ভাবে, না, এভাবে সে চলে যেতে পারবে না । এতগুলি অনাথ ছেলেমেয়েকে ভাসিয়ে মাস্টার-মশাইকে অকূল সমুদ্রে ফেলে সে চলে যেতে পারবে না । বিকাশ তাকে কী দেবে ? ঘর, সংসার, সন্তান ? না, চাই না তার । এই তার ঘর, এই তার সংসার, এতগুলি তার সন্তান ।

ঢং ঢং করে খাবার ঘণ্টা পড়ল নিচেকার পেটা ঘড়িতে ।

ভূতের গম্প কিন্তু আর শোনাতে হয়নি শর্মিলাকে । ছেলেরা ওর জরিমানা মাপ করে দিয়েছে । একটা অঙ্কহানি হলে ভগবান গোষ হয় অন্য কিছু দিয়ে ক্ষতিপূরণ পূর্ণিষে দেন । ওর মথের দিকে তাকিয়েই হেলেরা বৃদ্ধিতে পারে কিছু একটা অবটন ঘটে গেছে আজ । মা-মণির মূখটা থমথম করছে । মাস্টার-মশায়ের সেই সদাহাস্যময় মুখে নেমেছে অমাবস্যার অশ্রুবার । মানদা একবার চুপিচুপি বলে গেল— আজ আর কেউ দুরন্তপনা করো না ।

দেখছে তো ব্যাপার ?

হ্যাঁ, তা দেখেছে বইকি। কী যে হয়েছে তা কেউ জানে না, তবে কিছু একটা যে হয়েছে এটুকু বুদ্ধবার মতো বুদ্ধি ওদের আছে। বুদ্ধবার কক্ষ মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে মা-মণির অনেকক্ষণ ধরে কী যেন কথাবার্তা হয়েছে, তা ওরা জানে। মা-মণি ওদের ছেড়ে চলে যাবেন, এমন একটা কানাকড়াও শোনা যাচ্ছে। বুদ্ধিমান ওরা, তাই আর গম্প শোনার বাসনা খরল না আজ।

বেলা তিনটে নাগাদ সে বেরিয়ে পড়ে। প্লেন আসবে সম্ভ্রান্ত সাতটায়। এত আগে বের হবার কোন দরকার ছিল না। কিন্তু কি-জানি-কেন ঐ বাড়িটা যেন আজ ওর বুদ্ধের ওপর জগন্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। কতকগুলো বিকৃত বিকলাঙ্গ মাংসপিণ্ড! ওখানে কি থাকা যায়? প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। নাঃ, এখান থেকে পালাতে হবে। এ দুর্নিয়াম স্নেহ-প্রেম-মায়ী-মমতা কিছু নেই। শূন্য স্বার্থের খেলা। এ পৃথিবীতে যারাই শূন্য হয়েছে তারাই স্বার্থপর। ভদ্রভাষায় তাকে আত্মকেন্দ্রিক বলতে পার—তাতে শব্দটাই বদলায়, ভাবার্থটা একই থাকে।

মা. দাদা, বউদি ঠোঁট চান সে বিকাশের সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধুক। বিকাশ ওদের সমাজের মানুষ, তার পদমর্যাদা আছে, অর্থকৌলিন্য আছে। এমন জামাই গর্ব করে পাঁচজনকে দেখানো যায়। তাই তাদের গরজ। উমা ছুটে এসেছিল তার বউদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। উদ্দেশ্য সেই এক—স্বার্থ। দাদার সংসারে কতদিন সে হাঁড়ি ঠেলবে? কে জানে, এতদিনে হয়তো মনের মানুষের স্থান সেও পেয়ে গেছে। দাদার হেঁসেলের ভার কারও খাড়ে চাপাতে পারলে সেও নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘর বাঁধতে যেতে পারে। ও চলে যাবে শূন্যে মিনি মিস্তির আজ শূন্যে ডগমগ। ভগিনী করে আবার শূন্যে জ্ঞানানো হল। সেও সেই স্বার্থের খেলা। শর্মিলা থাকায় এ প্রতিষ্ঠানে সে একাধিপত্য বিস্তার করতে পারছিল না। এতদিনে তার অপ্রতিষ্ঠানীয় প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হল। স্বার্থকে কে নয়? ঐ যে ছোট্ট মিঠুয়া, ওর অভিমানের মূল কোথায়? মা-মণির উপর সে নির্ভর করোঁছিল। আজ সেই মা-মণি তাকে ছেড়ে চলে যাবে শূন্যে সে ক্ষেপে গেছে। শূন্যে খারাপ লাগছে কিন্তু সেও কী ঐ স্বার্থের নির্দেশে নয়?

এমন কি এমন যে মহামানব মাস্টার-মশাই, তাঁর ব্যবহারটাই বা কি? সমস্ত কথা শূন্যে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—নতুন সংসারে গিয়ে তুমি শান্তি পাও এই কামনা করি।

শর্মিলা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন সহজে, এমন অনাস্রাসে তিনি বিদায় জানাবেন তা যেন কল্পনাই করেনি। কিন্তু মাস্টার-মশায়ের মনোবলও শূন্যে

পড়ল অচিরে। সেই একই কথা—স্বাধ!

শর্মিলা বললে—আপনার খুবই অসুবিধা হবে। কাকেই বা দায়িত্বভার দেবেন এর পর?

মাস্টার-মশাই ডয়্যার থেকে একখানা খাম বার করে বলেছিলেন—ভালো কাজে ভগবানই সাহায্য করেন। এ চিঠিখানা মাসাতিনেক আগে পেরেছিলাম। জবাবে লিখেছিলাম, সময়মত জানাব। এ দিন যে একদিন আসবেই তা জানতাম আমি। এবার সময় হয়েছে। এবার আসতে বলব ওদের।

চিঠিখানা হাতে করে বোকার মতো দাঁড়িয়েই থাকে শর্মিলা।

—পড়ে দেখ।

যন্ত্রচালিতের মতো খাম থেকে চিঠিখানা বার করে পড়ে। চিঠি লিখেছে উমা। আনন্দের জ্বানীতে। সংক্ষেপে জানিয়েছে তার একক জীবনের কথা, তার দৃষ্টিহীনতার কথা। কর্মহীন মানুষটা মাস্টার-মশায়ের কাছে আগ্রহ ভিক্ষা করেছে। উমাকে নিয়ে সে এখানে চলে আসতে চায়। উমা এখানে অনেক কাজ করতে পারে। অশ্ব হলেও আনন্দ অনেক কাজে সাহায্য করতে পারে মাস্টার-মশাইকে। খোলাখুলি লিখেছিল মাহিনা সে চায় না, শব্দে আগ্রহ চায়।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে শর্মিলার। দাম্পত্যজীবনের সমস্যার কথা আনন্দকে বলতে হয়েছে। অতি সংক্ষিপ্ত অথচ স্বেচ্ছভাষায় বলেছে তা। জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনে নাকি ভুল হয়েছিল আনন্দ মিত্রের। ধনী পিতার কন্যা তার মতো নিম্নমধ্যবিত্তের সংসারে অর্থনৈতিক রুদ্ধসাধনে অশক্ত হওয়ায় সে তাকে মৃত্তি দিয়েছে।

মাস্টার-মশাই বলেন—আনন্দ তো জানে না যে, তুমি এখানেই কাজ করছ!

শর্মিলা কোন জবাব দেয়নি। চিঠিখানা ফেরত দিয়েই উঠে পড়েছিল। এ বিষয়ে সে মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে আলাপ করতে রাজী নয়। মোট কথা, তাই মাস্টার-মশাই আজ মৃদু পড়েননি। শর্মিলা যেতে চায় যাক—উমা আসবে দায়িত্ব নিতে। তার উপর আসছে তার প্রিয় ছাত্র। অশ্ব হলেও আনন্দ পণ্ডিত ব্যক্তি। ভাল জ্ঞাতের শিক্ষক সে। বিনা মাহিনায় এমন একজন শিক্ষক পাওয়াও ভাগ্যের কথা। ফলে শর্মিলাকে হারানোর চেয়ে প্রাপ্তির পাল্লাটাই আপাতত ভারী হয়ে উঠেছে বৃদ্ধের কাছে।

কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? বেলা পড়ে আসছে। কর্মরত কলকাতা শহরে মানুষজনের ছোটোছোটো বিরাম নেই। সকলেরই কাজ আছে, আছে গন্তব্যস্থল। শব্দে শর্মিলারই আজ কোনও কাজ নেই, কোথাও যাবার জায়গা

নেই। আর বাসের তেলার্টিল ভাল লাগছে না। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে সে চলে গেল দমদমের দিকে। সম্মুখী সাতটার প্রেন আসবে। হাতে এখনও ঘণ্টা তিন-চার সময় আছে। তা থাক। এ শহরের হাত থেকে সে পালাতে চায়। দমদমের বাবানঘাটতে কোন ফাঁকা জায়গায় গিয়ে সে বসে থাকবে একা। সেই ভাল। মানুষজনের সান্নিধ্যও যেন ওর ভাল লাগছে না আজ।

এয়ারোড্রোমেও লোকের ভীড়। শর্মিলা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় একটা ফাঁকা মাঠের দিকে। মনে পড়ল হাত ব্যাগে এখনও আছে সেই গম্পের বইটা। সেই আমেরিকান ডাক্তারবাবুর স্মৃতিকথা। সেই ভাল। বই পড়ে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যাক। কতদূর পড়োঁছিল সে? ঠিক মনে নেই। থাক, যে কোন একটা পার্স্বেদ থেকে পড়লেই হবে। একেবারে পিছন দিকের একটা পাতা খুলে পড়তে শুরু কর দেয় :

আমার জীবনের অনেকগুলো কেস হিষ্টি পাঠককে শুনিয়েছি। আমার কাছে সেগুলো ছিল রক্তে-মাংসে গড়া মানুষের হাস্যমধুর বিজ্ঞাভূত বাস্তব কাহিনী পাঠকের কাছে সেগুলো কোন কাহিনীর চারপাশে। তাছাড়া আমি লেখক নই, চিকিৎসক। তাই হয়তো পাঠক ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আর একটি খণ্ড কাহিনী লিপিবদ্ধ করেই আমি ছুটি নেব।

মাত্র গত বৎসরের কথা। এখন আমি বৃদ্ধ। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছি কয়েকদিন হল। ঘুরে বেড়াচ্ছি এ দেশ থেকে সে দেশে। বিদায় নেবার আগে এই পৃথিবীটাকে একবার ভাল করে দেখে নিতে চাই। গত বছর সেপ্টেম্বরে ছিলাম ভিয়েনায়। ওখানকার একটা হাসপাতালের কর্মকর্তা আমার ছাত্র। একদিন সে এসে আমাকে নিমন্ত্রণ করে গেল। ওদের সঙ্গে ডিনারে যোগ দিই তাহলে ওরা খুব খুশী হবে। বস্তুত ভিয়েনা হচ্ছে শল্যচিকিৎসকদের স্বর্গ, শহরের যাবতীয় জ্ঞানীগুণী পাণ্ডিত্যে ওরা নিমন্ত্রণ করেছে—ফলে এই সুযোগে অনেকের সঙ্গে আলাপ পারিও হবে। আমি গ্রহণ করলাম ওদের নিমন্ত্রণ।

নির্ধারিত দিনের সম্মুখী উপস্থিত ছলাম ওদের হাসপাতালে। ডিনারের আগে একটা অনুষ্ঠান ছিল, সেখানেই নিয়ে গেল আমাকে। প্রকাশ্যে একটা থিয়েটার 'হল'। ফুল আর চীনেলস্টনে সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। আমি যেতেই কয়েকটি মেয়ে এসে ছোট্ট ফুলের 'বুকে' দিয়ে স্বাগত জানাল। সামনের একটি আসনে নিয়ে গিয়ে বসাল। আমার ছাত্রটি এসে অভ্যর্থনা করল। আলাপ করিয়ে দিল কয়েকজনের সঙ্গে। সকলেই কৃতবিদ্যা চিকিৎসক। একটু পরেই আলো নিবের গেল হলের। শুরুর হল বিচিত্র অনুষ্ঠান।

মুগ্ধ হয়ে দেখছি একের পর একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান। কালে নাচ,

অকেশ্য। শেক্সপীয়রের একটি খণ্ডদৃশ্য। আভূত হয়ে গেছি আমি। বিরতির পূর্বে ঘোষিত হল এবার বিশ্ববিখ্যাত ভায়োলিন-বাজিরে মিসেস এলিজা জোন্স আপনাদের 'সোনাটা' বাজিয়ে শোনাবেন। পাশ্চাত্যী ডাক্তারবাবু আমার কানে কানে বলেন, মিসেস জোন্সের বোকা বাজনা নিশ্চয় শুনছেন আপনি ?

আমি বলি, কই না। এ কথা মনে করছেন কেন ?

—বাঃ ! এ মেয়েটি তো বি. বি. সিস-র বাঁধা আর্টিস্ট। সম্প্রতি 'বয়ে করে হানিমুনে এসেছে' ভিয়েনায়। ঘটনাক্রমে তাকে পাওয়া গেছে আজকেও অনুষ্ঠানে।

তাই নাকি ! তা হবে। আমি গান-বাজনার বিশেষ ভক্ত নই।

স্ক্রীন উঠে গেল আবার। উইংস্-এর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। সাদা সিল্কের একটি গাউন পরেছে। সুন্দর দেখতে। বয়সে ভরা ভাদ্র। কানায় কানায় ভরা। মনের মাঝখানে এসে বাও করে দর্শকদের দিকে ফিরে। আবির্ভাবমাত্র করতালিতে মুখারত হয়ে ওঠে প্রেক্ষাগৃহ। বোকা গেল, আমি না চিনলেও লিজির বহু গুণগ্রাহী এখানে উপস্থিত। মাইকের সামনে এসে ভায়োলিনখানি খুঁতনিতে চেপে ধরে আলগোছে ছড় টানে তার উপর। শব্দ হয়ে গেল বাজনা।

সঙ্গীতের ব্যাপারে আমি ভালকানা ; কিন্তু আশ্চর্য, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মূগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে থেকে মিটিয়ে গেল আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ। মনে হল দুর্দায়ার আমি এক। স্কটল্যান্ডের লেক-অঞ্চলে শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে শূন্যে শূন্যে শূন্যে ছান চন্দ্রালোকিত ড্যাফো ডিলের দিগন্ত অনুসারী আঁত'। সে বেদনা কিসের তা বুঝতে পারাছ না, তবু হু হু করে উঠছে বৃকের মধ্যে।

কতক্ষণ বাজনা শুনোঁছ জানি না, আশ্রয় হলোম যখন, তখন মূহুমূহু করতালি ধনিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়তে চাইছে। মেয়েটি মাথা নিচু করে বাও করল আবার। করতালি মুখারত প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। মনে হল, যে শব্দ একটা বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে মানুষকে এমন আত্মহারা করে দিতে পারে তাকে অভিনন্দন না জানিয়ে আমি চলে যেতে পারব না। শব্দের সুরধনীতে অবগাহন শ্রান করে আমি যেন নতুন পৃথিবীতে জেগে উঠেছি।

স্টেজের প্রবেশদ্বারে যে মেয়েটি ছিল সে কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে এসে কাকে খুঁজছেন ডক ?

বললাম, যে মেয়েটি এ মাত্র ভায়োলিন বাজালো তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—লিজিকে চেনেন বৃদ্ধি ?

—না চিনি না ; কিন্তু ওকে অভিনন্দন না জানিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছি না ।

মেয়েটি খুশী হল ; বললে, আসুন ভিতরে, বসুন । ও বোধ হয় গ্রীনরুমে ঢুকেছে, ডেকে দিচ্ছি ।

আমাকে একটি সোফায় বসিয়ে মেয়েটি ভিতরে খবর দিতে গেল । একটু পরে ফিরে এসে বললে, ও জামা কাপড় বদলাচ্ছে ; একটু অপেক্ষা করতে হবে । তবে আপনাকে একেবারে একা বসে থাকতে হবে না । ইনি লিজির মা । আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন ।

প্রোটা মহিলাটি আমার হাত ধরে বলেন, আপনি যে নিজেকে লিজিকে অভিনন্দন জানাতে উঠে আসবেন তা ভাবতেই পারিনি । আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ।

আমি বলি, সে কি ! ধন্যবাদ তো আমিই দেব । সত্যি আপনি রত্নগর্ভা । এমন অপূর্ব সুরবিস্তার আমি জীবনে শুনিনি । আপনার কন্যাটি তো সুস্বভাবতী ।

ভদ্রমহিলার চোখের কোণটা ভিজ়ে ওঠে আনন্দে ; বলেন, কিন্তু এ জন্য কৃতজ্ঞ আমার যতটা প্রাপ্য আপনার প্রাপ্য তো তার চেয়েও বেশী ।

একটু যেন ধাঁধায় পড়লাম । কী বলতে চান ভদ্রমহিলা ? আমার সেই সপ্তম মূখের দিকে তাকিয়ে উনি আবার বলেন, আপনি অবাক হচ্ছেন, হওয়ার কথাই । কারণ আপনি আমাকে চিনতে পারেননি ।

ভাল করে আবার তাকিয়ে দেখি ভদ্রমহিলার দিকে । কোনদিন তাঁকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হল না । সলজ্জে সে কথা স্বীকার করবার উপক্রম করতেই উনি বলে ওঠেন, তা তো হতেই পারে । জীবনে হয়তো আমার মতো লক্ষ রোগিণীকে চিকিৎসা করেছেন আপনি । আমি এককালে আপনার পেশেন্ট ছিলাম ।

—তা হবে ।

কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে এল ঠুর মেয়েটি । মিসেস্ এলিজা জোস্ এখনি আর সাদা গাউন নয়, সবুজ একটা ফ্রক, গায়ে ফার কোট, হাতে কালো দস্তানা । গলায় সাদা মস্তুর একছড়া মালা । সোনালী পশমের মতো একরাশ চুল, অস্বত্বশূদ্ৰ দৃষ্টি । সপ্তক অভিবাদন করল আমাকে । আমি ওকে অভিনন্দন জানানোর আগেই প্রোটা বললেন, লিজি, ইনি কে জান ? ডক্টর — তোমার জীবনদাতা । এঁরই দয়ায় আজ তুমি পৃথিবীর আলো বাতাস উপভোগ করছ ।

আমার আর অভিনন্দন জানানো হল না । বোকার মতো ঘুরে দাঁড়ালুম প্রোটোর মতোমুখি । প্রশ্ন করতে চাইলুম, কে ছিল আমার রোগিণী, মা না মেয়ে ? ওর মা কিন্তু তার আগেই লিজিকে বলেন, সবাই যখন ভেবেছিল

তুমি মৃত তখন উনিই আমাকে সিজারিয়ান করে তোমাৎ উদ্ধার করেন ।

আমি চমকে উঠে বলি, কোথায় বলুন তো ? কোন হাসপাতালে ?

—মিশিগানে । আপনার মনে থাকার কথা নয় । আমার স্বামী ছিলেন অটোমোবাইল এঞ্জিনিয়ার সি. এফ. স্মিথ ।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি । তা কেমন করে হবে ? আপনা থেকেই আমার দৃষ্টি নত হয়ে গেছে । অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি মিসেস্ এলিজাবেথ জোস্‌সের বাঁ পায়ের দিকে ।

প্রোটা হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, আহ্ । নাউ ব্লু রেকলেট্ ! তুমি ওর বাঁ পায়ের দিকে তাকিয়েছ ! ইয়েস, এই সেই মেয়ে ! যার প্রাণ তুমি দিয়েছিলে ডক্ !

—কিন্তু ওর পা ?

—ওটা কাঠের । কী অদ্ভুত উন্নতি করেছে তোমরা চিকিৎসা বিদ্যার । কেউ দেখে বাক্তেই পারে না । লিজি শব্দ হাটতেই পারে না শী ক্যান স্‌ইম শী ক্যান রান, শী ক্যান ইভন ডান্স !

আমার চোখের সামনে হাজার বাতির আলো সমেত স্টেজটা তখন দুলছে । আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার রবারের গ্লাভস্-পরা দুটি হাতের উপর একটি ছোট্ট মাংসপিণ্ড । তার কণ্ঠদেশে, ঐ যেখানে এখন সাদা মস্তুর মালাটা দুলছে, ঐ গলায় আমার ডান হাতের বড়ো আঙুলটা চেপে বসেছে । একটি বিকলাঙ্গ মেয়ের সমস্ত জীবনের অপমান, লাঞ্ছনা আর হাহাকারকে একটি ফুৎকারে নিবিয়ে দেবার শব্দ ইচ্ছা নিয়ে আমি খোদার উপর খোদাগিরি করতে চলেছি । আমি খুন করতে উদ্যত ।

ইচ্ছে হল অশ্ব আবেগে একটা আতঁ চাঁৎকার করে উঠি । ঠিক যেমন ভাবে আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে আতঁনাদ করে উঠেছিল মিশিগানের ও টি-তে সেই বিকলাঙ্গ মাংসপিণ্ডটা ।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা লিজি !

বই বন্ধ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে শর্মিলা । মনে পড়ে যায় মিঠুয়ার কথা । ছোট্ট মিঠুয়া । তারও অমন সোনালী পশমের মতো চুল, হয়তো লিজিরও ছিল ঐ রকম জ্বলজ্বলে দুটি দৃষ্টি চোখ এই বয়সে । হয়তো লিজিও ছিল ছেলেবেলায় ঠিক এই রকমই অভিমানী । কে জানে ! আচ্ছা, মিঠুয়া যদি ভারতবর্ষে না জন্মাত, সে যদি পশ্চিমখন্ডের কোন পরিবারে প্রথম চোখ মেলত পৃথিবীর বাতাসে ? তাহলে সেও কি ঐ লিজির মতো দেশের একজন, দেশের একজন হয়ে উঠত ? মনে পড়ল মনীষাবাবুর মেধাবী সন্তান মণ্ডুর কথাও । যার নামে ওদের প্রতিষ্ঠান । আচ্ছা, মণ্ডু যদি এই বইখানা

পড়ত, লিঞ্জির কথা শুনত, তারপরেও কি আত্মহত্যা করতে পারত সে ? মনীশবাবুর ডায়েরীটা শর্মিলা বারে বারে পড়েছে । অশুভ অ্যানালিটিক্যাল মন মনীশবাবুর । মশুর প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ তিনি লক্ষ্য করেছেন — লিপিবদ্ধ করেছেন, আর সেই সঙ্গে মন্তব্য করেছেন কী ভাবে ওদের মনে উৎসাহ ফিরিয়ে আনা যায় । মশুর সঙ্গে যে এক্সপেরিমেন্ট উনি করছিলেন তাতে ফল হয়নি । মনীশবাবুকে সাময়িকভাবে হার স্বীকার করতে হয়েছিল—কিন্তু তিনি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন । আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে জয়ী হবার সংকল্প নিয়ে সর্বস্ব পণ করে বসেছেন । মনীশবাবু লিখেছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন তিনি । শর্মিলা তাঁকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হত, কিন্তু উপায় নেই । তাকে চলে যেতেই হবে । এখনও শর্মিলা বারে বারে ঐ ডায়েরীটার পাতা ওলটায় আর ভাবে, কেন হঠাৎ হতাশ হয়ে পড়ল মশু ! কেন সে মৃত্যু ছাড়া আর কোন সমাধান খুঁজে পেল না তার সমস্যা-কটকিত জীবনে ! শর্মিলার মনে হয় সে যদি থাকত তাহলে নিশ্চয়ই মশুকে অন্য পথের সম্মান দিতে পারত । তাকে বদ্বাক্যে দিতে পারত একটিমাত্র অঙ্গহানিজর্জিত কারণে এ দুর্নিম্নার সবকিছু হারিয়ে যায় না । সে হার স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে কোনও পৌরুষ নেই, কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই । আমেরিকান পাইলট ক্যাপ্টেন ডেভিড যদি দুটি পা ছাড়াই জীবনে সার্থকতা খুঁজে পায়, বিকলাঙ্গ মিস্ স্মিথ হতে পারে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক মিসেস এলিজাবেথ জোন্স তাহলে শিখা-মিঠু-নন্দা-অঞ্জন-মশুরাই বা হতাশ হবে কেন ? ডেভিড আর লিজি দুজনেই আজ বিবাহিত, তাদের জীবনের যারা সঙ্গী তারা বিকলাঙ্গ নয় — তারা সুস্থ সবল মানুষ । কই, ওদের জীবন তো ফুলে ফলে ভরে উঠবার পথে কোন বাধা হয়নি ! তাহলে এ দেশেই বা তা হবে না কেন !

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে ওর । একটানা চিন্তার গঙ্গায় জেগে উঠল একটা চর । আবর্তে ঘুরিয়ে উঠল চিন্তাস্রোত । কে যেন ওর মনের মধ্যে বলে উঠল—আর যেই ভাবুক, তোমার ও কথা ভাবা শোভা পায় না ।

ওর মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল দুটি সত্তা । একজন বলে—অন্তত তুমি ও কথা বল না !

আর একজন প্রতিবাদ করে—কেন বলব না ? তুমি কি ভেবেছ, আনন্দ অশ্ব, তাই আমি সরে এসেছি তার কাছ থেকে ?

—যদি বলি তাই !

—তাহলে আমি বলব, আমি যখন তার আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছিলাম তখন সে অশ্ব ছিল না ।

—আর আমি যদি বলি, এখন তুমি ফিরে যাচ্ছ না শুধু ঐ কারণেই !

—তাহলে আমি বলব, তুমি কিছই জান না আমার কথা । আনন্দ আবার

নতুন করে অশ্ব হবে কি? সে তো জন্মশ্ব। চোখ থাকতেও সে কোনদিন আমার দিকে চোখ তুলে দেখেছে?

একটা পেন উঠল আকাশে।

চমক ভেঙে সোজা হলে বসল শর্মিলা। খুব নিচু দিয়ে পেনটি চক্কা করে পাক খেয়ে চলে গেল গাছের উপর দিয়ে, মাঠের সীমানা পেরিয়ে ঐ দূর নীল আকাশের নিলীমার ওপারে।

শর্মিলা উঠে দাঁড়ায়। পায়চারি করতে থাকে। ট্যান্সি আসছে যাচ্ছে। এয়ার হাঁডয়ার লাউড স্পীকারে কী একটা ঘোষণা হচ্ছে। যশোর রোড দিয়ে ক্রমাগত গাড়ির ছোটোছোটো। মানুষজন চলেছে। সম্ভ্রা ঘনি়ে আসছে পশ্চিম দিগন্তে। লালে লাল হয়ে গেছে ওদিকের আকাশটা।

সেই অস্ত-দগন্তের দিকে তাকিয়ে শর্মিলার মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়! মনে হয় একটু আগে অহেতুক রাগ করেছিল সে। মনে হয়েছিল, এ দুনিয়ার সবাই স্বার্থপর, মানুষ মাঠেই আত্মকেন্দ্রিক, মনে হয়েছিল, মানুষের প্রতিটি কাজের মূলে ঐ স্বার্থের গন্ধ।

কিন্তু ঠিক কি তাই? মা দাদা যদি চোখের উপর শর্মিলার অবস্থা দেখে স্থির থাকতে না পারেন সেটা কি তাঁদের অপরাধ? না তাঁদের স্বার্থপরতা? স্বার্থপর হলে তো দাদা বউদিকে নিয়ে আলাদা বাসা করে উঠে যেত! রমলা বিরক্তি প্রকাশ করত তার ঘরের ভাগীদারের প্রত্যাবর্তনে। উমা যদি সত্যিই আত্মকেন্দ্রিক হত তা হলে দাদার জন্য তার মাথাব্যথা হবে কেন? মাস্টার মশাই জানতেন শর্মিলা আজ বাদে কাল চলে যাবেই। তাই উমা আর আনন্দের উপর যদি তিনি নির্ভর করে থাকেন তাহলে তাঁর অন্যান্যটা কোথায়? তাছাড়া মাস্টার-মশাইয়ের সমস্ত প্রচেষ্টাটাই তো পরার্থে। এ বলসে তাঁর তো অবসরজীবনে আরাম করার কথা। এ প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে তিনি প্রাণপাত করছেন কি স্বার্থপরতার নিদর্শন রাখতে? এর মধ্যে স্বার্থপর যদি কেউ থাকে, তাহলে ভেবে দেখ শর্মিলা, সে একমাত্র তুমিই! হ্যাঁ, আর কেউ নয়, তুমি—শর্মিলা মিত্র।

তোমারই স্বার্থে তোমার স্বামী আজ দৃষ্টিহীন। আত্মসম্মাননা তুমি তার চোখের সামনে থেকে এই রূপসী পৃথিবীকে সরিয়ে নিয়েছ আর তারপর বিপদ বুঝে সরে দাঁড়িয়েছ। তুমি জান, আনন্দ আজ উপার্জনক্ষম নয়। দারিদ্র্যের করাল মর্তি তুমি দেখেছ তাই অশ্ব স্বামীর ঘরে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস আজ আর নেই তোমার। শৈশব থেকেই তুমি আদরে মানুষ। যা চেয়েছ, যা বাগনা ধরেছ তাই পেয়েছ। রোম্যান্টিক প্রেম করবার শখ হল তোমার— তাই সকলের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে ছুটে চলে গেলে আত্মভোলা আনন্দের কুটিরে। কিন্তু সেখানে পদার্পণ করার পরেই তোমার উপলব্ধি হল এতে

তোমার মতো মেয়ে সূখী হতে পারে না। তুমি শাড়ি চাও, বাড়ি চাও, গাড়ি চাও—নিত্য নতুন আবরণ আর আভরণ না হলে তোমার মন মানে না। আজ তুমি বৃথতে পেরেছ তোমার সেই বাসনা কামনাকে যে চরিতার্থ করতে পারবে সে ইন্সকুলমাষ্টার আনন্দ মিস্ত্রির নয়, সে প্রভূত বিস্তৃশালী বিকাশ গদগু। তাই আজ নতুন করে বিকশিত হবার বাসনা নিয়ে এসে ধর্গা দিয়েছ দমদম এয়ারোড্রোমে। তিনঘণ্টা আগে থেকে এসে বসে আছ, শিকার না ফসকে যায় ! ছি ছি ছি !

শর্মিলার মনে হল সে পালিয়ে যায়। শুধু এখান থেকে নয়, নিজের কাছ থেকে। নিজের মনের ঐ যে অংশটা ওকে ধিকারে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে বারে বারে, মনের ঐ অংশটার হাত থেকে দূরে। কিন্তু যাবে কোথায় ? ছায়ার মতো মনও যে ওর নিত্যসঙ্গী ! আর তা ছাড়া সে যে কথা দিয়েছে একজনকে। তার কথার উপর নির্ভর করে একটা মানুয ছুটে আসছে দিল্লী থেকে, তাকেই বা বলবে কি ?

—কিন্তু কথা কি তুমি শুধু ঐ একজনকেই দিয়েছ শর্মিলা ? আর কাউকে জীবনে কখনও কথা দাওনি ? মনে করে দেখ দেখি, আরও একজন মানুয তোমাকে একবার বলেছিল না কি, এখনও ভেবে দেখ শর্ম, আমার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবনকে জড়াবে কি না। তুমি প্রাচুর্যের মধ্যে মানুয হয়েছ, আদরে লালিত হয়েছ, আমার সংসারে নিত্য অভাব অনটনের মধ্যে পড়ে—

—বাধা দিয়ে সেদিন তুমি তাকে কী বলেছিলে শর্মিলা ? কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে ?

না। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই ও বৃথি শেষ হয়ে যাবে একদিন।

হাতবাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। হ্যাঁ, সময় হয়েছে এতক্ষণে :

রানওয়ের প্রান্তে এসে আকাশচারী দৈত্যখানটা শেষ পর্যন্ত থামল। ক্রু এসে খুলে দিল দরজা। ঢাকা লাগানো সিঁড়িটা এনে লাগিয়ে দিল খোলা দরজার সামনে। একে একে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে মানুয জন। শর্মিলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। ঐ তো বিকাশ ! হাতে একটা এয়ার ব্যাগ। মাথায় টুপি, ছাই রঙের একটা স্যুট কোটের বটনহোলে টকটকে লাল একটা বড় গেলাপ। বিকাশ চারিদিকে তাকাচ্ছে। সত্যি নায়কোচিত চেহারা বলতে হবে বিকাশের। কী টল ! অথচ দিবা মানানসই। ঠিক স্মার্ট বলতে যা বোঝায়। যাই বল, ধূতি পাঞ্জাবিতে পুরুষ মানুযের ব্যক্তিত্বটা ঠিক মতো ফুটে ওঠে না। কেমন যেন ন্যাতাজোবড়া ভাব। একথা কতবার শর্মিলা বলেছে আনন্দকে ; কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা ! সেই ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবি আর কোঁচা-

দোলানো খুঁতি, সেই মোটা চশমা, অবিদ্যাক্ত চুল আর কাঁখে চাদর। টিঁপক্যাল মাস্টার !

কিন্তু এসব কী ভাবছে শর্মিলা ! ঐ যে বিকাশ চারিদিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজছে। শর্মিলা হাত নাড়ল। ঐ তাকে দেখতে পেয়েছে বিকাশ। জ্বারে জ্বারে পা ফেলে এগিয়ে আসে সে।

—সত্যিই এসেছ তাহলে ?

—আসব না কেন ? তুমি দিল্লী থেকে উড়ে আসতে পারলে, আর আমি নিউ আলিপুর্ থেকে ছুটে আসতে পারব না ?

—আমার কিন্তু তবু সন্দেহ ছিল।

—তা তো থাকবেই। তোমার চিরকালই যে সন্দেহবাতিক। কই, তোমার মালপত্র কই ?

—চল, মালটা খালাস করি আগে।

বাড়ির গাড়ি আসেনি শূনে খুঁশী হল বিকাশ। বললে—ভালই হয়েছে। বাড়ির গাড়িতে বাশখবী নিয়ে বেড়ানো, আর বাড়ির ছাদে উঠে পিকনিক করা ও দুটোই একজাতের। তার চেয়ে কোন সদরিরজীর ট্যাক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়ি চল।

শর্মিলা বলে—সদরিরজি কেন ? বাঙালী জাতটা এই জন্যেই মরে। নিজের জাতের লোকেই যদি তাদের না দেখে—

হাত দুটি জোড় করে বিকাশ বলে—এ ক্ষেত্রে আমি নাচার। অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে গাড়ি করে যাব এমন একজন ড্রাইভার চাই যে, পিছনের কথোপকথন শুনলেও বুঝতে পারবে না।

বিকাশ করিৎকর্মা ছেলে মালপত্র গুঁছিয়ে রেখে গেল ট্যাক্সি ডাকতে। একটু পরেই ফিরে এল ট্যাক্সি নিয়ে। সত্যিই বিশালকায় পাঞ্জাবী সদরিরজীর গাড়ি। দ্বার খুলে বিকাশ বললে—এস।

শর্মিলার হঠাৎ মনে হল ঐ দুই অক্ষরের কথাটি যেন বিশেষ অর্থবহ। এ যেন ট্যাক্সিতে উঠে বসার জন্য আহ্বান নয়, এর পিছনে যেন আরও কিছু ইঙ্গিত আছে। মনে হল বিকাশের এ ডাক শূন্যমাত্র একটা যান্ত্রিক যন্ত্রের সঙ্গিনী হতেই শূন্য নয় এ আহ্বান আরও গভীর ব্যঞ্জনাময়।

শর্মিলা উঠে বসল পিছনের সীটে।

ট্যাক্সি চলল আলোকোজ্জ্বল যশোর রোড দিয়ে।

অল্প একটু পরে শর্মিলা অনুভব করে তার হাতের উপর আঙুলে আঙুলে এসে আগ্রস্র নিল আর একটি ঘামে ভেজা হাত। শর্মিলা বাধা দেয় না। বিকাশ বোধ হয় আর আগ্রস্র হবার সাহস সঞ্চার করে উঠতে পারে না। শর্মিলাই ওকে সাহস বোগায়, বলে—অতবড় গোলাপটা পেলে কোথায় ?

বিকাশ বললে—আসার সময় একজন দিল, না না, তুমি যা ভাবছ তা নয়—
আমারই বাগানের গোলাপ । যে তুলে দিল সে আমার হেড মালী ।

—হেড মালী মানে, তোমার বাগানে কজন মালী ?

বিকাশ সে কথার জবাব না দিয়ে বললে—কিন্তু গ্রে-রঙের স্যুটে লাল
গোলাপ ঠিক মানায় না । কালো ব্যাকগ্ৰাউন্ড না হলে—

শর্মিলা বলে—তাই নাকি ? কিন্তু কালো স্যুট তো এমন দিনে -

এবারও বাধা দিয়ে বিকাশ বলে—স্যুট কেন ? কালো খোঁপাতেও মানাবে ।
বিশ্বাস না হয় দেখ ।

এবারও বাধা দেয় না শর্মিলা । খোঁপায় ফুলটা গর্জ্জে দেবার সময় অত
ছোঁয়াচ না বাঁচালেও হয়তো আপত্তি করত না সে । বরং একটু যেন হতাশই
হল শর্মিলা ।

কিন্তু এ কী ! ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ালো চৌরঙ্গীরই সেই বিখ্যাত হোটেলটির
সামনে ।

শর্মিলা চমকে উঠে বসে—এ কি ! এখানে কোথায় ?

—এখানেই যে থাকব আমি । কাল সকালে যাব তোমাদের বাড়ি ।
এস. নাম ।

শর্মিলা প্রতিবাদ করে—সে কেমন করে হবে ? তোমার জন্যে সবাই অপেক্ষা
করে আছেন । আর তুমি হোটেলে উঠবে মানে ?

—মানেটা তোমাকে বুঝিয়ে বলব বলেই তোমাকে দমদমে আসতে
বলেছিলাম । এস, নাম ।

দেখা গেল বিকাশ দিল্লি থেকেই হোটেলে স্থান সংরক্ষণ করে তবে রওনা
হয়েছে । শর্মিলা আর প্রতিবাদ করে না ; মনে মনে কঠিন হয়ে ওঠে ক্রমে ।

মালপত্র নিয়ে হোটেলের বয়টা চলে গেল ওর ঘরে । বিকাশ শর্মিলাকে
নিয়ে লিফটে করে সেখানে পেঁছবার আগেই তার মালপত্র পেঁছে গেছে, দেখা
গেল । দু'কামরার সুইট । সামনে একটি বসবার ঘর, পিছনেরটা শয়নকক্ষ ।
যে স্টুয়ার্টটি তাকে ঘরাঁট দোঁথয়ে দিল বিকাশ তাকে বললে—এ হলদে রঙের
পদটি বদলে দিও, ও রঙটা আমার পছন্দ নয় ; ফিকে কোন রঙ হলেই ভাল ;
স্কাই ব্লু অথবা লাইট পিংক ।

স্টুয়ার্ট অভিবাদন করে চলে গেল ।

সামনের সোফাটি নির্দেশ করে বিকাশ বসল আর একটি গদি-আঁটা চেয়ারে ।
পাইপ আর পাউচটা বার করে টোব্যাকো পাকাতে পাকাতে বলল - কী খাবে
বল ? কী অর্ডার দেব ?

শর্মিলা একটু আহত হয়ে বলে—তুমিই এসেছ কলকাতায়, আমি তো দিল্লি
আসিনি ।

বিকাশ স্যুটকেস খুলে একটি বেষ্টে বোতল বার করে রাখল টিপনের উপর। তারপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে অর্ডার দিল ওর তিনশো বাইস নম্বর ঘরে কিছু বরফের কুচি আর সোডার বোতল পাঠিয়ে দিতে। ফিরে এসে চাবিটাকে টেনে বার করল প্যাণ্টের হিপ পকেট থেকে। তাতে ছিল বোতল খোলার বন্ধ। বোতলটা খুলতে খুলতে বলে—আমার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বাকি আছে। দেখ, আমি ছদ্ম নিয়ে আসিনি। এসেছি কোম্পানির কাজে। ফলে পাঁচটা লোকের সঙ্গে বিজসেন সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে হবে। তোমাদের বাড়িতে উঠলে—

শর্মিলা বলে—তা ঠিক। সেখানে এমন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ পাওয়া যেত না বটে।

বিকাশ বলে—শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত না হলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু অন্য কিছু নিয়ন্ত্রিত হত নিশ্চয়ই। এভাবে তোমার সঙ্গে বসে গল্প করবার সুযোগ হত না, এটা তো মান?

শর্মিলা বললে—তা মানি। কিন্তু সত্যিই কি তুমি একটা সম্মান্য এ সব না খেয়ে কাটাতে পারতে না? না হয় খেতেই। মাঝে সরিয়ে রাখতাম আমরা।

বেয়ারা এসে সোডার বোতল, বরফের কুচি আর টং দিয়ে গেল।

বিকাশ বললে—তাছাড়া আরও একটা বাধা ছিল, সে কথা তো তুমি জান?

—আরও বাধা? কী?

একটু ইতস্তত করে বিকাশ বলে—তোমাদের লিগ্যাল সোপারেশন হয়ে যাবার আগে আমার পক্ষে তোমাদের বাড়িতে ওঠাটা কি ভাল দেখাতো?

একটু চুপ করে থেকে শর্মিলা বলে—ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমাদের বাড়িতে আমি একা থাকি না। সেখানে গেলে তুমি আমার দাদার বন্ধু হিসাবেই যাবে, এতে বাধাটা কোথায়?

বিকাশ একটা শ্রাণ করে বলে—ওসব অপ্রিয় আলোচনাটা বরং মূলতুবী থাক। বল কী খাবে? হট অর কোল্ড?

শর্মিলা বললে—কিছুই আমার খেতে ইচ্ছে করছে না বিকাশ। আমি বরং এবার উঠি।

—সে কি। তোমার সঙ্গে কোন কথাই তো হয়নি।

—না হয় সে সব কথাও আপাতত মূলতুবী থাক।

একটু গম্ভীর হয়ে বিকাশ বলে—তোমার কি কোন তাড়া আছে?

—তা আছে বইকি। আমাকে একবার বাড়ি যেতে হবে। ওরা তোমার জন্য এখনও অপেক্ষা করছেন।

— তার জন্যে তোমাকে বাড়ি যেতে হবে না । আমি এখনই ফোনে বলে দিচ্ছি ।

শর্মিলা হুপ করে থাকে ।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে নাম্বার ডায়াল করার আগে বিকাশ আবার বলে—
সেই সঙ্গে এ কথাও বরং বলে দিই তুমি রাতে বাড়িতে থাকে না ।

হঠাৎ মিছে কথা বলে বসল শর্মিলা রাতে বাড়িতে থাক না—তা বাড়ির
লোক জানে । আজ আমার এক বাস্তবীর ছেলের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আছে ।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বিকাশ বলে—কিন্তু এমন তো কথা ছিল না ?
তুমি জান আজ আমি আসছি । আজকের সম্মিটিও ক্রি রাখনি ?

শর্মিলা বলে—হোটেলের চিঠি লিখে সীট বুক করতে মনে থাকল আর,
হোটেলের যে গেস্ট মীল বুক করেছে সেটা আমাকে জানানো ডুললে ?

বিকাস কোন জবাব দিল না ।

শর্মিলা বলে—এই এক বছরে তুমি অনেক বদলে গেছ বিকাশ ।

—তোমার পরিবর্তনটাও কম নয় কিন্তু ।

—তা হবে ।

দরজায় কে যেন ‘নক্’ করল । বিকাশ বলে—ইয়েস, কাম ইন প্লিস্ ।

হোটেলের একজন কর্মচারী, তিন চার সেট পর্দার নমুনা এনে দাখিল
করল বিকাশের সামনে । বিকাশ তার ভিতর একটা পছন্দ করে দিল ।
লোকটা সেলাম করে চলে যেতে শর্মিলা বললে—এ পর্দাগুলো তোমার পছন্দ
হল না ?

বিকাস পাইপটা জ্বালতে জ্বালতে বলে—হলুদ রঙ আমি দুচক্ষে দেখতে
পারি না ।

শর্মিলা বললে—আশ্চর্য ! আমার কিন্তু বাস্তবীরও খুব ভাল লাগে ।

বিকাস শুধু বললে—ও !

আবার কয়েকটা নীরব মূহুর্ত ।

হঠাৎ হাতঘড়ি দেখে বিকাশ বলে—কটার সময় তোমার ডিনারের
নিমন্ত্রণ ?

—ডিনার নয়, রাতে সামান্য খাওয়াদাওয়ার নিমন্ত্রণ । গেলেই হল ।

—বাড়ি গিয়ে তারপর যাবে তো ?

—তুমি বাড়িতে একটা ফোন করে দিলে সোজাই চলে যাই সেখানে ।

—এই বেশে ?

—কেন, বেশটা পছন্দসই নয় ?

বিকাস একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে—মাপ কর শম্মু, এ বেশে ঐ অস্থদের
শ নেওয়া চলে, চক্ষুমানদের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া যায় না ।

শর্মিলাও হেসে বলে—এবার কিন্তু হিসাবে তোমার একটু ফুল হল বিকাশ । তোমার ভাষায় ‘লিগ্যাল সেপারেশন’ না হওয়া পর্যন্ত আমার সামাজিক পরিচয় অস্থায়ী মাস্টারের বউ । তার পক্ষে এ পোশাক...

বাধা দিয়ে বিকাশ বলে ওঠে— ছিঃ শম্ভু, এভাবে কেন নিলে কথাটাকে । আমি তো সে সেন্সে বলিনি ।

— সেন্সে আছ তুমি তাহলে এখনও ! ষাক, এবার আমি চলি ।

শর্মিলা উঠে দাঁড়ায় ; বিকাশও উঠে পড়ে । বলে একটা কথা শম্ভু, তুমি তো জানতে না যে, আমি হোটেলের উঠব ; তোমার তো ধারণা ছিল আজ রাত্রে আমি তোমাদের বাড়িতেই থাকব খাব । তবু তো তুমি সামান্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছ অন্যত্র ?

শর্মিলা সে কথার জবাব দেয় না । হাতঘড়িটা দেখে বলে—কাল কি তুমি আসবে একবার আমাদের বাড়ি ?

—যাব তো বটেই ; তবে কখন যাব তা এখন বলতে পারছি না । তুমি কখন ফ্রি থাকবে ?

—ফ্রি ? ফ্রিডাম আগে পাই ।

ষাবার জন্যে শর্মিলা পা বাড়ায় ।

—দাঁড়াও । একটা কথা । তোমার জন্য সামান্য একটি উপহার এনেছিলাম । সেটা দিই ।

হাতব্যাগ খুলে একটা আংটি বার করে বিকাশ । সাদা পাথর বসানো একটা আংটি । পাথরটা পোকরাজ না হইরে ! শর্মিলার ম্যানিকিওর করা অনামিকায় আংটিটা সযত্নে পরিয়ে দিতে যাবে, শর্মিলা ধীরে ধীরে হাতটা টেনে নেয় । বলে—তা হয় না বিকাশ ।

বিকাশ একটু অবাক হয়ে বলে—হয় না ? কেন ।

শর্মিলা কী ভাবে জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না ।

বিকাশ বলে—কিন্তু খোঁপায় ফুল গাঁজে দেবার সময় তো তুমি আপত্তি করনি ?

শর্মিলা স্নান হেসে বললে—ফুল তো পাথরের মত ভারী নয় !

—কিন্তু চিরস্থায়ী চিহ্ন তোমাকে দেবার অধিকার তো তুমি আমাকে চিঠিতে দিয়েছ শম্ভু ।

শর্মিলা গম্ভীর হয়ে বলে—চিঠিতে অধিকার দেওয়া যায় না বিকাশ, সম্মতি দেওয়া যায় । যে কারণে তুমি আজ আমাদের বাড়িতে উঠতে পর্যন্ত রাজী হলে না, সেই কারণে তোমার হাত থেকে এ উপহারও যে আমি নিতে পারি না, এটুকুও কি আমাকে বন্ধিয়ে বলতে হবে ?

লিফ্ট পর্যন্ত বিকাশ ওকে এগিয়ে দিয়ে গেল, বললে—তুমি আমার উপর রাগ করে গেলে—

ওকে থামিয়ে দিয়ে শর্মিলা বলে—সেটাও তোমার ভুল ধারণা। রাগ আমি করিনি।

—রাগ না হলেও অভিমান ?

লিফট-ম্যান দরজা খুলে প্রতীক্ষা করছে। শর্মিলা পা বাড়ায় সেদিকে। হঠাৎ কি মনে হওয়ায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—অভিমান ! কিন্তু সেখানেও তোমার হিসাবে ভুল হয়েছে বিকাশ। লিগ্যালি তোমার উপর অভিমান করবার অধিকারই কি আমার আছে ছাই।

দড়াম করে লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

পথে ধীরে এসে শর্মিলার মনে হল সে অত্যন্ত ক্লান্ত, অবসন্ন। শারীরিক এবং মানসিক। খোঁয়াড়-ভাঙা মাতালের মতো পা ঘেঁষে তার এখনও টলছে ; ইচ্ছে হচ্ছে কিছুক্ষণ শুয়ে পড়ে থাকে কোথাও। তবু পায়ে পায়ে চলতে থাকে গড়ের মাঠের দিকে। চৌরঙ্গী দিঘে জনস্রোত চলেছে দলে দলে, দোড়ায় জোড়ায়। আলো-ঝলমল রাজপথ। সুবেশ তরুণ-তরুণী, ক্যামেরা-কাঁধে বিদেশী ট্যুরিস্ট, অফিস-ফেরত বাসের-হাতল-লালায়িত কেরানিকুল, পার্কর কলমের আধার ব্যাপারী আর ব্যাঙ্গোবাদক অশ্ব ভিথারী। চৌরঙ্গীর একটা জেরা অংশে ওপারে চলে এল ক্রমে। পান-বিড়ির পসরা, ফুচকাওয়াদা, ঝালচানার বেসতি—তার মধ্যে পথ কবে ও চলে এসে সেনোটাফের দিকে। এ জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নিজস্ব। অবনত-মস্তক সেপাইটার সামনে দাঁড়ালো একটুক্কণ। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেনোটাফটার দিকে। পাথরের চাতালে বসল। ভাগ্য ভাল, এখানটায় বেশি লোকজন নেই এখন।

সমস্ত জীবনভোর সে কি শুদ্ধ ভুলই করে যাবে ? জীবনযুদ্ধে তার ভূমিকা কি ঐ অবনতমস্তক বন্দুকধারী সৈনিকটির মতো ? আনন্দকে সে একদিন ভালবেসে বিয়ে করেছিল—সেদিন সে সত্যিই মদু হয়েছিল একজন আত্মভোলা অধ্যাপকের অসহায়তায়, তার সারল্যে তার অমলিন-ভালবাসায়। ভেবেছিল প্রেম বিশ্বজয়ী, আর পাঁচটা জাগতিক অভাববোধকে সে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারবে আনন্দের ভালবাসার বিনিময়ে। সেভাবেই মনকে প্রস্তুত করে একদিন গৃহত্যাগ করেছিল। আজ বৃষ্টিতে পারে, সেটা তার মর্মান্তিক ভুল ! শর্মিলা প্রাচুর্যের ক্রোড়ে লালিত, সে শাড়ি-গহনা ভালবাসে, সাজতে ভালবাসে, সাজাতে ভালবাসে। কিন্তু আনন্দ ছিল ঠিক তার বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। তার নিজের জামা-কাপড়ও কখনও যোপদরস্ত থাকত না ; আনন্দ কোনদিন ফিরেও দেখত না শর্মিলা কী পরে, কী ভাবে সাজে। কোনদিন শখ করে একখানা আটপোরে শাড়ি অথবা একটা বুটো মদুস্তোর মালা এনে বলেনি—এটাতে তোমাকে চমৎকার মানাবে। কোনদিন নতুনভাবে খোঁপা বাঁধলে, নতুন একখানা শাড়ি ভাঙলে তা নজরে আসত না আনন্দের—আমেকা কখনও খলে,

বসত না—বাঃ !

আজ আর স্বীকার করতে বাধ্য নেই সেদিন ভুলই হয়েছিল শর্মিলার ।
মর্যাদিক শ্রান্তি ।

কিন্তু চেঁচটার তো চুটি ছিল না ওর । সামান্য আরোজনেই গড়ে তুলতে চেয়েছিল সে তার ছোট্ট নীড়টিকে । তিল তিল করে সঞ্চয় করত সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকরণ, সংকুচিত করত অপব্যয় । ছেঁড়া কাপড়ের পাড় জোড়া দিয়ে টোঁবল-ঢাকা বানাত, ছেঁড়া বিছানার চাদর ছুঁপিয়ে জানালায় পর্দা দিত । ধোবার খরচ কমাতে ডান ডান কাপড় কাচত । যে জীবনের সঙ্গে পরিচয়ই ছিল না প্রাক্‌বিবাহ জীবনে সেই রুচ্ছতাকে শূন্য সহ্য নয়, স্বীকার নয়, বরণ করে নিতে রাজী হয়েছিল শর্মিলা । সব কিছু রুচ্ছসাধনের জন্য সেদিন সে ছিল প্রস্তুত । সংসারের অভাব মেটাতে সে চাকরি করতেও চেয়েছিল । মনে পড়ছে এই উপলক্ষ্যেই বেধেছিল সংঘাত ।

ওরা তখনও হুগলীতে । সেদিন কী একটা ছুটি ছিল আনন্দ তার নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়মে সকাল থেকেই বসেছে বাইরের ঘরে তার নথীপত্র নিয়ে । মৌর্যগের স্ত্রী-স্বাধীনতা না তুলকী আমলের রাজস্ব-ব্যবস্থা কী নিয়ে যে ডুবে আছে আনন্দ, তা ঠিক জানা নেই । কৌতূহলও ক্রমশ মিটে আসছে শর্মিলার । আনন্দের পাণ্ডুলিপির উপর আজকাল আর নজর দেয় না সে । হঠাৎ শুনল বাইরের ঘরে আনন্দ কার সঙ্গে যেন কথা বলছে । আড়ি পাতা ওর স্বভাব নয়, কিন্তু আগন্তুক ভদ্রলোকের উচ্চকণ্ঠস্বরে অনিচ্ছা সঙ্গেও আলাপচারিটা কানে গেল শর্মিলার । ভাষা এবং বক্তব্য এমন মধুর নয় যে, দুবার শুনবার ইচ্ছে করে । তবু ভিতরের জানলার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে ।

ভদ্রলোক বিদায় হওয়ারমাত্র ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে শর্মিলা বলে, লোকটা কে ?

অপমানটা বৃদ্ধি তখনও ঠিকমতো পরিপাক করে উঠতে পারেনি আনন্দ । ঢোক গিলে বলে, বিশেষ কেউ নয়, আমার পরিচিত একজন পাবলিশার ।

—ওঁর কাছ থেকে টাকা ধার করেছ তুমি ?

আনন্দ জবাব দেয় না । অপরাধীর মতো কৌচুর খঁটে চশমার কাচটা ম্হুতে থাকে ।

—ছি ছি ছি । আর তাই লোকটা তোমাকে বাড়ি বয়ে অপমান করে গেল ।
কত টাকা ধার করেছিলে ?

—চার শ' ।

—কী করেছ সে টাকার ? খাইয়েছ আমাদের ?

আনন্দ চকিত হয়ে বলে, উঁমি কোথায় ?

শর্মিলা শ্লেষের সঙ্গে বলে, লোকলজ্জা বস্তুটা তাহলে আছে তোমার ! ভয় নেই, তোমার পাবলিশার বন্ধু বেড়াবে চেষ্টা করে কথা বলেন, তাতে দু'দিনেই পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে যাবে ।

হাত থেকে বালা-জোড়া খুলে শর্মিলা রাখল ওর পান্ডুলিপি'র উপর । বললে, যাও, এ বালা-জোড়া বেচে ধার শোধ করে দিয়ে এস ।

কাঠের পদতুলের মতো চূপ করে বসে রইল আনন্দ ।

তার দিন দুয়েক পরেই খবরের কাগজের একটা কাটিং দেখিয়ে শর্মিলা বলে, তাবাঁছি এখানে একটা দরখাস্ত করে দিই ।

আনন্দ গভীরভাবে ভুবে ছিল তার পান্ডুলিপিতে । সচরাচর এসব কথা একবারে তার কানে যায় না, কিন্তু সেদিন কি যেন হল, প্রথমবারেই কথাটা কানে গেল ওর । চোখ থেকে চশমাটা খুলে বললে, তার মানে ? তুমি চাকরি নিতে চাইছ ? কেন ?

ভাল মুখেই জবাব দিয়েছিল শর্মিলা, দু'জনের রোজগারে সংসারের অবস্থাটা আর একটু সজ্জল হত । আমার বাবার দেওয়া গহনা তুমি সেদিন নিলে না, কিন্তু তাই বলে আমার উপার্জনের টাকা না নেবার কোন কারণ নেই ।

আনন্দ বেদনাপান্ডুর মুখে বলে, এখনও তো তার প্রয়োজন হয়নি শম্ ।

একটু রুদ্ধস্বরে শর্মিলা বলে, তুমি তাই মনে করছ, আমরা করছি না ।

আনন্দ অভ্যাসমতো কৌচা'র খুঁটে তার চশমার কাচটা সাফা করতে থাকে । প্রত্যুত্তর করে না । সে বোধ হয় এতদিনে বৃদ্ধিতে পেরেছে কথা বললেই কথা বেড়ে যায় । কিন্তু কথা না বললেও যে কথা বাড়ে । শর্মিলা ধমকে ওঠে, কণী, সব কথায় বোবার মতো তাকিয়ে থাক বল তো ? এভাবে চলে নাকি তিনটে মানুষের সংসার !

আনন্দ গলাটা সাফা করে বলে, পরের মাস থেকে আর একটা টাইশ্যানি পাব । জগদীশবাবু দেবেন বলেছেন ।

—টাইশ্যানি ! অর্থাৎ আর প'চিশটা টাকা ! কিন্তু তাতেও কি এই নদন আনতে পাশ্চাত্য ফুরানোর হিসেবে হবে কিছু ?

আনন্দ শেষ চেষ্টা করে, আর তাছাড়া আমার লেখাটাও তো শেষ হয়ে এল । আর দিন সাতেকের মধ্যেই—

বাধা দিয়ে শর্মিলা বলে, থাক থাক । ও আলোচনা থাক । তুমি মনে কর সেদিন সেই পাবলিশার ভদ্রলোক কণী বলে গেলেন তা শুনিনি আমি । আট আনা দৈন্তে দরে কাগজ কিনে আট আনা সের দরে বেচতে হবে পুরানো খবরের কাগজগুলোকে ।

একেবারে পান্ডুর হয়ে গেল আনন্দ । কথাটা বোধ করি তার মর্ম্ম'মূলে বি'খোঁছিল সেই দিন থেকেই । পাবলিশার ভদ্রলোক ঠিক ঐ কথাই বলেছিলেন

তাকে। এ বই কেউ ছাপতে রাজী হবে না। কে কিনবে?

আনন্দ আনত মুখে চূপ করে বসে থাকে।

শর্মিলার বোধ করি এতক্ষণে দয়া হয়। হাজার যাই হোক, লোকটা ঐ গ্রন্থটি লিখতে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছে। ঠিক এ ভাষার কথাটা বলা বোধ হয় উচিত হয়নি ওর। বলে, কিন্তু সৌদীন সেই ভদ্রলোক তোমাকে আর একটা কি লিখতে বলছিলেন বল তো?

হঠাৎ শান্ত মানুষটা ক্ষেপে ওঠে একেবারে। ধ্যানশ্রমিত পর্বত যেন আগ্নেয়গিরি হয়ে ওঠে মূহুর্তে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে বলে, সেটুকুও আড় পেতে শুনতে পারিনি?

শর্মিলা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মানুষটা যে রাগতে জানে তা যেন এই প্রথম জানল সে। কোন কথা না বলে হন্থন্থ করে বেরিয়ে গিয়েছিল আনন্দ।

সৌদীন না শুনলেও পরে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল শর্মিলা। আনন্দই বলেছিল তাকে। পাবলিশার ভদ্রলোক ওকে দিয়ে একটা ইতিহাসের প্রণ-উক্তরের বই লিখিয়ে নিতে চান। বইয়ে অবশ্য লেখকের নাম থাকবে একজন বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপকের। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের খাতা দেখেন এবং যার খানকয়েক চালু বই বাজারে আছে। সে ভদ্রলোকের লিখবার মতো সময় অথবা অধ্যবসায় নেই, তবে নামটা তিনি প্রকাশক মশাইকে কিংবা অর্থমূল্যে ধার দিতে পারেন।

আনন্দ বলেছিল, তুমিই বল, সে বই আমার লেখা উচিত?

ওর বৃকে মুখ লুকিয়ে আগ্রহনয়না শর্মিলা বলেছিল, তাই কি আমি বলতে পারি! আমিও তো মানুুষ।

আনন্দ ওকে জড়িয়ে ধরেছিল সে উত্তরে। বলেছিল, আমি জানতুম তুমি কখনও আমাকে সে অপমানের মধ্যে টেনে নামাবে না। তাতে যত কষ্টই হোক। এ তো আমার শিক্ষার অপমান নয় - এ যে আমার আত্মার অপমান!

কিন্তু অর্থই সকল অনর্থের মূল। এ ক্ষণিক মিলন শাস্বত হয়ে উঠতে পারেনি ওদের সংসারে। নিত্য অভাব মানুুষকে স্বভাবতই খিটখিটে করে তোলে। শর্মিলা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সব অভাব, অনটনকে মানিয়ে নিতে কিন্তু দারিদ্র্যজনিত অপমানকে সে তখনও মেনে নিতে পারত না। মাঝে মাঝে মতান্তর ঘটত। আর মতান্তর থেকে মনান্তর খুব বেশি দূরের পথ নয়। দারিদ্র্য দৈত্যটার সঙ্গে লড়াই করতে আনন্দ ক্ষতিবিক্ষত হয়ে পড়ে। একাদিক্রমে সে কাজ করে যার উদয়ান্ত। আরও একটা টাইশার্নি নিল সে। বাড়ি ফিরতে রাত দশটা সাড়ে দশটা বেজে যায়। রাতে ক্রান্ত মানুুষটার আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। আর্থিক সচ্ছলতা একটু হল বটে, কিন্তু আনন্দকে পুরোপুরি

হারালো শর্মিলা । তর্দিন তবু রাতটা ছিল আনন্দ-মুখরিত - এরপর থেকে
ষড়মন্ত মানুষ্যতার পাশে নিরানন্দেই জাগরারাত্রি কেটে যেত ওর ।

ক্ৰমে শর্মিলার মনে হল অতি অল্প সময়েই সে বৃষ্টি ফুরিয়ে গেল । মাত্র
সাত আট মাস হল বিষয়ে হয়েছে ওদের । দিনরাত্রিগুণি কোথায় ডানা মেলে
উড়ে যাবে, তা নয় ধীর মন্থর গতিতে প্রহরগুণি এগিয়ে চলে - যেন স্টীম
রোলারের গতিচ্ছন্দ । শর্মিলার মনে হল তার জীবন, তার যৌবন সবই আজ
উপেক্ষিত হতে বসেছে । শব্দ টাকার চিন্তায় মানদুষ্টা সারাদিন ছোটোছোটো
করে, রাত্রে ক্লান্তিতে ঘুমায় । বাড়িতে যে সদ্যবিবাহিত একটি তরুণী তার জন্য
প্রতীক্ষা করে প্রহর গোণে এ কথাও যেন মনে থাকে না আত্মভোলা মানদুষ্টার ।
কোথায় অনুশোচনা জাগবে, না উন্মত্ত প্রচণ্ড অভিমানে শর্মিলা রীতিমতো
হিংস্র হয়ে ওঠে ।

প্রায় এই সময়েই চোখের অসুখ হল আনন্দের । শর্মিলার নজরে পড়েনি ।
খেয়াল হল উমার কথায় । উমা বলছিল, তোমার চোখটা এত লাল হয় কেন
দাদা ?

আনন্দ হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল ব্যাপারটা ।

কিছু দূর-চার দিনের মধ্যেই সে বৃষ্টিতে পারে অত সহজে পার পাওয়া যাবে
না । উমার আগ্রহাতিশয্যে আনন্দ চোখ দেখাতে গেল । এতসব ব্যাপার
কিছুই জানতে পারেনি শর্মিলা । সে সময় দিনান্তে ওদের স্বামী-স্ত্রীতে
একটিও বাক্য বিনিময় হত কিনা সন্দেহ । জানতে পারল আনন্দের চোখে
নতুন চশমা দেখে ।

—চশমা পালটেছ দেখছি ? একদিন বললে শর্মিলা ।

আনন্দ শব্দ বলে, হঁ ।

—পাওয়ার বেড়েছে বৃষ্টি ?

—সামান্য ।

আর কিছু জানতে চাননি শর্মিলা ! কেনই বা চাইবে ? আনন্দ কি
কোনদিন জানতে চেয়েছে শর্মিলার কথা ? তারও যে শরীর খারাপ, তারও যে
আহারে রুচি নেই, একটা বিবিম্বার তাড়নায় সে যে ছটফট করে ফেরে সারাদিন,
তা কি আনন্দও জানতে চেয়েছে ?

তাই মৈদিন শর্মিলা জানতে পারেনি চোখের ডাক্তার কী সর্বনাশা
সাধনাবাগী শুনিয়েছিলেন আনন্দকে । ওর চোখের শিরাগুণি নাকি শূন্যে
স্বপ্নে বসেছে । চোখের পরিশ্রম একেবারে কর্মিয়ে না দিলে, বিশেষত কৃত্রিম
আলোয় পড়াশুনা করা বন্ধ না করলে আনন্দ অন্ধ হয়ে যেতে পারে । এ কথা
মৈদিন শর্মিলা জানেনি আর আনন্দ মানেনি । কিম্বা হয়তো জেনেশুনেই সে
তা সবেও সাবধান হয়নি । আজ শর্মিলা ভাবে, কেন ? কী ক্রটি হত যদি

আনন্দ সব কথা খুলে বলত শর্মিলাকে। হয়তো ওর বোণ তখনও ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রের এস্তিমারের ভিতর। অত্যাচারের বদলে চিকিৎসা করালে হয়তো আনন্দের চোখের সামনে এভাবে হচ্ছে যেত না পৃথিবীর আলো, কিন্তু, কেন সাবধান হয়নি আনন্দ? অভিমান? আত্মভোলা মানুষ্টার অনামনস্কতা? না আর কিছ্?

আজ এত কথা ভাবছে শর্মিলা; কিন্তু সেদিন এত কথা ভাবত না। তখন সে নিজেও ছিল অসুস্থ। উমা ছেলেমানুষ, পরিবর্তনটা সে আন্দাজ করতে পারেনি। শর্মিলা ভাবত এ সময়ে কী করবে সে? বাবা-মা-দাদা একবারও খোঁজ নিতে এলেন না। রম্ মাঝে মাঝে চিঠি লেখে বটে কিন্তু তাও যেন ভাষা ভাষা। বসুপরিবারের খাতায় খরচের অঙ্ক তার নাম লেখা হয়ে গেছে। আজ আর সে ওখানকার কেউ নয়। এই অবস্থায় সে কিছ্‌তেই গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না মায়ের কাছে।

কিন্তু হাজার ষাই হোন তিনি তো মা। মা হয়ে মেয়ের মাতৃষ্ণের বেদনা বুঝবেন না শ্বাগতা? মাথা নিচু করে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে ব্যবস্থা একটা হবেই। কিন্তু তাতে যে শর্মিলার মর্মান্তিক অপমান! বসুপরিবারের বড় আদরের মেয়ে সে। আঁকশোর বা চেয়েছে তাই পেয়েছে দ্ হাতের ম্ঠিতে। আর আজ সে এতটা পর হয়ে গেছে যে কেউ তার নামও উচ্চারণ করে না একবার! কী এমন অন্যায় করেছে সে? এর চেয়ে অনেক বড় কলঙ্কের কাজ করেছে তো ওদের সমাজে অনেক মেয়ে সগোরবে অর্ধিষ্ঠিত। ব্যাংকটার সেনের মেয়ে তার গানের মাষ্টারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। সে তো ফিরে এসে দিব্যি আছে মায়ের কোলে! শর্মিলার অপরাধটা কি তার চেয়েও বেশী? না, শর্মিলা তা পারবে না—অন্যায় সে করেনি, অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে সে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না বাসু-সাহেবের সেই প্রাসাদোপম বাড়ির পোর্টিকোর সামনে।

কিন্তু—

আনন্দের উপর ভরসা করা যায় কি? সে কিছ্‌ই জানেনা এখনও। জানলেও কতটুকুই বা সামর্থ্য তার? হয়তো কাউকে দিয়ে একবার ডাক্তার ডাকাবে। হয়তো স্থানীয় হাসপাতালের ফ্রি-বেডে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। অথবা হয়তো অনভিজ্ঞ ধাইয়ের হাতে আত্মসমর্পণ করে জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুলতে হবে শর্মিলাকে। যদি সে না বাঁচে? না না, মরতে সে চায় না। জীবনকে বড় ভালবাসে শর্মিলা। এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-ম পৃথিবীর মায়া এখনও তার মজ্জায় মজ্জায়। শর্মিলা মরতে চায় না। কিন্তু শব্দ তার মৃত্যুর কথাই তো উঠছে না; এমনও তো হতে পারে—সে বেঁচে উঠলো কিন্তু অনভিজ্ঞ গ্রাম্য ধাইয়ের হাতে বিধাতার প্রথম দানটিকে খোয়াতে

হল তাকে ! শিউরে ওঠে শর্মিলা । অলক্ষণে কথাটাকে ধূয়ে মূছে ফেলতে চায় মনের আঙিনা থেকে ।

প্রায় এই সময়েই ওদের সংসারে এসেছিলেন একটি বিচিত্র জীব । কী একটা যোগের স্নানের উপলক্ষ্যে আনন্দের কে এক মামিমা এসে হাজির হলেন মালদহ থেকে । সঙ্গে এল মামাতো ভাই অরুণ । আনন্দের চেয়ে বয়সে ছোট প্রায় শর্মিলারই সমবয়সী । বউদির সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতায় ছেলেটি সর্বদাই হাসিখুশী । কিন্তু তার মা-জননীটি অন্য ধাতুতে গড়া । যোগের স্নান চুকলো, তবু সপত্ন মামিমা যুক্ত হয়েই রইলেন ওদের সংসারে ।

ভদ্রমহিলার শূচিচারু আছে । সংসারের কুটোটি তিনি নাড়তে নারাজ । তা হোক । তাতে আপত্তি নেই শর্মিলার । দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন । তিনি কেন গিয়ে ঢুকবেন ওদের হেঁসেলে । কিন্তু তা তো নয় । সকালে উঠেই তিনি একটা কাঠালকাঠের পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসবেন রামাঘরের সামনে ছোট্ট বারান্দাটার । যেখান থেকে সমস্ত ভিতর বাড়িটার উপর নজর রাখা চলে । রুদ্ধাক্ষের মালাটা ঘোরাবেন হাতে আর ক্রমাগত লক্ষ্য করতে থাকবেন কে কোথায় কী করছে । পান থেকে চুন খসলেই ফোড়ন কাটবেন, ও আনন্দ, চৌকাঠের উপর বসলি কেন রে ? চৌকাঠে বসলে বাপের ধার হয় ; আর তোরই বা দোষ কি ! অ বউমা, বলি অ বড়লোকের মেয়ে, একখান মোড়া কি পিঁড়ি দে যাও না ।

রামাঘরের মধ্যে ভাতের ফ্যান গালাছিল শমু । তার দুটি হাত জোড়া । সামনে বসে তরকারি কুটছে উমা । সে বলে, থাক বউদি, আমিই দিয়ে আসছি । চট করে উঠে যান সে দাদাকে একটা মোড়া এনে দিতে ।

সঙ্গে সঙ্গে ধমকে ওঠেন বৃদ্ধা, হ্যাঁ রে উমি । গেরস্ত বাড়ির মেয়ে তুই, এটুকুও শিখিসনি ? আনাজ কুটতে কুটতে এভাবে উঠে যান ? কাত করে রাখ বঁটি ।

কিন্তু উমা তো আর বাড়ির বউ নয় মেয়ে । জবাব দেয়, আমি এখনই তো ফিরে এসে বসব বঁটিতে—এক মিনিটে আর কি হবে ?

খিঁচিয়ে ওঠেন মামি, মূখে মূকে তক করিস্ না উমি । ছেলোপিলের বাড়িতে—

উমা ততক্ষণে ফিরে গিয়ে বসেছে নিজের জায়গায় । হেসে বলে, ছেলোপিলে আবার ভূমি কোথায় পেলো মামি ? অরুণদা কি এখনও খোঁকা !

মামি গর্জে ওঠেন, খালি মূখে মূখে চোপা ! বে হলে আন্দনে যে তোরও তিনটে ছেলে হত !

উমা তবু রাগ করে না । বলে, বে তো আর হয়নি ।

হরিনামের মালাটা ঘন ঘন ঘোরাতে থাকেন মামি । আর গজগজ করতে

থাকেন নিজের মনে, কী সব ছেলেমেয়ে হচ্ছে আজকাল ! খালি তক আর তক ! আমাদের কালে এমনটি ছিলেন !

এমনি নিত্য ত্রিশদিন । দু'চার দিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছিল শর্মিলা । তবু মৃদু কিস্কু বলতেন । দু'দিনের অতিথি বৈ তো নয় । ওসব সহ্য করে যেতে হয় । কিস্কু আর কতদিন থাকবেন উনি ?

আরও একটি কারণে মর্মাহত হয়েছিল সে । দু'টি মাত্র ঘর । উমার ঘরে গিয়ে আগ্নেয় নিতে হয়েছিল শর্মিলাকে মামিমার সঙ্গে । আর বাইরের কামরায় আনন্দ রাগিবাস করত অরুণকে নিয়ে । এ ব্যবস্থাটায় আপত্তি করেছিল উমা ; কিন্তু আনন্দ নিজেই এ ব্যবস্থাটা পাকা করল । শর্মিলার মনে হল এই আনন্দ বৃষ্টি শর্মিলাকে এঁড়িয়ে যাবার একটা অজুহাত পেল । ঘরে আলো জ্বললে শর্মিলার ঘুম আসে না । সেটাও অবশ্য সত্য কথা নয় । আলো জ্বললেও দিবা ঘুমাতে পারে সে ; কিন্তু এ কথাটা আনন্দের কাছে স্বীকার করত না । শর্মিলার আর দোষ কি ? বেচারির মাত্র কয়েকমাস হল বিয়ে হয়েছে । কোন্ লঙ্কার সত্যি কথাটা বলবে ? ও একটু ঘুরিয়ে বলত, আলো জ্বললে আমার ঘুম আসে না, বাতি নিবিয়ে দাও ।

ও জানে বাতি-নেভানো আঁধার ঘরের আবেষ্টনী ছাড়া ঐ বইপাগল মানুষটার নাগাল পাওয়া যায় না । সমস্ত দিনটাই তো শর্মিলা আর আনন্দের মাঝখানে একসার ইতিহাসের বইয়ের আড়াল । রাগিটুকুও কি নিজস্ব করে পাওয়ার উপায় থাকবে না তার ? ফলে বেশি রাত জেগে লেখাপড়া করার সুযোগ ছিল না আনন্দের । উপায় নেই, শর্মিলার চোখে আলো লাগে । এখন সে অসুবিধা নেই । অরুণের ওসব বালাই নেই । অনেক রাত পর্যন্ত আলো জেলে পড়াশুনা করতে পারে আনন্দ । অরুণ তার বিছানায় মোবের মতো গড়ে পড়ে ঘুমায় । আর এ ঘরে চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকে শর্মিলা । ঘুমের বদলে চোখে নেমে আসে জল । এতদিন আলোর তার ঘুমের ব্যাঘাত হত, এখন অশ্বকারই তার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ালো । অশ্বকার ! এ কী অশ্বকার ঘনিজে আসছে তার চারদিকে ! আলোর দুলালী সে কি ভুল করে অশ্বকারে গলাতেই মালা দিয়েছে ? আনন্দ কি তাহলে তাকে ভালবাসে না ! সে কি ভুল বুঝেছিল ! শর্মিলার সাহচর্য, সান্নিধ্য—এমন কি শব্দমাত্র দৈহিক সান্নিধ্যেরও কি আর প্রয়োজন নেই আনন্দের ! জেগে জেগে সে লক্ষ্য করে পাশের ঘরে প্রহরের পর প্রহর আলো জ্বলতেই থাকে । দরের পেটা ঘড়িতে এগিয়ে চলে রাত । রেলওয়ে সাইডিংএ মালগাড়ির এঞ্জিন মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ; শার্টিং-এর কাজ চলতে থাকে । স্বনকন করে গাড়িতে গাড়িতে থাকা লাগে । আবার চক্ষু হয়ে যায় সব । প্রহরে প্রহরে ডাকে শেল্লাল । রাগিচর চৌকিদারের হাঁকে চমকে ওঠে মাঝে মাঝে । মিউনিসিপ্যালিটির

একপায়ে-খাড়া, ল্যাম্পপোস্টের বাত্বটা ফিউস হয়ে গেছে। মশারির উপর এতদিন যে আলোর চক্ৰটা দেখা যেত সেটা মিলিয়ে গেছে। অমাবস্যা থাকে আর না থাক, ওর ঘরে আজ নিত্য অমাবস্যা। একেবারে শেষ রাতের দিকে হঠাৎ নিবে যায় ও ঘরের আলো। আশ্চর্য, একদিনও কোন ছুতোয় আনন্দ এ ঘরে আসে না, অথবা ভিতরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় না ভুলে।

দুরন্ত অভিমানে শর্মিলা আরও সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

বোধ করি এই সময়েই ওর মনের নিস্মোগ্রাফে প্রথম ধরা পড়ে ভূকম্পন রেখা। ওর প্রথম মনে হয়—ও ভুল করেছে। মারাত্মক ভুল। যে উপাদান থাকলে একটা মানুষকে নিয়ে একজন মেয়ে ঘর বাঁধতে পারে সেই মৌল উপাদানটাই নেই আনন্দের চরিত্রে। ও অনুভব করতে পারে ওর মনের বেদনার মূল উৎসটা কোথায়। অর্থনৈতিক অভাব অনটন নয়—আনন্দের চরিত্রের এই অভাবটাই তাকে সবচেয়ে পীড়িত করে। এইখানেই ভুল হয়েছে তার। বন্দুপরিবার থেকে চিরদিনের মতো বোঁরিয়ে আসার সময় সব দিকই ভেবে দেখেছিল শুধু এই কথাটা ভেবে দেখেনি, অভাব। অনটন, অনাহারের সঙ্গে লড়তে হবে এ কথা সে জানত,—মনকে সেজন্য তৈরী করেই এসেছিল—কিন্তু এ কথা ভাবেনি, যে অশ্রুটার সাহায্যে ঐ দারিদ্র্য দৈত্যটার সঙ্গে লড়াই করবে সেই অশ্রুটাই ভীত হয়ে যেতে পারে। শর্মিলা হারতে বসেছে—কিন্তু সে অভাব অনটনের কাছে নয়, সে পরাজয় আনন্দের নিঃস্প্রম উদাসীনতার কাছে।

আর কেউ না বুঝুক উম্মার নজর এড়ায়নি ব্যাপারটা। বউদির মানসিক পরিবর্তনটুকু তার নজরে এসেছিল। লক্ষ্য করেছিল, বউদি সারাদিনই যেন কী ভাবে; আনমনে থাকে। সেই বুঝতে পেরেছিল ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। তাই মাসখানেক কাটিয়ে মামি যখন যাবার সময় বললেন, উমিও চলুক, না কেন আমার সঙ্গে মালদ'য়, হ'য়ারে আন্দ' ? হতভাগীটা তো কখনও কোথায় যাবার সুযোগ পায় না—তখন এক কথাতেই উমা রাজী হয়ে গেল। বোধ হয় সে ওদের দুজনকে বোঝাপড়া করে নেবার একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিল। তাই শর্মিলা যখন তাকে জনান্তিকে বললে, আমি যে একেবারে একলা পড়ে যাব ভাই ? তখন উমা হেসে বলেছিল, একেবারে একা তো নয়, দুজনে একা।

শর্মিলা ধমকে ওঠে, মুখে আর কিছু বাধে না, না ?

উমা মুখ টিপে হেসে বলে, বাধবে কোন দুঃখে ? বলস তো কম হয়নি। বে হলে অ্যান্ডিনে যে তিন ছেলের মা হতুম ! শুনলে না সেদিন ?

শম্ভু খিল খিল করে হেসে ওঠে। মামিমার নকল করে বলেছিল, খালি দুখে দুখে চোপা !

মনে মনে কিন্তু খুশী হয়েছিল শর্মিলা। সত্যিই সে একবার মন্থোমুখি দাঁড়াতে চায় জীবনের। জেনে নিতে চায়, তার সমস্ত আকর্ষণীয় শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে কিনা। পরখ করে নিতে চায়, প্রেসিডেন্স কলেজের সামনে ওর ক্লাসের রুটিন হাতে যে ছেলেটা ক্রমাগত পায়চারি করত সে এই আনন্দ কিনা।

যাবার আগে উমা ওকে আড়ালে ডেকে বললে, একটা কথা বলব বউদি ?

একটু ঘাবড়ে গিয়ে শর্মিলা বলে, কি কথা ?

—কাল রাতে তুমি কলঘরে গিয়ে বমি করেছিলে, নয় ?

শর্মিলা কী জবাব দেবে বুঝতে পারে না।

—আমি যা ভেবেছি, তা সত্যি, নয় ?

এবারও শর্মিলা কোন কথা বলতে পারেনি।

আর উমা পাগলির মতো হঠাৎ ওকে জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমো খেয়েছিল।

—এই যাঃ, কী হচ্ছে ! ধমকে উঠেছিল সে।

—তাহলে আমার যাওয়া বন্ধ করে দিই, কেমন ? দাদা জানে তো ?

শর্মিলা আর গোপন করেনি কোন কথা। অনেক পরামর্শের পর ঠিক হয় উমা যাবে বটে তবে দিন পনের-কুড়ির মধ্যেই ফিরে আসবে। মামির উপস্থিতিতে খবরটা আর জানাজানি করে কাজ নেই। তারপর সুযোগমতো শর্মিলা আনন্দকে বলবে। উমা বারবার তাকে সাবধান করে দিয়ে যায়, শরীরের যত্ন নিতে, সাংখানে থাকতে।

আশ্চর্য ! উমারা চলে যাবার পরেও আনন্দের দিক থেকে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করল না শর্মিলা। ওদের বিয়ের বছর ঘোরেনি। গত একমাস ওদের দিনগুলি ছিল মানুষজনের কোলাহলে আঁবিল, রাগিণীগুলি ছিল ইটের প্রাচীরে বিচ্ছেদিত। এ সত্যটা যেন মনেই নেই আনন্দের। দীর্ঘ একমাস বিচ্ছেদের পর প্রথম রাগিটার কথা স্পষ্ট মনে আছে শর্মিলার। বোধ হয় এতবড় আঘাত সে আর কখনও পায়নি বলেই।

সকালের গাড়িতে আনন্দ মামিমাদের ট্রেনে তুলে দিতে গেল। দূপুরের দিকে তার ক্লাস ছিল। ফলে স্টেশন থেকে সে কলেজে চলে যায়। অনেকদিন পর ফাঁকা বাড়িতে শর্মিলা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল যেন। জানলার পর্দাগুলো কাচতে নিল, বালিশের ওড়, বিছানার চাদর, সব। দূপুরে আর শব্দেও গেল না। ঘরদোর সাফা করল বসে বসে। আনন্দকে চমকে দিতে হবে। বিকালের আগেই পালটে গেল ঘরের চেহারা। জানলায় ধপধপে পর্দা, বিছানায় পরিষ্কার চাদর, বালিশ-ঢাকা। রক্তকরবীর একটা গুচ্ছ তুলে এনে রাখল জল দিয়ে মাটির ফুলদানিটার। বিকাল চারটে বাজে কি বাজে না গা ধুয়ে এল পুকুরে। প্রসাধন করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। শখের মধ্যে কেনে শব্দ জ্বাকুসন্দ

তেলটা । এটা ওর চিরদিনের অভ্যাস । যতই বায়সঙ্কোচ করুক অন্য কোনও তেল সে ব্যবহার করতে রাজি নয় । আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুল বাধল । একটু লজ্জা লজ্জা করছে তা হোক—সেই বিশেষ শাড়ি-খানাই বার করে পরল শেষ পর্যন্ত । বাসন্তী রঙের মর্শিদাবাদী সিন্ধুটা । এটা দিয়েছিলেন ওকে বিয়েতে আনন্দের বাবার বৈমাগ্নেয় ভাই—ওদের রতনদাদু ! ফুলশস্যার রাতে এই শাড়িখানাই পরেছিল সে । উমা বলেছিল, ফুলশস্যায় বেনারসী পরতে হয়—সে কিন্তু তা শোনেনি । আনন্দ সেই বিশেষ রাশিটিতে ঐ শাড়িটিরও প্রশংসা করেছিল । সচরাচর শাড়ি গহনার দিকে তার নজর থাকে না—তবু বলেছিল, এ শাড়িখানাতে তোমাকে ভারী চমৎকার মানিয়েছে তো !

শুধু শাড়িই নয়, সাদা মৃত্তোর মালাছড়াও বের করে পরল গলায় । এটা ডায়ডির দেওয়া । না, ওর বিয়েতে নয়,—ও ফাস্ট ডিভিশনে স্কুল ফাইনাল পাশ করার খবর পেয়ে ব্যারিস্টার বোস-সাহেব এ মালাছড়া উপহার দিয়েছিলেন শমুকে । এটা সে নিয়ে এসেছিল আসার সময় । বাবার দেওয়া স্মৃতিচিহ্ন । মনে আছে এই মালাটাও ছিল ওর গলায় সেই ফুলশস্যার অবাধ রাশিটিতে ।

সাজগোজ শেষ হলে শর্মিলা এসে দাঁড়ালো একবার আয়নার সামনে । বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু । একবার ভাবল, ছিঃ খুলে ফেলা যাক এ পোশাক ; কিন্তু আবার মনে হল, থাক না !

বাসন মেজে দিয়ে ঝি চলে গেছে । শর্মিলা একাই বসে আছে বাড়িতে । সম্মা হব হব । আচ্ছা, আনন্দটা কী ! আজকের দিনেও একটু সকাল সকাল বাড়ি আসতে পারে না ! কলেজ ছুটি হয়ে গেছে তো সেই চারটেয় । কী করছে সে এতক্ষণ !

একখানা বই টেনে নিয়ে পড়তে থাকে ; কি মন বসে না বইতে । কানটা খাড়া আছে কখন সদর দোরে কড়া নাড়ার শব্দ হয় । কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা । তিল তিল করে কেটে যায় সময় ; বনিয়ে আসে রাত । শর্মিলা উনুনে আগুন দেয়—রান্না চড়ায় । ক্রমে রান্নার কাজও শেষ হল তার । লোকজনের চলাফেরাও কমে এল পথে । শেষে রাত সাড়ে নটা নাগাদ ফিরে এল আনন্দ । ততক্ষণে শর্মিলার মনের সবটুকু রসকষই শূন্যকিয়ে যাবার উপক্রম ।

—এত দেরী হল যে ?

—কলকাতায় গিয়েছিলাম একটু ।

—কলকাতায় ! হঠাৎ ?

—ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে একখানা বই আনতে ।

—ও !

—চল, খেয়ে, নিই গে ।

শর্মিলা আর কোন কথা বলে না। স্বাস্থ্যের এসে ভাত বেড়ে দেয়। আনন্দ মৃদু হাত ধরে এসে খেতে বসে। আহারাঙ্কে আনন্দ উঠে যায় শোবার ঘরে। অশ্চর্য, একবারও সে তাকিয়ে দেখে না ঘরখানার দিকে। অথবা ঘরগীর দিকে।

দাঁতে দাঁত দিয়ে যা হোক দুটি খেয়ে নিয়ে শর্মিলা যখন শূতে এল তখনই ঘটল চরম দুর্ঘটনা। আনন্দ বললে, আলো জ্বললে তো আবার তোমার ঘুম আসবে না—আমি তবে ও ঘরে গিয়ে বসি ?

শর্মিলার ইচ্ছে হল কাঁপিয়ে পড়ে আনন্দের উপর। আঁচড়ে কামড়ে তাকে ক্ষতিবিক্ষত করে দেয়। সে কিন্তু সে ইচ্ছাকে দমন করে শেষ পর্যন্ত। অনেক কষ্টে অশ্রু গোপন করে বলে, আজ রাতেও তুমি লিখবে ?

—না, লিখব না, পড়ব। এই বইখানা—

—বুঝছি। থাক, ও ঘরে যেতে হবে না। এ ঘরেই পড়; আলোতে আমার অসুবিধে হবে না।

—ও আচ্ছা। বইখানা নিয়ে আনন্দ গিয়ে বসে টেবিলে।

শর্মিলা চুপ করে বসে থাকে খাটের উপর। দু মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, আনন্দ তন্দ্রায় হয়ে বই পড়ছে ততক্ষণ। শর্মিলা ওঠে। টেবিলটা গোছায়। আলনার কাপড়গুলো নামায় আবার কুঁচিয়ে রাখে। আনন্দ নির্বিকার। বইয়ের মধ্যে একেবারে ডুবে গেছে। শেষ পর্যন্ত শর্মিলা কি জানি কেন হঠাৎ বলে বসে, তুমি একটু ও ঘরে যাবে, আমি কাপড়টা ছেড়ে নিতাম। এবার শোব তো।

—খ্যা! ও, আচ্ছা আচ্ছা।—বইখানা নিয়ে হস্তদত্ত হয়ে আনন্দ চলে যায় পাশের ঘরে। না গিয়ে উপায় কি? এ ঘরে যখন একজন ভদ্রমহিলা কাপড় পালটাতে চাইছেন তখন তাকে শালীনতার খাতিরে স্থানত্যাগ করতেই হয়।

আলো জ্বলল ওঘরে। আর এ ঘরে চুপচাপ পড়ে রইল শর্মিলা, তার ভরা যৌবনের পসরা সাজিয়ে। এক পায়ে খাড়া মিউনিসিপ্যালিটির বাগবাহীন পোস্টটা অশ্বকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাত্রির পাহারাওয়ালার হাঁকে চমকে ওঠে একবার। পেটা ঘড়িতে বেজে যায় বারোটা, একটা, দুটো। সদ্য কাচা ধপধপে বালিশের ওড়টা ভিজে যায়, শর্মিলা বাথরুমে উঠে যায়। গায়ের মধ্যে পাক দিয়ে উঠেছে তার।

শর্মিলা ভেবেছিল ওরা চলে গেলে এই দুজনে-একর সংসারে বৃষ্টি ফিরে আসবে ওদের সেই হারানো দিনগুলোর মেঘ-রোদ্দের খেলা। নতুন করে আবিষ্কার করবে সে নিজেকে আনন্দের মৃদু দৃষ্টির আরশিতে। আনন্দ আনমনা, উদাসীন—এ কথা জানা ছিল;—কিন্তু সে তো এমন ছিল না। শর্মিলার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিল, তাকে দেখবার জন্য, তার সঙ্গে কথা বলবার

জন্য সে যে এক সময় ছটফট করত এ তো মিথ্যা নয় । মেয়েদের সাজসজ্জা সম্বন্ধে সে সাধারণত অন্যান্যমনস্ক : কিন্তু শর্মিলার গলার এই মূস্তোর মালাটাতে তাকে যে ভাল মানায়, এই বাসন্তী রঙের শাড়িতে তাকে যে আরও সুন্দর দেখায় এসব কথা তো শর্মিলা আনন্দের মুখেই শুনছে । তাহলে ওর সেন্সব অনুভূতি, সেই মন কোথায় গেল ? আনন্দের দিক থেকে কোন সাড়া জাগল না বাড়ি খালি হয়ে যাবার পরও । শর্মিলা অন্তরের নিরুদ্ধ রোধে ফুলতে থাকে । সে হেরে গেছে, হারিয়ে যেতে বসেছে । নিজেকে আর সামলাতে পারে না । সোজা কথাগুলোও বাঁকা বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসে মুখ থেকে । গত মাসে সংসার খরচ বেশি হয়েছে মাস কাবার হবার আগেই আবার তাকে হাত পাততে হল আনন্দের কাছে । আনন্দের পক্ষে বিব্রত হয়ে পড়া স্বাভাবিক । কোথায় সে বুঝবার চেষ্টা করবে আনন্দের ব্যথা, তা নয়, খিঁচিয়ে ওঠে একেবারে, খরচের সম্বন্ধে যদি এত ভয় তাহলে মামিকে আসতে বারণ করান কেন ।

আনন্দ থওমত খেয়ে বললে, সে কথা নয়, আমি বলছিলাম কি দৃশ্য টাকাই কি খরচ হয়ে গেছে একেবারে ?

—না তো কি মিছে কথা বলছি আমি ? কী ভাব তুমি ? সংসার খরচের টাকা থেকে মাসে মাসে বাপের বাড়ি মনি অর্ডার করছি ?

বেদনাতুর দৃষ্টি চোখ তুলে আনন্দ বলে, ছি শম্ ! তুমি আমাকে অপমান করতে গিয়ে নিজেই ছোট হয়ে যাচ্ছ, তা বোঝ না ?

—কী, তুমি আমাকে ছোটলোক বললে ?

আনন্দ জবাব দেয় না । পাঞ্জাবিটা গায়ে চাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ার উদ্ভোগ করে । শর্মিলা বলে, যাচ্ছ কোথায় ? বিরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লে নাকি ?

চৌকাঠের উপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আনন্দ, ঘুরে কিছুর বলতে যায় । তারপর সামলে নিয়ে বলে, না । কিছুর ধার ধরে আনতে যাচ্ছি । হাতে এখন কিছুরই নেই ।

—আবার ধার ! কেন, সোঁদিন সে ভদ্রলোক যে অপমান করে গেলেন তাতে বৃদ্ধি তৃপ্তি হয়নি তোমার ? কার কাছে যাবে ? কাবুলীওয়ালার সম্মান পেয়েছ নাকি ?

আনন্দ আর দাঁড়ায় না । চলে যায় বেরিয়ে ।

ও চলে গেলেই শর্মিলা উবুড় হয়ে পড়ে বালিশের উপর । কেন সে বলতে গেল এ কথাগুলো ? মানবুটা যে কী অপরিসীম পরিশ্রম করছে তা কি শর্মিলা দেখতে পার না ? নিজের জন্মলায় যে জন্মে মরছে তার গায়ে এভাবে নুনের ছিটে দিয়ে কী লাভ ? ঈশ্বর জানেন এ সব কটু কথা বলতে চায় না শর্মিলা । সে পুরুষপুত্রি ভাগ নিতে চায় আনন্দের দুঃখের, বেদনার, তার অসহায়ত্বের । কিন্তু আনন্দ কেন তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে ? কেন তাকে অপমান করছে

এভাবে? অপমান বইকি! তার ভালবাসাকে, তার নারীত্বকে, তার যৌবনকে অপমান করেছে আনন্দ।

ভাব করবার জন্যে, মিটিয়ে নেবার জন্যে আশ্রয় চেষ্টা করেছে শর্মিলা, কিন্তু কোথায় কী যে হত, কিছুতেই মিলত না আর। ভাঙা চীনে মাটির পাথর যেন। দাগে দাগে মিলিয়ে দাও, জোড়ার দাগ দেখা যাবে না; কিন্তু যেহেঁ সে পাথরে জীবনের রস ঢালতে যাবে, অমনি দেখবে ফাটল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অমৃতধারা। পাথরে ধরা পড়ছে না কিছুই।

মনে আছে সেদিন সম্মিয়ার কথা। টাকার খান্দার সারারাজা ঘুরে ঘুরে চারেক পরে ফিরে এসেছিল আনন্দ। রোদে রোদে ঘুরেই মূখটা লাল হয়েছে, না উত্তমণের কাছে কিছু মিশ্রিমধুর সম্ভাষণ শুনলে অপমানে লাল হয়েছে বুকতে পারে না শর্মিলা। ফিরে এসে ক্যাম্বিসের ইঁজিচেরারে শূয়ে পড়েছিল ক্লান্ত মানুষটা। ইতিমধ্যে রাগ পাড় গিয়েছিল শর্মিলার। সে জানত আনন্দের ফিরতে দেরী হবে। অনেক জায়গাতেই সে ধার করেছে। মাসের এ চতুর্থ সপ্তাহে সহজে সে টাকার যোগাড় করতে পারবে না। তাই মিছারির একটা ডেলা ভিজিয়ে রেখেছিল। পার্টিলেবুর রস দিয়ে এক গ্রাস সরবৎ তৈরি করে তালপাতাটা হাতে নিয়ে শর্মিলা এসে দাঁড়ায় ওর ইঁজিচেরার সামনে। হাতটা চোখের উপর দিয়ে চূপ করে শূয়েছিল আনন্দ। শর্মিলা যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নিশ্চয় টের পায়, কিন্তু চোখের উপর থেকে হাতটা সরায় না। শর্মিলা ওর পাঞ্জাবির বোতামগুলো একে একে খুলে দেয়। আনন্দ আশঙ্কিত করে না।

—হাতটা নিয়ে বের হলেই পারতে। এঃ একেবারে ঘামে ভিজে গেছ!

ঘন ঘন পাখাটা নাড়তে থাকে। নিঃসাড়ে আনন্দ পড়ে থাকে একই ভাবে।

—নাও, এটা খেয়ে নাও।

চোখ থেকে হাতটা সরিয়ে এবার বলে, কী ওটা?

—সরবৎ।

—থাক, তার প্রয়োজন নেই। ভেঁস্টা পায়নি আমার।

—পেয়েছে। আর না পেয়ে থাকে নেই। একটু হেসে বলে, উপরোখে মানুষে ঢেঁকি গেলে, আর এ তো এক গ্রাস জল।

তবু আনন্দ হাতটা বাড়ায় না। পকেট থেকে একগুচ্ছ নোট বার করে বলে, নাও, ধর।

শর্মিলা টাকাটা নেয়। একটু অবাক হয়। দশখানা দশ টাকার নোট। এত টাকা কোথা থেকে আনল আনন্দ? কিন্তু এখন সে প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়। পরে সুযোগমতো জেনে নিলেই হবে। বলে, নাও, তুমি এটা ধর।

—বললাম তো ভেট্টা পারনি।

—আমিও তো বললাম, না পেলোও খেতে হবে তোমাকে।

আনন্দ উঠে পড়ে। চৌকির উপর গিয়ে শোয়। বলে, কেন বিরক্ত করছ আমাকে? আমি আজ বড় ক্লান্ত। আমাকে রেহাই দাও।

দেওয়ানের দিকে মুখ করে শোয় সে।

রাগে অপমানে শর্মিলা মুহূর্তে জ্বলে ওঠে। আছড়ে ভেঙে ফেলে সে সরবতের গ্লাসটা। নোটগুলো ছুঁড়ে দেয় আনন্দের দিকে। চেঁচিয়ে ওঠে, মনে করেছে একশো টাকা আমি একসঙ্গে কখনও চোখে দেখিনি না? একেবারে কিনে ফেলেছ আমাকে?

আনন্দ উঠে বসে।

—প্রতিপালন করবার ক্ষমতা যার নেই, তার বিয়ে করার শখ কেন?

ছুটে বেরিয়ে যায় সে ঘর ছেড়ে। পাশের ঘরে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু আবার নিজেই শান্ত হয়। এ কোনও সমাধান নয়। পাশের ঘরে ছিটানো পড়ে আছে কাচের টুকরো, নোটের বাঁশডল। আধঘণ্টাখানেক পর মুখ-চোখ মুছে আবার উঠে আসে এ ঘরে। দেখে মেঝেতে একটিও কাচের টুকরো নেই। নোটগুলিও গুঁছিয়ে রেখেছে আনন্দ আলমারির জুয়ারে। কখন নিঃশব্দে আবার বেরিয়ে গেছে ক্লান্ত মানুষটা চিটিটা পায়ে গলিয়ে।

বারে বারে শর্মিলা চেষ্টা করেছে সহজ হতে, রাগ চাপতে, কিন্তু পারেনি। আনন্দও যদি প্রতিবাদে আঘাত করত ওকে, তাহলে সে খুশী হত। এত যে সে অপমান করে, আনন্দ কি ক্ষেপে যেতে পারে না? একেবারে আত্মহারা হয়ে আঘাত করে বসতে পারে না শর্মিলাকে? তাহলেও তো একটা সদ্ব্যবহার হয়। তাহলে অন্তত অনুশোচনায় ভেঙে পড়বে আনন্দ। আদরে সোহাগে শর্মিলাকে করে তুলবে ক্ষমামুখর! কিন্তু তার কোন লক্ষণই নেই; মানুষটা যেন পাথর অথবা ভারবাহী একটা মোষ। মার খায় তবু টেনে চলে সংসারের এই মশ্বরগতি গেযান। একবারও প্রতিবাদ করে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুখ খুলেছিল একদিন আনন্দ।

সেদিনটার কথাও স্পষ্ট মনে আছে ওর। ঐ ঘটনার দিন কতক পরে।

সমস্ত দিন পরিশ্রম করে আনন্দ রাত্রি দশটার সময় যখন ফিরে এল তখন ওর মুখচোখ দেখে করুণা হয়; কিন্তু আশ্চর্য, করুণার বদলে প্রচণ্ড রাগে যেন ফেটে পড়তে চাইল শর্মিলা। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, রাত্রের এ টাইশ্যানিটা ছেড়ে দাও তুমি।

আনন্দ জবাব দেয় না। পাঞ্জাবিটা ঝুলিয়ে রাখে হ্যাঙারে।

—জবাব দিলে না যে?

—কী জবাব দেব ? তুমি জানোই, তা সবেও নূন-আনতে-পাক্ষা ফুরোচ্ছে ।
ঝন্ করে ওঠে মাথায় মধ্যে । তবু বলে, আমার সেই একদিনের মৃৎ
ফস্কে বলা কথাটাই তুমি মনে রেখেছ দেখছি ।

আনন্দ হেসে বলে, হ্যাঁ, স্মৃতিশক্তিটা অন্তত আমার ভালই ।

সে হাসি দেখে জ্বলে উঠেছিল শর্মিলা, তা জানি । আমি ভাবতুম যে,
শুধু সাল-তারিখ মৃৎস্থ করতেই বৃষ্টি সে স্মৃতিশক্তি ফুরিয়ে গেছে তোমার ।
নইলে এ কথা কি মনে নেই, ডাক্তারবাবু তোমাকে রাত জেগে কাজ করতে বারণ
করেছেন ?

আনন্দ চকিত হয়ে বললে, কে বলেছে তোমাকে ?

শর্মিলা বলে না যে যাবার আগে উম্মাই বলে গেছে তাকে । সে শুধু বলে,
আমাকে কে বলেছে সেটা বড় কথা নয়, তোমাকে যিনি বলেছেন তিনি চোখের
ডাক্তার ।

আনন্দ জবাব দেয় না । নিঃশব্দে তার পা'ড়লিপি পেড়ে নামায় তাক
থেকে ।

শর্মিলা ছিনিয়ে নেয় খাতাপত্রগুলো । বলে, কী ভেবেছ তুমি ? এ ভাবে
অস্থ হয়ে শাস্তি দেবে আমাকে ?

আনন্দ যথারীতি চোখ থেকে চশমাটা খুলে মূহুর্তে থাকে । জবাব দেয়
না । গুর নীরবতায় আরও ক্ষেপে যায় শর্মিলা । বলে, মনেও ভেব না, তাহলে
পা ছাড়িয়ে কাঁদতে বসব আমি ।

চশমাটা চোখে বাঁসিয়ে গ্লান হেসে আনন্দ বলেছিল, জানি, কাগজে পড়েছি ।
প্রথমটা বৃষ্টিতে পারেনি শর্মিলা । তাই অবাক হয়ে বলেছিল, কাগজে
পড়েছ ! কী পড়েছ কাগজে ?

—হিন্দু কোড বিল পাশ হয়ে গেছে । অস্থ স্বামীকে ডিভোর্স করা চলে ।

আর নিজেকে সামলাতে পারেনি শমু । রাগে দৃষ্টিতে অভিমান প্রচণ্ড থাকে
মেরেছিল আনন্দকে । বলেছিল, তুমি ইতর, তুমি—

কথাটা তার শেষ হয়নি । আনন্দ টাল সামলাতে না পেরে থাকে খেমেছিল
মশারির ছাঁতির সঙ্গে । কপালটা কেটে যায় তার । রক্ত ফুটে ওঠে গুর
কপালে ।

মূহুর্তে একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল শর্মিলা । এভাবে যে সে কান্ডজ্ঞান
হারাতে পারে, বাস্তব মেয়েছেলের মতো দৈহিক আঘাত করে বসতে পারে তা যে
তার স্বপ্নেরও অগোচর । ভয়ে, লজ্জায়, অনুশোচনায় সে মরমে মরে গিয়েছিল ।
সম্মোহিতের মতো আঁচলটা, দিয়ে চেপে ধরতে গিয়েছিল ক্ষতস্থান, কিন্তু প্রচণ্ড
ঘৃণায় আনন্দ তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, থাক শর্মিলা । ওতে আমার
ভাঙা কপাল জোড়া লাগবে না ; গরিবের ছেলের ঘোড়া রোগের এ মাসদল্টুক

আমার প্রাপ্য ।

বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল শর্মিলা । আনন্দ নিজেই উঠে কলষেরে গিয়ে মৃৎখটা ধুয়ে এসেছিল । ওঘরে গিয়ে শূন্যে পড়েছিল আর কথা না বাড়িয়ে । অনেকক্ষণ দৃ-হাতে মৃৎ থেকে কেঁদেছিল শর্মিলা । তারপর সব অভিমান, সব অপমান ঝেড়ে ফেলে ডাকতে গিয়েছিল আনন্দকে । কারও তখনও রাতের খাওয়া হয়নি । গিয়ে দেখেছিল পাশের ঘরের অর্গল বন্ধ ।

শর্মিলা সারারাত কেঁদেছে । দুরন্ত অভিমানী সে, তবু সব অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বারে বারে ডেকেছে দরজার এ প্রান্তে বসে । ফল হয়নি । ঠিক তেমনি করেই হেঁকে গেছে রাত্রির পাহারাওয়ালা, প্রহরে প্রহরে ঘামঘোষকের কান্নার হাহাকাারে নৈশ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেছে । থানার পেটোষড়িতে গড়িয়ে গেছে জাগর রাত্রি । তারপর চৌকাঠের উপরে কখন ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছে শর্মিলা ।

পরের দিনটা ছিল রবিবার । ছুটির দিন । রাতের ভাত ধরাই আছে । শর্মিলার আজ রান্নার হাঙ্গামা কম । জল দিয়ে রেখেছিল ভাতে । ভেবেছিল বেলা হলে শূন্য আনন্দকে দুমুঠো ফুটিয়ে দেবে । ডাল তরকারি গরম করে নিয়েছিল । নষ্ট হয়নি কিছু ।

সকাল থেকে আনন্দ নিজের খাতাপত্র নিয়ে বসেছে । কাল রাতে স্ট্রেক্ট ফাঁকি গেছে স্ট্রেক্ট বোধ করি পুঁষিয়ে নিতে চায় সে । ঠিকে ঝিটা কামাই করেছে । চায়ের বাসনগদুল ধুয়ে দু কাপ চা তৈরী কবল শর্মিলা । একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে চা খাওয়ার যুগ গেছে । যাবে না ? কতদিন আগে বিষয়ে হয়েছে ওদের কত যুগ আগে ! চায়ের কাপটা ওর সামনে নামিয়ে রেখে শর্মিলা ফিরে আসে রান্নাঘরে । মশুর গতিতে এগিয়ে যায় বেলা । আনন্দ স্নান সেরে আসে । ভাত বেড়ে শর্মিলা ডাকে । নিঃশব্দে আহারাতি সেরে আনন্দ আবার উঠে যান ঘরে । শর্মিলা ভাবে সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে সেও গিয়ে রুপ করে শূন্যে পড়বে ওর পাশে । আজ আর বাসন্তী রঙের মৃশিদাবাদী সিন্ধু নয়, সাদা মৃন্তোর মালা নয়—আজ তার অন্য মাজ । আটপোরে আর সাধারণ । বাইরের সম্পদ নয়, অন্তরের সম্পদ দিয়ে জয় করে নেবে আনন্দকে । রূপে আর ভোলাবার চেষ্টা নয়, ভালবাসায় ভোলাতে হবে । কমা চেয়ে নেবে অকুণ্ঠ ভাষায় । এই সুযোগ । আজকের এই ছুটির দুপুরে সে তার রঙের টেকাখানা খেলে দেখবে, পিঠ পায় কিনা ! আনন্দের বুক মৃৎ লুকিয়ে বলবে—কাল রাতে নিজেও রাগ করে খেলে না আমাকেও খেতে দিলে না ।

আনন্দ বলবে—পাত্তা ভাতগুলো একা একা খেলে কেন ? আমাকেও দিলে পারতে ।

শর্মিলা বলবে—তুমি কি দৃঃখে খেতে যাবে ? তেঁতুল গোলা আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেতে আমার যে সাধ হয়েছিল ।

আনন্দ ঠোট উলটে বলবে—বলিহারি তোমার সাধ !

আর শর্মিলা বলবে—মেয়েদের সাধের কথা তুমি কী জানবে ?

কেন জানব না ?

আচ্ছা বল তো, মেয়েদের কখন এমন উদ্ভূটে শখ হয় ?

বোকার মতো তাকিয়ে থাকবে আনন্দ । শর্মিলা ওর গালটা টিপে দিয়ে বলবে অধ্যাপক না হাতি ! তুমি একটি বোকার রাজা ! তারপর কানে কানে বলবে সেই বিস্ময়কর সংবাদটি সেই টেকার তুরূপ !

আনন্দ নিশ্চয় আত্মহারা হয়ে যাবে । চুমায় চুমায় বিপর্যস্ত করে তুলবে শম্মুকে । আর আনন্দঘন আগ্রহশয়না শম্মু মৃদু প্রতিবাদ করে বলবে—আই ! কী হচ্ছে অসভা ! ওদিকের জানলাটা খোলা আছে না !

হায় রে দুরাশা ! বাস্তবে এসব কিছ্ই হয়নি কিছ্ই ।

জল-দেওয়া পান্তাভাত একটা এনামেলের থালায় বেড়ে নিয়ে শর্মিলা সবে খেতে বসেছে রান্নাঘরে ; হঠাৎ বাইরের ঘরে অনেকগুলি মিলিত কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে ওঠে । সামলে নিতে নিতেই হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ে ওরা । পাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রম্মু আর বাদল । বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় শর্মিলা ।

রান্নাঘরে চৌকাঠের ক্রমে ঘেন একখানা ছবি । মাইশোর জর্জে'ট শাড়িখানা পাকিয়ে পাকিয়ে ধরেছে রম্মার দেহকে । এক হাতে রিস্টওরাস, অপর হাতে একসার কাচের চুড়ি । বাদলের হাতে প্রকাণ্ড একটা প্যাকেট । দ্বারিকের সন্দেশ । শর্মিলার চোখে আর পলক পড়ে না ।

রম্মার চোখেও লেগেছে বিস্ময়ের ঘোর । প্রায়শ্চকর একটি ঘরে কাঁধতোলা এনামেলের থালায় একরাশ পান্তাভাত নিয়ে কঠাল কাঠের ছোট পিঁড়িতে লালপাড় মিলের শাড়িপরা ওই মেয়েটি কে ! এই কি সেই লরেটো-লালিতা তার দিদি !

শর্মিলাই প্রথমে সামলে নেয় নিজেকে ; বলে—নে, পথ ছাড়, আমার খাওয়া হয়ে গেছে ।

হঠাৎ গলাটা ধরে যায় রম্মার । গলাটা সাফা করে নিয়ে বলে, ঐ তো পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা-ভাত খাচ্ছিস ; তাও আমাদের অত্যাচারে আধপেটা থাকবি ? নে নে, তোকে আর কুটুম্বিতা করতে হবে না । খেয়ে নে ভাত কটা । আমি বসছি ।

কিছ্ তাই কি পারে শম্মু ? কোথাও কিছ্ নেই হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিল সে । সে কি রাগে, অপমানে, দৃঃখে ? না কি দীর্ঘদিন পরে প্রিয়জন মিলনের

আনন্দ ?

রমলা তো অপ্রস্তুতের একশেষ ।

বাইরের ঘরে নয় । শোবার ঘরেই এনে বসিয়েছিল ওদের । অপরের যেন অতি মাত্রায় স্বাভাবিক হতে চায় । যা দেখে তারই প্রশংসা করতে থাকে ।—
বাঃ ! কী সুন্দর ছোট্ট বাড়িখানা ! ওটা বুদ্ধি লতানে জুঁই ? ভারি সুন্দর তো । এ টেবিল-ঢাকাটা বুদ্ধি তুই তৈরি করেছিস শম্ভু ? প্যাটানটা গ্রান্ড । ও ফুলদানিটা তো ভারি বিউটিফুল !

শর্মিলা লজ্জা পায় । এতটা বাড়িবাড়ি দাদা না করলেও পারত । বুদ্ধিতে অসুবিধা হয় না গরিব ভগনীপতির উপর এ তার অকারণ দারিদ্র্য । আর এমন নির্বোধ আনন্দ, কোথায় সে লজ্জায় ঘটিতে মিশে যাবে, তা নয় সব কথাতেই সে খুশীময় হয়ে ওঠে । আগ্রহভরে বোঝাতে থাকে—না, ওটা লতানে জুঁই নয়, মাধবীলতা । আজে না, টেবিল-ঢাকাটা উমা তৈরি করেছে । উমা ওর ছোট বোন । না, সে এখন এখানে নেই । ফুলদানিটা ? ওটা একটি মুকব্বির ছেলের তৈরী । ওর একজন মাস্টার-মশায়ের একটি আশ্রম আছে । বিকলাঙ্গদের প্রতিষ্ঠান । ওটা মাস্টার-মশাই তাকে উপহার দিয়েছেন ।

শর্মিলা মরমে মরে যায় । শান্ত সরল মানুুষটার এটুকু বুদ্ধি নেই যে বুদ্ধিতে পারবে অপরের মনে মনে হাসছে ।

অপরের, রমলা আর বাদল এসেছিল ওদের নিমন্ত্রণ করতে । অপরের বিয়ে করছে । সামনের বাইশ তারিখ । বড় ছেলের বিয়ে, তাই বড় মেয়েকে ক্ষমা করেছেন স্বাগতা । মেয়েজামাইকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছেন ওদের । রম্মকে আড়ালে নিয়ে এসে সব কথা শোনে শর্মিলা । মেয়েটির নাম সরমা ; —না, সোসাইটির মেয়ে নয়, শর্মিলা চিনতে পারবে না । তবে হ্যাঁ, পূর্বরাগের কিছুটা পাঠ নিতে হয়েছে অপরেরকে । সরমা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, তার বাবা অপরের একজন বন্ধুর হেড ক্লার্ক । ভালবেসেই বিয়ে করছে অপরের । স্বাগতার ঘোরতর আপত্তি ছিল প্রথমটায় ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত দিয়েছেন । রমলা বলে, ঠেকে শিখেছে মা, বুদ্ধিছে প্রেমের বন্যাকে বাঁধ দিয়ে রাখা যায় না । কার সাধ্য রোধে তার গতি ।

শর্মিলা হাসে ওর ভঙ্গিমায়ে ।

গম্পগম্ভবে বেশ মশগূল হয়ে ওঠে সবাই । শেষ পর্যন্ত শর্মিলা আনন্দকে আড়ালে ডাকে । নিম্নস্বরে বলে, ঐ আজ আসেনি । যাও, চট করে কিছু মিষ্টি নিয়ে এস মোড়ের দোকান থেকে ।

আনন্দ অবাক হয়ে বলে, কেন ? ওঁরাই তো একগাদা মিষ্টি নিয়ে এসেছেন । তাই থেকেই দাও না ।

চোখ ফেটে জল আসে শর্মিলার। ওর মনে পড়ে না এই মানুষটাই প্রথম আলাপে ওর হাওখানা টেনে নিয়ে বলেছিল, এই দেখুন আমার গায়েও কেমন রোমাঞ্চ হয়েছে! ওর মনে হল লোকটা রূপণ! হাড় কিপন! দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, যা বলছি শোন। ও মিষ্টি ওদের দেওয়া যায় না।

—কেন যায় না? এ তোমার রাধুময়রার চেয়ে হাজার গুণ ভাল মিষ্টি।

ঘরের ভিতর থেকে অপরেশ শুনতে পায় আনন্দের কথা। দোষ অপরেশের নয়, আনন্দ মোটেই নিম্নস্বরে বলেনি তার বক্তব্য। অপরেশ বোরিয়ে আসে বাইরে। বলে, কী পাগলামি করছিস শম্। এই ভরদুপুর বেলা আবার কেন মিষ্টি আনতে পাঠাচ্ছিস?

আনন্দ বলে, এখানে ভাল মিষ্টি পাওয়াও যায় না, দাদা। আর তা ছাড়া আপনিই তো নিজে এসেছেন এককাঁড়ি মিষ্টি!

যত যাই হোক অপরেশ এ যুক্তিতে সায় দিতে পারে না।

দাঁতে দাঁত চেপে শর্মিলা বলে, গাড়ি চাଲিয়ে এনেছে কে? মহেশ্বর?

অপরেশ বলে, না, আমি নিজেই। তুই বাপদু একটু চায়ের জল চাপা বরং।

শর্মিলা অধোমুখে ফিরে আসে রান্নাঘরে। জনতা স্টোভে বসিয়ে দেয় চায়ের জল। রমলা বলে, কী ঠিক করলি দাদি? যাবি তুই?

শর্মিলা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলে, কেন যাব না?

—ঐ ভোলা মহেশ্বরকে নিয়ে?

—কেন দক্ষযজ্ঞ হবে ভাবছিস?

—না, সে ভয় নেই। ঠুকে অপমান করবার ক্ষমতা কারও নেই।

হয়তো ভাল অর্থেই রম্ এ কথা বলেছিল। আনন্দের উদারতা, সরলতাটাকেই সে বড় করে দেখাতে চেয়েছিল হয়তো—কিন্তু শর্মিলার তা মনে হয়নি। শর্মিলার মনে হয়েছিল রম্‌র ও কথাটার ভিতরেও বাঁকা ইঙ্গিত আছে। যেমন ছিল অপরেশের কথায়।

গাড়িতে ওদের তুলে দিয়ে আনন্দ ফিরে এসে বললে, ভারি সুন্দর মানুষ কিন্তু অপরেশবাবু। কী সরল অন্তঃকরণ।

শর্মিলা বলে, সরল মানুষের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে যাবে না?

আনন্দের মনের মেঘ বোধ করি কেটে গিয়েছিল। বললে, কেন যাব না? বাড়ি এসে নিমন্ত্রণ করে গেলেন—

শর্মিলা বলে, না এলেও যেতে তুমি। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের পত্রটি মার্জনা করে নিতে না হয়।

আনন্দ তবু হেসে বলে, আমি লোকটা ভারি পেটুক, না?

সে হাসি দেখে জ্বলে উঠেছিল শর্মিলা। জবাবে বলেছিল, শুধু পেটুক

নয়, কৃপণ। একদিন বাজার খরচাটা তো বাঁচবে। পরের পরসায় পোলাও কালিয়া খেয়ে আসা মন্দ কি ?

একটু যেন স্নান হয়ে গেল আনন্দ। তবু মূখে হাসি ফুটিয়ে বলে, তা যা বলেছ।

আরও জ্বলে উঠে শর্মিলা বলে, তোমার লজ্জা করে না ?

এবার চোখ থেকে চশমাটা খুলতে হয় আনন্দকে।

—কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা হবার নয়। খরচ বাঁচবে না, বাড়বে।

আনন্দ শূন্য মুখে তুলে তাকায়।

—নিমস্তণ খেতে গেলে একটা উপহার নিয়ে যেতে হবে তো ?

—নিয়ে যাব না হয়।

কী নিয়ে যাবে ? মাটির ফুলদানি ? মাষ্টার-মশায়ের কাছ থেকে চেয়ে আনবে বুদ্ধি আর একটা ?

সরল হলেও আনন্দ মূর্খ নয়। গম্ভীর হয়ে যায় সে।

—ছি ছি ছি ! তুমি কী ! লজ্জা শরমের বালাই নেই তোমার ?

আনন্দ চশমাটা মুছতে মুছতে বলে, না হয় একখানা শাড়ি কি গহনা নিয়েই যাওয়া যাবে।

—আবার ধার করবে বুদ্ধি !

মুখটা নিচু করে আনন্দ বলে—সে হয়ে যাবে একরকম করে।

—সেই এক রকমটা কী রকম তাই তো জানতে চাইছি ! আমারই একখানা গহনা বেচে দেবে তো ?

এবার গলার স্বরটা বদলে যায় আনন্দের। বলে, না। আর যাই করি তোমার গহনায় আমি হাত দেব না। যে কথানা গহনা তোমার গায়ে আছে ওর একখানাও আমার দেওয়া নয়—

—ও ! মনে আছে দেখছি সে কথা।

আনন্দ ক্লান্ত স্বরে বলে, মনে আছে বইকি। ভুলবার ষে উপায় নেই শর্মিলা। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছি এ কথা কি ভুলতে পারি ?

শর্মিলা গর্জে উঠেছিল, দেখ ! তোমার সব সহ্য হয়, এই ন্যাকামিটা আমি সহিতে পারি না।

—ন্যাকামি !—প্রতিপ্রশ্ন করেছিল আনন্দ। তার জীবনের চরমতম লাঞ্ছিক, তার গভীরতম বেদনার এই নামকরণে কেমন যেন বিদ্রোহপুষ্টের মতো চমকে উঠেছিল সে।

—তা নয় তো কী ? এ কথা যেন বিয়ে করার পরেই জানতে পেরেছ তুমি ! কেন, বিয়ে করার আগে জানতে না কোন পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করছ তুমি ?

ক্রমগত চারদিক থেকে বাধা পেলে একটা নিরীহ খরগোশও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আনন্দও সোজা হয়ে বলে, এতদিন শূদ্ধ শব্দেই এসেছি শর্মিলা, আজ আমিও একটা প্রশ্ন করি। বিষয়ে করার আগে তুমি কি জানতে না কোন পরিবারের ছেলেকে বিষয়ে করতে যাচ্ছ তুমি?

শর্মিলাও উঠে দাঁড়ায়। বলে, এই যে, বোল ফুটেছে দেখছি। এইটাই বাকি ছিল। জবাবটা শব্দে যাও। না, তোমাকে আমি ঠিক চিনতে পারিনি। তিনটে মানুষের মূখের গ্রাস উপার্জনের ক্ষমতাও যে তোমার নেই। তা বন্ধে পারিনি। এম. এ তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েও কেউ যে তিনশো টাকার মাস্টারি—

বাধা দিয়ে আনন্দ বলেছিল, ব্যাস! চূপ—

—না। চূপ আমি, করব না। চূপ করেই তো ছিলাম এতদিন। আজ আমার যা বক্তব্য তা আমি বলে নিতে চাই। শোন। তুমি আমাকে মৃতি দাও। এ বাঁধন আর সহিতে পারছি না আমি।

সত্যি মৌদীন মনে হয়েছিল আনন্দ তাকে মৃতি দিলে শর্মিলা বেরিয়ে যেতে পারে এ সংসারের আবর্ত থেকে। যেখানে তার নারীত্ব পবিত্র অবহেলিত, সেখানে দৃ-মৃতি অম্মের লোভে সে পড়ে থাকতে পারবে না। সেও আই এ. পাশ করেছে। অনায়াসে কোন মফঃস্বল স্কুলে মাস্টারি নিয়ে একটা পেট চালিয়ে নিতে পারবে। একক শয্যায় শয়ন করেই যদি বাকি জীবনের নিরানন্দ রাগিণীলোকে অতিবাহিত করা অনিবার্য হয়ে পড়ে পড়ুক; কিন্তু এভাবে স্বামী সঙ্গের একই বাড়িতে একই ছাদের নিচে নয়। আজই সে একটা বোঝাপড়া করে নিতে চায়। বলে, বিশ্বাস কর তুমি, সত্যিই ভুল হয়েছিল আমার। ভুলের মাসুলও দিয়েছি আমি। এবার তুমি আমার মৃতি দাও।

আনন্দ বসে পড়ে। ক্লান্ত সৈনিকের মতো দেখাচ্ছে তাকে। ধীর সংঘত কণ্ঠে বলে বেশ। কথাটা যখন তুমিই মুখ ফুটে বলতে পারলে তখন আমার পক্ষে সহজ হল জিনিসটা। সত্যি শর্মিলা, এভাবে চলবে না। আমার লেখাপড়া সব চুলোয় যেতে বসেছে। আমি কোন কিছুতেই মন দিতে পারছি না। আর সত্যিই ষড়টা উপার্জন করতে পারলে তুমি সুখী হতে, ততটা উপার্জনও নয় আমার। ভুলটা যখন দুজনেই বন্ধে পেয়েছি তখন তা শূদ্ধরূপে হবে। মৃতিই দিলাম তোমাকে। তুমি বাপের বাড়িতে চলে যাও। আর ফিরে এস না।

মৃতি সত্যিই চেয়েছিল শর্মিলা; কিন্তু আনন্দের ভক্তিটায় আপাদমস্তক জ্বলে গেল তার। লোকটা মোটেই সরল নয়। বদমায়েশ একটা। সুবিধাবাদী, স্বার্থপর। শর্মিলার প্রতি তার কৌতূহল শেষ হয়েছে। পড়া-শেখ ডিটেকটিভ উপন্যাস যেন। একবারই পড়া বন্ধ তাকে রুদ্ধশ্বাসে—তারপর সেটাকে খোঁজ করে না কেউ। শর্মিলা বাপের বাড়ি থাকুক; আর এখানে আনন্দ আপন

মনে ইতিহাস চর্চা করুক। কেউ বাধা দেবে না, কেউ বিরক্ত করবে না। ব্যবস্থাটা ভাল। শর্মিলা দেখতে চায় লোকটার দৌড়। বলে, বেশ তো বলছ বাপের বাড়িতে চলে যাও আর ফিরে এস না। কিন্তু আমাকে তারা খাওয়াবে পরাবে কেন?

আনন্দ বলে, সেটাও ভেবে দেখেছি।

—দেখেছ? খুব দরদর্শী তো তুমি। কী দেখেছ শুননি?

—খোরপোশ দেবার সামর্থ্য আমার নেই—

আর একধাপ এগিয়ে যায় শর্মিলা। আবার দেবার জন্যই। বলে, ক্ষমতা নেই বললে তো আইন শুনবে না।

—শুনবে। আমি কথা দিচ্ছি, যে কোন অভিযোগ তুমি আনবে আমার বিরুদ্ধে আমি তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেব। পুরোপুরি মনুষ্টিই দেব তোমাকে। আইনত সিন্দ হবে এ বিচ্ছেদ। তোমাকে মনুষ্টি দিতে সব অভিযোগই মেনে নিতে আমি প্রস্তুত। অ্যাডালটারি, ইম্পোর্টেশন, ভেনি-রিয়াল ডিজিজ.....

শর্মিলা বসে পড়েছিল। শ্বশুর নয়, আপনা থেকেই। তার মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল বুঝি! এত ঘৃণা! এতই অসহ্য সে আজ আনন্দের কাছে। কাল রাতে, আনন্দ যে ডিভোর্সের কথা, তুলেছিল সেটা তাহলে ওর মন্থের কথা নয়—মনের কথা! মনুষ্টি বলতে শর্মিলা যা বুঝেছে আনন্দ তার চেয়ে আগে থেকেই এগিয়ে আছে এক পা! দরদর্শী অভিমানে ধরধর করে কেঁপে উঠেছিল শর্মিলা। উবুড় হয়ে পড়েছিল খাটের উপর। ফুলে ফুলে সে কাঁদতে থাকে। আনন্দ উঠে দাঁড়ায়। আলনা থেকে পাঞ্জাবিটা পেড়ে গায়ে চরাতে চরাতে বলে, গোরকে বলে আসছি, আজই সম্মুখায় সে তোমাকে পেঁচিয়ে দিয়ে আসবে—

—শোন।—উঠে বসে আবার শর্মিলা।

চৌকাঠের কাছে ফিরে দাঁড়ায় আনন্দ।

অনেক কণ্ঠে নিজেকে সামলে নিয়ে শর্মিলা বলে, ডিভোর্স পিটিশানটা বরং তুমিই কর না কেন?

—কেন?

—তুমিই তো চাইছ সেটা।

—না। একা আমি চাইছি না। আমরা দুজনেই চাইছি।

—আমি চাইছি তা তো বার্লিন আমি।

—মুখে না বললেও তো তোমার মন্থ দেখে বুঝতে পারছি আমি।

—মন্থ দেখে মনের কথা কবে থেকে বুঝছ তুমি?

আনন্দ জবাব দেয় না।

শর্মিলা বলে, কিন্তু এখন তো আমি যাব না।

—কেন?

—সামনে দাদার বিয়ে। এখন গেলে একটা উপহার তো নিয়ে যেতে হবে আমাকে। সে তো আবার তোমার ক্ষমতা কুলোবে না।

আনন্দ এ আঘাতটাও সহ্য করে নেয়। বলে, সে জন্য চিন্তা কর না, উপহারটা যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব আমি।

—মাটির ফুলদানি?

আনন্দ এবার আর জবাব দেয় না। বেরিয়ে যায় বাইরের দরজা দিয়ে।

প্রহরের পর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে যায় তারপর। আনন্দ ফিরে আসে না। ঘরের কাজকর্ম কিছুই সারা হয় না। চুপচাপ বসে থাকে শর্মিলা। কী করবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারে না। চিন্তার পারস্পর্যও যেন হারিয়ে ফেলেছে। এতদিনে বোঝা গেল ব্যাপারটা। আনন্দের মনের কোন কোণাতেও আর স্থান নেই শর্মিলার। আনন্দ শর্মিলাকে তার জীবন থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু এটা তো ঠিক চারুনি সে। আনন্দের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঠিক সত্যিই চুকিয়ে দিতে হবে? চিরকালের জন্য?

সন্ধ্যাবেলা এসে হাজির হল গৌর গৃহবিশ্বাস। আনন্দের প্রিয় ছাত্র। বলে, আপনাকে কি আজই কলকাতায় রেখে আসতে হবে?

শর্মিলা বলে, না, আজ নয়, কাল যাব আমি। তুমি কাল সকালে বরং একবার খোঁজ করে যেও।

গৌর স্বীকৃত হয়ে চলে যায়।

আশ্চর্য, আবার প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়। ঘান্নে আসে রাত্রি। আলো জেদেলে প্রতীক্ষা করে শর্মিলা। রাত বাড়ে। কিন্তু সমস্ত রাত আনন্দ বাড়ি ফেরে না। সারারাত জেগে বসে থাকল সে। আনন্দ রাত কাটালো কোথায়! পরদিন সকালেই এসে হাজির হল গৌর। বলে, এ বেলাতেই যাবেন তো? না খাওয়া-দাওয়া সেরে ও বেলায়?

শর্মিলা বলে, তোমার মাস্টার-মশাই কাল রাতে বাড়ি ফেরেননি।

—হ্যাঁ, তাই তো কথা ছিল। উনি দিন দশেক পরে ফিরবেন। ছুটি নিয়মেই তো গেছেন। কেন, আপনি জানেন না?

শর্মিলা তাড়াতাড়ি সামলে নেয়, ও হ্যাঁ, তাই তো!

—বাজার করতে হবে কিছু?

—না। আজ এ বেলাতেই যাব আমি। তুমি গাড়ি ডেকে আন!

গৌর একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর চলে যায় রিকশা ডেকে আনতে।

একবার ভেবেছিল একখানা চিঠি লিখে রেখে যাবে। তারপর মনে হল

কী দরকার ? সামনাসামনি বসে যে কথা বোঝানো যায়নি একথুন্ড চিঠিতে কি তা বোঝানো যাবে ? আধঘণ্টার মধ্যেই সন্ধ্যাকেস গুঁছিয়ে নিয়ে চিরদিনের মতো সে-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল শর্মিলা । গৌর বাড়িতে তালা দিয়ে চাবিটা পকেটে রাখে । বলে, স্যার এলে দিয়ে দেব ।

সে আজ এক বছর হয়ে গেল । তারপর অনেক জল বয়ে গেছে গঙ্গা দিয়ে । শব্দ গঙ্গা দিয়েই বা কেন ? শর্মিলার বৃদ্ধের উপত্যকা দিয়েও । অপরেরে বিয়েতে আনন্দ আসেনি । আসবে না জানাই ছিল, কিন্তু রতনদাদু এসেছিলেন নিমন্ত্রণ রাখতে । বছরমন্দুর থেকে খবর পেয়ে তিনি এসেছিলেন । আনন্দ তাঁকে ধরে বেঁধে পাঠিয়েছে বিয়েবাড়ি—কলকাতায় ।

স্বাগতা আহতা হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী । একটিমাত্র জামাই, তাকে অপরের নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছে । অথচ সে এল না । শর্মিলা অবশ্য জানতই আনন্দ আসবে না । রতনদাদুকে নিয়ে গিয়ে বসালো ওর ঘরে । রতনদাদু কোটের ভিতর পকেট থেকে বার করে আনেন একছড়া জড়োয়া মালা । তুলে দিলেন শর্মিলার হাতে, বলেন, আনন্দ' দিয়েছে তোমাকে দিতে ।

হাত বাড়িয়ে মালাটা নিতে হাতটা কেঁপে উঠেছিল শর্মিলার । বাড়ি ভর্তি লোকজন, তবু নিম্নকণ্ঠে বলেছিল, এর যে অনেক দাম, দাদু ! এ সে কোথায় পেল !

রতনদাদু চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, সে অনেক কথা দিদি । আর দামের কথা বলছ ? স্যাকরা নিয়েছে সাড়ে বারোশো টাকা ; কিন্তু ও মালটার দাম তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি ।

কথাটার শেষ দিকের ইঙ্গিতটাতে শর্মিলা গুরুত্ব দেখানি । প্রথমবারটাই তাকে একেবারে বহুতল করে দিয়েছিল, বলে, সাড়ে বারোশো টাকা ! এ সে পেল যেমন করে ?

রতনদাদু মাথা নেড়ে বলেন, সব কথা তো এখন বলতে পারব না দিদি । কিন্তু তুমি বিধে মিটে গেলেই ফেরে যেও । আনন্দের শরীর ভাল নয় ।

শরীর শর্মিলারও ভাল ছিল না । স্বাগতা ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তারের কাছে । সেখানে তাকে ধাক্কা খেতে হয়েছে । শর্মিলাকে অনেক আগেই নাক নিয়ে আসা উচিত ছিল ডাক্তারের কাছে । সে রক্তাস্পতায় ভুগছে । শর্মিলা সেসব প্রসঙ্গ তুলল না, বললে, কেন, কী হয়েছে তাঁর ?

রতনদাদু ঢোক গিলে থেমে যান । আনন্দকে তিনি শেষ দেখে এসেছেন হাসপাতালে । সেখানে তাকে কথা দিয়ে এসেছেন সব কথা এখানে বলবেন না । আনন্দ বারে বারে তাঁকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েছিল, বিয়ে বাড়িতে তার দৃষ্টিহীনতার কথা প্রকাশ করে দেবেন না । তবু সব কথা গোপনই বা করে

যান কেমন করে ? বলেন, না, বিশেষ কিছু নয় । তবু হাজার হোক সেটাই তো তোমার নিজের বাড়ি ।

শর্মিলার ঠোঁট দুটি কুঁচকে যায় । বলে, নিজের বাড়ি ! যার চাবি থাকে আপনার নাতির ছাত্রের পকেটে ?

রতনদাদু ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না, তবু তিনি কিছুটা আশ্বাস করেই এসেছিলেন । ওদের স্বামী-স্ত্রীতে যে একটা মনোমালিন্য চলছে তা অনুমান করেছেন তিনি । বলেন, রাগ করিস না দিদি, সেখানে শাকামই জুটুক আর উপবাসই করিস সেই তো তোর নিজের বাড়ি ।

শর্মিলার চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে । বলে, পরামর্শটা কি আপনার, না তিনিই বলে পাঠিয়েছেন আপনাকে দিয়ে ?

এবার স্পষ্টই আহত হয়েছিলেন বৃদ্ধ । অপ্রস্তুতও হয়েছিলেন । মনে হল, বড় লোকের মেয়ের কাছে এতটা প্রগল্ভ না হলেই পারতেন । সামলে নিয়ে বলেন, না, সে কিছু বলেনি । তাকে তো চিনি—মরে গেলেও সে তোমাকে বিরক্ত করবে না ।

শর্মিলা বলে, শাকাম আর উপবাসটা তো রইলই দাদু ত্বকের ভ্রূষণ হয়ে, আপাতত দুদিন ভাল মন্দ খেয়ে নিই বাপের বাড়িতে ।

রতনদাদু চূপ করে গেলেন ।

আজও ভাবে শর্মিলা—কেন সব কথা গোপন করে গিয়েছিলেন সেদিন রতনদাদু ! কেন খুলে বলেননি শর্মিলাকে যে আনন্দ হাসপাতালে পড়ে আছে তখন ? সে কি শর্মিলার ঐ কড়া কথাগুলোর জন্য অভিমানে, না কি আনন্দকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন বলে ? যথবা তিনি ভেবেছিলেন সংবাদটায় বিবাহ বাড়ির আনন্দ-উৎসবে একটা বিপর্যয় দেখা দেবে । কেন যে তিনি গোপন করেছিলেন তা আজও জানে না শর্মিলা । কোনদিনই আর জানা যাবে না । কিন্তু এটুকু জানে যে, সেদিন রতনদাদু অন্তত জানতেন আনন্দ চিরদিনের মতো দৃষ্টি খুইয়েছে । চোখের শিরা ছিঁড়ে গেছে তার । প্রাণে বেঁচেছে এই যথেষ্ট । হাসপাতাল থেকে সে ফিরে আসবে একদিন কিন্তু চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে দিলেও আর আনন্দ কোনদিন এই আলোয় ভরা দুনিয়ায় ফিরে আসবে না । তার বাকি জীবনটা অশ্বকারে ঢেকে গেছে চিরদিনের জন্য । রতনদাদু তখনও জানতেন না আনন্দের চোখ খোয়ানোর চেয়েও মর্মভেদ সংবাদটা । আনন্দ সে কথাটা বলেনি রতনদাদুকে । সে তার আত্ম-হত্যার কথা । আত্মহত্যা নয়, আত্মার হত্যা । অপরের নববধুর জন্য এই জড়োয়া হারটা কিনে দিতে সে হাজার টাকা খরচ করেছে । এত ভাল উপহার কেউই দেয়নি নববধুকে । শর্মিলা সবার উপরে টেকা দিয়েছে সেদিক থেকে । হারছড়া সে সকলকে দেখিয়েছে সগর্বে । উপহারের দামটা জিজ্ঞাসা করা

নাকি এটিকেটে বাধে। অথচ কৌতুহল প্রবল। অনেকেই কানে কানে প্রশ্নটা করেছে শর্মিলাকে। শর্মিলা হেসে কানে কানেই বলেছে - বলবেন না কাউকে সাড়ে আঠারো !

চোখ কপালে উঠেছে শ্রোতার। প্রতিপ্রশ্ন করেছে কেউ কেউ, তবে যে শুনেনিহিলাম, কলেজের অধ্যাপক ?

শর্মিলা হেসে বলেছে, ভুল শোনেননি, কিন্তু আমার শব্দশূন্য শুল-মাস্টারি করেননি। বহরমপুরে সামান্য কিছু জায়গা জমি কিনেছেন—

—বুঝেছি, বুঝেছি। তাই বুঝি কর্তার হাতে এতদিনে এসেছে জমিদারী কমপেনসেশনের টাকা !

শর্মিলা স্মিত হেসেছে। একটাও মিছে কথা না বলে স্বামীর সম্মান, মায়ের মর্যাদা রক্ষা করেছে। অথচ কিসের যেন গ্লানিতে ক্লান্ত অবসাদে মাঝে মাঝে ছুটে পালিয়ে গেছে নিজের ঘরে। বালিশে মদ্য গর্দজে রক্ত কামাটাকে গলা টিপে মেরেছে—হাতে বিয়ে বাড়ির কেউ না টের পায়।

বিয়ে মিটে গেল। বোভাতও মিটল। শ্বাগতা এসে জানতে চাইলেন আসল কারণটা। প্রেজেন্টেশনটা দেখেই তাঁর মত বদলে গেছে। মিসেস খান্ডেলওয়ালা, মেজর গুপ্ত, ব্যারিস্টার বোস, রক্তমঞ্জী, গোয়েন্দা সকলেই উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে গেছেন মালাছড়ার। বলেছিলেন, এবার একবার জামাই আনতে গাড়ি পাঠাই, কী বলিস ? রাগারাগি করে এসেছিস নাকি ? চিঠিপত্র দেয় তো ?

শর্মিলা খুলে বলেছিল সব কথা।

সব কথা নয়, আসল কথাটা সে তখনও জানতই না। জেনেছিল অনেক পরে, একেবারে ঘটনাচক্রে।

সেদিন কী জানি কেন ওরা মনটা ভাল ছিল না। হাতে কাজ ছিল না কোন, পুরানো কাগজপত্র ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ বের হয়ে পড়ল ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কার্ডখানা। মনটা কেমন করে ওঠে। শর্মিলা চলে এসেছিল সেই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। ভেবেছিল কাটিয়ে আসবে একটা অলস সন্ধ্যা, সেই স্মৃতিবিজড়িত রেইন্স্ট্রি গাছের তলায়। সেখানেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল গৌরের সঙ্গে। একটা বই হাতে সে বেরিয়ে আসছে লাইব্রেরির চওড়া সিঁড়ি দিয়ে। ওকে দেখেই শর্মিলা খুশী হয়ে ওঠে। এগিয়ে যার ওর কাছে। গৌর আনন্দের প্রিয় ছাত্র। প্রায়ই আসত আনন্দের কাছে পড়শুন্যার কাজে। শর্মিলার সঙ্গেও তার একটা সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। উমার সঙ্গেও। শর্মিলাকে সে দাঁদি বলে ডাকত। অথচ সে সেদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে শর্মিলাকে দেখেও দেখতে না পাওয়ার ভান করে।

কিন্তু শর্মিলা ওকে এড়িয়ে যেতে দেয় না, এগিয়ে এসে বলে, দিদিকে চিনতেই পারছ না নাকি ?

গৌর দু'টি হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করে জবাব দেয়, না ।

— পাশ করেছে তো ? অনাস' পেয়েছিলে ?

গৌর মধুখটা নিচু করেই বলে, পেয়েছিলাম ।

— কোন ক্লাস ?

— সেকেন্ড ।

— খাওয়া-পাওয়া হয়েছে তাহলে বল ?

গৌর জবাব দেয় না । শর্মিলা একটু অবাক হয় ; বলে, এম. এ পড়ছ তো ? কোথায় আছ ?

আমি এবার যাই ।

শর্মিলা শুধু আহত নয়, অপমানিত বোধ করে । এ ছেলের অনেক স্নেহের অত্যাচার তাকে একদিন সহ্য করতে হয়েছে । অনেক আশ্রয় সইতে হয়েছে । ওর নিরাসক্ত উদাসীনতায় তাই শর্মিলা আহত হয় । বলে কোথায় যাচ্ছ ? তাড়াতাড়ি আছে বুঝি ?

— না, তাড়াতাড়ি কিসের ?

— তবে ?

— কী তবে ?

— কিছু না, যাও ।

গৌর চলতে থাকে দ্বিতীয়বার ওর দিকে না তাকিয়ে । কেমন যেন আপাদ-মস্তক জ্বালা করে ওঠে শর্মিলার । বলে, শোন ।

ছেলেটি ঘুরে দাঁড়ায় ।

শর্মিলা বলে, এখন তোমাদের যে অধ্যাপক পড়ান, তাঁর স্ত্রীর ফুলদানির জন্যও তুমি ফুল নিয়ে যাও ?

মধু-চোখ লাল হয়ে ওঠে গৌরের । হৃদয়লীল বাসায় শর্মিলার মাটির ফুলদানিতে সে বহুবার ফুলের যোগান দিয়েছে । দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বলে, কথা আমি বলতে চাইনি ; আপনি বললে আমার চেয়ে বড়, সম্পর্কেও । কিন্তু আপনি জোর করে আমাকে দিয়ে বলালেন । তাই বলছি, আপনার সঙ্গে কথা বলতে আজ আমার ঘৃণা হচ্ছে ।

বজ্রাহতের মতো কয়েকটা মধুহৃত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শর্মিলা । তারপর হঠাৎ কিসের একটা আশঙ্কায় সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল । ঠিক কী মনে হয়েছিল, আজ আর মনে পড়ে না । হঠাৎ গৌরের হাত দু'টি ধরে বলেছিল, কেন গৌর ? কী হয়েছে ? এত ঘৃণা কেন ?

গৌরও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় । বলে, সে কি ? আপনি কি জানেন না ?

—কী জানি না ?

—মাস্টার-মশায়ের কথা ?

—মাস্টার-মশায়ের কথা ! কী কথা ? কেন কী হয়েছে তাঁর ?

গৌর বন্ধুতে পারে শর্মিলা কিছুই জানে না। লজ্জা পায় সে। দুজনে গিয়ে বসে সেই রেইন্স্ট গাছের তলায়। ধীরে ধীরে সব কথা গৌর খুলে বলে। তার চলে আসার পরের কথা। যেটুকু সে জানে, শুধু সেইটুকুই। কিন্তু যে কথা সে বলল না তাও যে বন্ধুতে পারল শর্মিলা। দুঃখে বেদনায় সে একেবারে নীল হয়ে গেল। সেখানেই প্রথম সে জানল আনন্দ দৃষ্টিহীন। শুধু তাই নয়, আনন্দ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এ আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা নয়, আত্মার হত্যা। যে হারছড়া সে সগবে' দেখিয়েছে জনে জনে সেই হারছড়ার মূল্য মাত্র হাজার টাকা নয়, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। শর্মিলাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে ঐ হারটা কিনতে গিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিল গৌরের মাস্টারমশাই। ঐ হারটির বিনিময়ে তাকে লিখে দিতে হয়েছিল ষাটশটি জাগর রাত্রির যন্ত্রণায় ইতিহাসের একটি প্রমোক্তরের বই—যার লেখক হিসাবে নাম ছাপা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপকের।

গৌর এ কাহিনীর উপসংহারে বলেছিল, আর সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কি জানেন দিদি ? ঐ নোটবইটা দেখলেই আমার কান্না পায়—অথচ ঐ বইটা পড়েই এই পরীক্ষাই পাশ করেছি আমি। আমি আজও ভেবে পাই না—কেন এমন ছোট কাজটা করলেন মাস্টার-মশাই ! এই সব নোটবইয়ের উপর তাঁর আন্তরিক ঘৃণার কথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। তিনি নিজেই শেষ পর্বন্ত তাই লিখলেন ? তাও আবার বেনামে ? হিঃ।

*

*

*

—মাইজি ! এ মাইজি !

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে শর্মিলা ! এ সে কোথায় ?

—ঘর যাইব না ? রাত তো বহুত ভেল !

হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে চমকে ওঠে শর্মিলা। রাত সওয়া এগারোটা। গড়ের মাঠে সেনোটারফের সামনে বসে আছে সে ! ঘুমোচ্ছিল নাকি এতক্ষণ ? পাহারাওয়ালারা তাকে ডেকে দিতে এসেছে। এ নির্জন স্থানে এমন একজন তরুণীর একা বসে থাকাটা সে ভাল চোখে দেখেনি। আশ্চর্য, রেড রোডের ধারে এই নির্জন স্থানে ঘণ্টা-তিনেক সে চুপচাপ বসে আছে ! পদূলিগটা তাকে ডেকে না দিলে সে কি সারারাত্রিই ওখানে পড়ে থাকত নাকি রাত্রিচারিণী মদালসার মতো ? আর কালকের কাগজে একটি চাপুল্যকর দৃষ্টান্তের বিজ্ঞাপিতর সঙ্গে শেষ হয়ে যেত একটি জীবন। লুপ্ত হয়ে যেত একটি সমস্যা-কণ্টাকিত মেয়ের দীর্ঘস্বাস।

ট্যান্ডিটা বখন এসে দাঁড়ালো পরিচিত পোর্টিকোর নিচে তখন বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন স্বগতা আর অপরেশ। পরস্পর চুপিয়ে দিয়ে শর্মিলা আর মদুখ তুলে তাকাননি। তাকালে দেখতে পেত অপরের পেরেছে দেখা যাবে রম্মুর উঁকি দেওয়া মদুখানা—ঘিতলের জানালায় আলো-না জ্বালা ঘরে দাঁড়িয়ে সরমা।

ভেবেছিল একটা হৈচৈ হবে, কিন্তু কেউ কিছ্ বলল না ওকে। এমন অস্বাভাবিক রাত করে সে একা কখনও ফেরে না। নাইট শোতে সিনেমা বা থিয়েটার দেখে এর চেয়েও বেশী রাত্রে ফিরেছে সে, কিন্তু কখনও একা নয়, দল বেঁধে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এভাবে খবর না দিয়ে নয়।

শর্মিলা সহজ হবার জন্যে বলে—বড্ড রাত হলে গেছে আজ। তোমরা সবাই খেয়ে নিয়েছ তো?

স্বাগতা বলেন—বাইরে ডিনারের নিমন্ত্রণ থাকলে বাড়িতে বলে যাবারও দরকার মনে কর না?

—ডিনারের নিমন্ত্রণ! মানে?

স্বাগতাও চমকে উঠে বলেন—তার মানে? কোথায় খেয়েছিস তুই তাহলে? গ্র্যান্ডে?

শর্মিলা জবাব দেবে কি, রীতিমত বোকা বনে যায়।

অপরেশ বলে—এই মাঝরাতে ও প্রসঙ্গ আর কেন মা? শূতে যাও, কাল বরং শোনো যাবে।

স্বাগতা বললেন হ্যাঁ, একটা রাতের মধ্যে যা হোক কৈফিয়ত একটা খাড়া করতে পারে ও, তাই না! তোরা সবাই সমান।

শর্মিলার দু দৃষ্টো কঁচকে যায়। সে বলে—কৈফিয়ত! কিসের কৈফিয়ত?

—এই তোমার মাঝরাতে বাড়ি ফেরার! গর্জে ওঠেন স্বাগতা!

শর্মিলার কান দুটো জ্বালা করে ওঠে। কচি খুঁকি সে নয়। ভালমন্দ বদ্ব্যবহার জ্ঞান তার হয়েছে। বলে—কী বলছ মা?

স্বাগতা জবাব দেবার আগেই রমলা এগিয়ে আসে। বাধা দিয়ে বলে—আঃ, কী হচ্ছে দিদি। আয়, ঘরে আয়। সত্যিই খেয়ে এসেছিস, না খাবি কিছ্?

স্বাগতা তবু কিছ্ বলতে যান। রমলাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে—মাঝরাতে আর নাটক কর না মা। চাকর ঠাকুররা এবার উঠে পড়বে।

স্বাগতা অশ্রুতে শূধু বলেন—নাটক!

শম্মুর হাত ধরে রমলা তাকে টানতে টানতে নিয়ে আসে ওপরের ঘরে। বলে—নে কাপড় ছাড়, মদুখ হাতে জল দে।

শ্বাগতুর মত দাঁড়িয়ে থাকে শর্মিলা। কিন্তু রম্মু আর এতটুকু মেলে নয়। সে এগিয়ে এসে তার হাত দুটি ধরে বলে—তুই কেন অবদ্ব্য হাঁচ্ছিস বল তো দিদি।

মায়ের দিকটাও ভেবে দেখ। সারাটা দুপুর ঘরে ভালমন্দ পাঁচ পদ রাখালেন ঠাকুরকে দিয়ে। কী, না বিকাশদা খাবে। তারপর তুই তাকে আনতে গেলি, মাঝরাতে ফিরে এলি একা।

—কিন্তু সে না এলে আমি কী করব ?

—কী করবি তাও কি বলে দিতে হবে ? হয় বাড়িতে এসে খবর দিবি, নয় গ্র্যান্ড হোটেল থেকেই একটা ফোন করবি।

শর্মিলা চুপ করে থাকে। কথাটা রম্ম অন্যান্য বলেনি। তারই দোষ।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে রম্মলা আবার বলে—রাত দশটা পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে নানান জাতের দুর্ভাবনায় ডুবে ছিলাম। দাদা এয়ার ইন্ডিয়ান ফোন করে জানাল প্লেন নিরাপদে পৌঁছেছে। তোর অফিসে ফোন করে শোনা গেল বেলা তিনটের সময় তুই বেরিয়েছিস। ব্যাস, আর কোন খবর নেই। প্রায় সাড়ে-দশটার সময় বিকাশদা ফোন করে জানালেন যে, তিনি গ্র্যান্ডে উঠেছেন আর তুই কোন বাস্তববীর বাড়িতে গেছিস, কার বন্ধি জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে।

রম্ম বলল - কার জন্মদিন রে দিদি ?

—তুই চিনবি না। বলে শর্মিলা তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ে বাথরুমে।

বাতি নিবিয়ে শূন্যে পড়ার পর অশ্বকার ঘরে আবার সেই পুরনো প্রসঙ্গটা তুলল রম্মলা, বললে—দিদি, ঘুমোয় ?

—না ঘুমোই নি, কেন রে ?

—আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারিস না ?

—কী কথা ?

—সব কথা। এই তুই এখন কী ভাবছিস, বিকাশদার সঙ্গে কী কথা হল, কেন সে হোটেলে উঠল ?

শর্মিলা গুরুত্বের সঙ্গে মনস্থির করে ফেলে। একজনের কাছে বৃদ্ধের বোঝা নামিয়ে দিতে পারলে মানুষ শান্তি পায়। মানুষ সহানুভূতির কাণ্ডাল। আনন্দের সব কথাও একদিন রম্মলাকে খুলে বলেছিল। শূন্য বলতে পারেনি, যা বলা যায় না, আনন্দ অশ্ব হয়ে গেল কেন ? মনে আছে, এমনি আর একটি আলো-নেভা রাস্তার অশ্বকারে মন উজাড় করে দিয়েছিল রম্মর কাছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে। সেদিনও রুদ্ধ কান্নায় বৃদ্ধের ভেতরটা পাষণ হয়ে উঠেছিল। সেদিনও সে সহানুভূতির কাণ্ডাল হয়ে পড়েছিল। বিধাতার দেওয়া প্রথম আশীর্বাদটিকে সে বৃদ্ধকে পায়নি। সেই বাগ্মত মাতৃস্তের বেদনায় সেবার কথা বলতে পেরেছিল রম্মলাকে। সব শূন্যে রম্মলা বলেছিল—কিন্তু কিসের আকর্ষণে আনন্দদা ছুটে গেল অমন করে বই লিখতে ?

শর্মিলা জবাব দেয়নি। মনে মনে বলেছিল—আকর্ষণে নয় রেমু, বিকর্ষণে; আর সেইটাই তো আমার ট্রাজেডি।

স্বাগতা কিন্তু খুশী হয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে ছেলে কোলে ফিরে এলেই বরং বিব্রত হতেন তিনি। ছেলে! হ্যাঁ ছেলেই তো হয়েছিল ওর। সাড়ে সাত পাউন্ড ওজন ছাড়া আর কিছু জানে না সে তার ছেলের কথা। চোখেও দেখতে দেয়নি ওকে। এ কী ওর কম দঃখ! আচ্ছা, আনন্দ কি জানে? উমার কাছে সে নিশ্চয় শুনছে কিছুটা। তার পরের খবরটা জানবার আর তার কৌতূহল নেই! এতই পর হয়ে গেছে সে?

স্বাগতা কিন্তু দুঃখিত হননি এক তিলও। তাঁর মনে হয়েছিল শমু রক্ষা পেয়েছে বন্ধনের হাত থেকে। ভগবান রক্ষা করেছেন। বলেও ফেলোছিলেন সে কথা। এবং সে কথা শুনেনি প্রচন্ড ঘৃণায় মুখ বার্কলোছিল শর্মিলা। স্বাগতা নিশ্চয় ভেবোছিলেন, দ্বিতীয়বার বিবাহ করার সময় ঐ একফোটা সন্তাটাই হয়ে পড়ত প্রচন্ড বাধা। কিন্তু শর্মিলা তো সে কথা ভাবেনি। দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা তখন তার দূরতম স্বপ্নেও ছিল না। তখনও ওর বাঁগত মাতৃষ্ণ—

- বলবি সব কথা আমার?—আবার তাগাদা দেয় রমু।

শর্মিলা মন স্থির করে ফেলে। হ্যাঁ, বলবে, সব কথাই সে খুলে বলবে রমলাকে। মনটা হালকা করার জন্য নয়, সে রমুর মধ্যে একজন সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষণীর সম্ভাবনা পেয়েছে। রমু আর ছেলেমানুষ নয়। সে যেন শমুরই দ্বিতীয় সন্তা। পাঁচ বছর আগেকার শমু। সে ওর কাছে এখন সাহায্য চায়, সহানুভূতি চায়, পরামর্শ চায়।

অশ্ধকার ঘরের এই এক সর্বাধা। মনের কথা যদি কাউকে খুলে বলতে চাও, অন্তরের অন্তরতম বেদনাকে রূপ দিতে চাও, তাহলে নির্বিঘ্নে দাও ঘরের বাতি। মনের কথা কারও মুখের দিকে চেয়ে বলা যায় না, চোখে নিষ্কৃতি দাও, চক্ষুলাজ্ঞাও চোখ বৃজবে তাহলে। একটি একটি করে সব কথাই খুলে বলল শর্মিলা। সব শুনেন রমলা বলে—কিন্তু বিকাশদাকে নিয়ে তুই কি সুখী হতে পারবি?

শর্মিলা প্রতিপ্রশ্ন করে—তোর কি মনে হয়?

—আমার? অশ্ধকারের মধ্যেই শোনা যায় রমুর কণ্ঠস্বর—আমার তো মনে হয়, না। না আনন্দদা, না বিকাশদা কেউই সুখী করতে পারবে না তোকে।

কেন?

—একজন অত্যন্ত আইডিয়ারলিস্টিক, একজন অত্যন্ত প্র্যাগম্যাটিক। একজন 'উদার', একজন 'তার'। তোর স্কেলে ওরা কেউই গাইতে পারবে না।

এত দঃখেও হাসি পায় শমুর। কী কথা বলার ঢং! হেসে শর্মিলা বলে—তাহলে তুই কি বলিস? এই বড়ো বয়সে মদ্যদার খুঁজে

বেড়াই পথেঘাটে ?

রম্ভ গম্ভীর হয়ে বলে—তুই হাসছিস, আমি কিন্তু সিরিয়াস।

শর্মিলা কোনক্রমে হাসি চেপে বলে—তাহলে আমি কী করব ?

—বিকাশদাকে ছেড়ে দিবি।

—বেচারি কাদবে যে ?

—কাদবে না। আমিই তো আছি। আমি ওকে নিয়ে ইলোপ করব।

তুই পারবি না। আমার পাল্লায় পড়লেই ওর চালিগাতি শেষ হবে।

শম্ভু হেসে বলে—তা হবে ; কিন্তু আমার কি হবে ?

—তুই বহরমপুরেই ফিরে যা।

—অশ্ব মাষ্টারের স্বপ্নে ?

রম্ভ জবাব দেয় না।

—কি হল, কথা বলছিস না যে ?

—আমার একটা প্রশ্নের সত্যি জবাব দিবি ?

—বলেই দেখ না।

আনন্দদার সঙ্গে তোর মূল বিরোধটা কিসের ?

—কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে পান্ডা ভাত...

ওকে বাধা দিয়ে রম্ভা আবার বলে—প্রীস দিদি। আজকে আমার সব কথা এভাবে উড়িয়ে দিস নে। আনন্দদার সংসার যে সচ্ছল নয় তা তুই বিয়ে করার আগেই জানতিস। তুই আমার মতো সেন্সিটিভেস্টাল খামখেয়ালী নস। সব দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে তবেই তাকে বিয়ে করেছিলি। আনন্দদার উপার্জনের স্বপ্নতা যে কারণ নয় তা আমি জানি। আসল কারণটা যদি না বলতে চাস, বলিস না। কিন্তু বাজে ব্রাফ দেবার চেষ্টাও করিস না।

—কিন্তু ও যে অশ্ব হয়ে গেছে এটা তো...

আবার ওকে বাধা দিয়ে রম্ভ বলে ওঠে—তাই তো জানতে চাইছি আমি। কিন্তু আনন্দদার যখন চোখ ভাল ছিল তখনই তো তুই চলে এসেছিলি।

এবার জবাব দেয় না শর্মিলা।

রম্ভা আবার বলে—আচ্ছা, আর একটা কথাব জবাব দে। ধর, যদি আজ খবর পাস আনন্দদা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, তাহলে তুই কী করবি ?

শর্মিলা বলে—এমন অ্যাবসার্ড হাইপোথিসিসের কী জবাব দেব ?

—তবু দে না।

একটু ভেবে নিয়ে শর্মিলা বলে—তাহলে আবার ফিরে যাই বহরমপুরে।

—সত্যি বলছিস ?

—সত্যিই বলছি রে। শম্ভু, তাই কেন, যদি সে দৃষ্টি ফিরে নাও পেয়ে থাকে, যদি জানতে পারি সে আমাকে আজও—

হঠাৎ চুপ করে যায় আবার ।

—খামলি কেন ?—রমু তাগাদা দেয় ।

—সেসব ভেবে আর কী হবে ?

কথাটা তার শেষ হয় না । পট করে বেড সুইচ জেরলে নেয় বমলা ।

—ও কি হল ?

রমলা উঠে বসে । বলে, তাহলে এই চিঠিখানা পড় ।

চিঠি ! কার চিঠি ? উঠে বসে শর্মিলাও ।

বাণিশের তলা থেকে একখানা খাম বার করে রমলা বলে—তোরই চিঠি । সেই কালকের চিঠিখানাই । উদ্ধার করেছি দাদার জামা কাপড় ডাইংক্রিনিং-এ পাঠাতে গিয়ে ।

খোলা খামখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে শর্মিলা বলে তার মানে ?

তার মানে চিঠিখানা ঠোঁট নষ্ট করেননি । শূন্য তাই নয় । ওটার কনটেন্টস ঠোঁট এখনও জ্ঞানেন না । দাদার পকেট থেকে মুখবন্দ খামটাই পেয়েছি আমি ।

শর্মিলা খামটা তুলে দেখায় । সেটা খোলা ।

—ওটা আমিই খুলেছি । রাগ করলি ?

শর্মিলা জবাব দেয় না । খাম থেকে কাগজখানা বার করে এক নিঃশ্বাসে পড়তে থাকে । চিঠি লিখেছে আনন্দ নয়, উমা । পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় রমু । উমা লিখেছে :

বৌদি,

এর আগেও তোমাকে খানচারেক চিঠি লিখেছি । তুমি জবাব দাওনি । জানি না, সেগুঁলি তোমার হাতে পৌঁছেছে কিনা । জানি না, তুমি সেগুঁলি পড়েছ কিনা । তবু আজ তোমাকে লিখছি । অনেক কথা বলার ছিল, বলতে গিয়েছিলুমও একদিন—তোমার মা দরজার বাইরে থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন । সে তো তুমি জানই ।

তোমাকে আমি ঘৃণা করি । আন্তরিক ঘৃণা । তোমাকে চিঠি লিখবার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না । লিখতে হচ্ছে দাদার নির্দেশে । তিনি জ্ঞানতে পেরেছেন তুমি আবার বিয়ে করছ এবং তার আগে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করছ । অত্যন্ত দুঃখের কথা, দাদা ক্রমশ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছেন । ভাস্করবাবুরা বলেন, হয়তো কয়েক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরে পাবেন তিনি । তাই আমাকে তিনি বলেছেন তোমাকে চিঠি লিখে জানাতে, তুমি যেন দাদার অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ডিভোর্সের আবেদন পত্র পেশ কর না । কারণ তাহলে সে অনর্মতি পেতে মর্শকিল হবে তোমার । তোমার মতো দাদাও মর্শকিল চায় । তাই ছোট বোন হয়ে লিখতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে তবু দাদার নির্দেশে লিখছি—তুমি আবেদন পত্রে লিখ দাদা পিতা হবার উপযুক্ত নন !

দাদা সে অভিযোগ স্বীকার করে নেবেন।

আমার চিঠিখানা পড়েই পড়িয়ে ফেল। আর কাউকে দেখিও না। কোর্টে এ চিঠি পৌঁছালে বা এর কোন সাক্ষী থাকলে হয়তো ডিভোর্স পেতে অসুবিধা হবে তোমার। সম্পর্কে তুমি আজও বড়; তাই পরশেষে প্রণাম জানালুম। ইতি উমা।

চিঠি পড়া শেষ করে চুপ করে বসে থাকে শর্মিলা।

রমলা বলে—আশ্চর্য মানুষ কিন্তু আনন্দদা। যেন মানুষ নয়, আগাথা ক্রিস্টের একটা চরিত্র!

শম্ভু ওর কথায় কান দেয়নি। সে ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছে। বলে—এ চিঠির কথা আর কে জানে? আর কেউ পড়েছে?

—না।

দাঁতে দাঁত চেপে শম্ভু বলে—রম্ভু, তোকে খুঁলেই বলছি। সেবার তোকে না বলে বাড়ি থেকে পাঠিয়েছিলুম। তখন তুই ছোট। আজ আর তুই ছোট নস। কাল সকালে আবার আমি বেরিয়ে যাব। আর ফিরব না। তুই মা-দাদাকে—

বাধা দিয়ে বলে—সেরিক রে! বহরমপুর যাবি?

—যাব না? বলিস কি?

—জড়িয়ে পড়বি না তো? ভাল করে সব দিক ভেবে দেখেছিস তো?

—দেখেছি রে দেখেছি। আমাকে মুক্তি দিতে যে মানুষটা এতবড় বোঝা মাথায় তুলে নিতে পারে—

রমলা অবাক হয়ে বলে—কী বললি?

—বলছি যে, আমাকে মুক্তি দিতে যে লোকটা এত বড় কলঙ্কের বোঝা—

আবার ওকে বাধা দিয়ে রমলা বলে—তুই একটা গাড়োল। স্রেফ ইন্ডিয়ট!

বোকার মত তাকিয়ে থাকে শর্মিলা। বলে—মানে?

—তুই ভেবেছিস, তোকে মুক্তি দেবার জন্য ঐ কথা লিখেছে আনন্দদা?

—না তো কি?

তার মত মূখ্য দেখিনি! এ শব্দ একটা ফাঁদ পেতেছে আনন্দদা। আর তুই সেই ফাঁদে পা দিচ্ছিস।

তার মানে?

—তার মানে? ধর তুই ঐ ভাবে দরখাস্ত করলি। ধর, আমি বিবাদী পক্ষের উকিল। তোকে জেরা করছি—‘আপনি কি অমূলক নার্সিং হোমে এত তারিখে ভর্তি হয়েছিলেন?’ কী বলবি তুই?

শম্ভু চুপ করে বসে থাকে।

—নাচারালি তুই বলবি—‘হ্যাঁ’। কারণ সেটা ফ্যাক্ট। তারপর আমি

প্রশ্ন করব—‘সেখানে আপনার একটি মৃত সন্তান হয়েছিল?’ তুই এবারে কী বলবি? হসপিটাল রেকর্ডকে করোবরেট করা ছাড়া তোর উপায় নেই। আমার তৃতীয় প্রশ্নের জবাব দে এবার—সেই সন্তানের পিতা কে?’

শর্মিলা এবারও জবাব দেয় না।

রমলা হো হো করে হেসে উঠে বলে—তোকে মর্ন্ত্তি দেবার জন্য সরল আত্মভোলা অধ্যাপক মশাই কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে নিচ্ছেন, না রে? ভাল মানদ্বয়ের প্রেমে পড়েছিলি দিদি! ঐ তো বললুম, আগাথা ক্রিস্টির নভেলেই ঐ সরল অধ্যাপক মশাইটিকে ভাল মানায়।

আলো নিভিয়ে দেয় রমলা।

শর্মিলার মাথার মধ্যে তখন বিম্বিক্স করছে।

বহরমপুর স্টেশনে এসে ট্রেনটা যখন পৌঁছালো তখন বেলা দ্বিপ্রহর। প্রচণ্ড কুখা পেয়েছে তখন শর্মিলার। কাল রাতে খাওয়া হয়নি। আজ সকালে সকলে জেগে ওঠার আগে নিঃশেষ বেরিয়ে এসেছিল সে। একবস্ত্রে। যেমন ভাবে আর একবার বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি ছেড়ে। সকাল আটটার লালগোলা ধরে রওনা দিয়েছে। এখন বেলা দেড়টা। খিদে পাওয়া আর অন্যান্য কি!

বহরমপুরে একবার মাত্র এসেছিল। পুজোর ছুটিতে। হুগলী থেকে আনন্দের সঙ্গে। এখানেই আনন্দের পৈতৃক ভিটে। চোখ এবং চাকরি খুইয়ে এখানেই আজ বছরখানেক এসে আছে ওরা ভাই বোন। পথটা মনে আছে। ঠিকানা তো জানাই। স্টেশন থেকে একখানা রিক্সা নিল শর্মিলা।

আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে রিক্সা চলেছে। শর্মিলা আবার আপন মনে ভাবতে থাকে। চিন্তার পারম্পর্য হারিয়ে যাচ্ছে তার। কেন সে এল এভাবে? ঠিক বলতে পারে না। রমলা নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে। শর্মিলা নিজেই কি কম অবাক হয়েছে নিজের আচরণে। কিন্তু তবু আত্মসংবরণ করতে পারেনি। সে একবার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় আনন্দের। আর কোনও দুর্বলতা নেই তার মনে। কোন মোহ নেই। সে সরাসরি কৈফিয়ত তলব করতে চায় ঐ লোকটার। কেন সে এমন চিঠি লিখেছে উমাকে দিয়ে? সে বারে বারে বলেছিল সে মর্ন্ত্তি চায়, মর্ন্ত্তি দিতে চায়। বলেছিল—যে কোন অভিযোগ তুমি আন, আমি মেনে নেব তা—অ্যাডালটারি, ইম্পোটেন্সি, ভের্নিরিয়াল ডিজিজ! তাহলে এভাবে শর্মিলাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা কেন? কী ক্রুর অভিসন্ধি! তাই বারে বারে বলেছে, চিঠিখানা, কাউকে না দেখাতে, কোন সাক্ষী না রাখতে—তাই বলেছে চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলতে। বাতে পশ্চাদপসরণের কোন পথ না থাকে শর্মিলার। বিবাদীপক্ষের উকিল যখন প্রশ্ন করবে—আপনার স্বামী যদি পিতা হবার অনুপস্থিত তাহলে আপনার মৃত সন্তানের জনক কে? তখন

আদালতশুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে উঠবে। বিচারক তাঁর হাতুড়ি দিয়ে টেবিলটা ঠুকে বলে উঠবেন—অডার! অডার! শর্মিলার চোখের সম্মুখে তখন দুলতে থাকবে আদালত কক্ষটা। বিবাদী পক্ষের উকিল হাস্য গোপন করে বলবেন—ধর্মাবতার! আশার জেরা শেষ হয়েছে।

সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে আসতে হবে শর্মিলাকে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা নামঞ্জুর।

কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। আবার তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে ঐ আদালতেই। এবার আর বাদী নয়, বিবাদী সে। এবার তাকে উঠতে হবে আসামীর মঞ্চে। এবার মামলা এনেছেন অধ্যাপক আনন্দ মিত্র, শ্রী বীরব্রজ। ঐ একই মামলা। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। অভিযোগ—শ্রী চরিত্রহীনা। প্রমাণ? আসামীর পূর্বমামলার সাক্ষীর নথী।

শর্মিলাকে দ্বিতীয় বার ঐ একই প্রশ্ন করা হবে দ্বিতীয় মামলায়।

এবারও কোন জবাব দিতে পারবে না সে।

এবার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা মঞ্জুর করবেন বিচারক।

কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে শর্মিলার। আনন্দ এতবড় পাষাণ্ড! আনন্দ ওকে যে এভাবে সর্বসমক্ষে অপমান করতে উদ্যত হবে এ ছিল শর্মিলার দৃঃস্বপ্নেরও অগোচর! তাই সে ছুটে এসেছে বহরমপুরে। মূখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে চায় আনন্দকে। আনন্দ জবাব দিতে পারবে না। আর সেই নির্বাক মানবটার গালে একটি চড় কষিয়ে দিয়ে শর্মিলা ফিরে আসবে পরের ট্রেনে।

—এই বাড়িই তো? না কি দিদি?

রিক্সাওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়েছে ঠিকই। ভাড়া মিটিয়ে শর্মিলা রিক্সা থেকে নেমে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, এই বাড়িই। প'ড় বাড়ির সামনে কচু আর কালকাসুন্দ্রির জঙ্গল। ইট বার করা ভাঙা প্রাচীরে ঘরটের নক্সা। পথে লোকজন নেই। কার্নিসের আবছায়ায় একজোড়া পায়রা আশয় নিয়েছে। তাদের বক্বকম্ব শব্দ শোনা যাচ্ছে স্তব্ধ মধ্যাহ্নে। বাইরের রোয়াকটা ছাগলের নাদিতে ভরা। আলগোছে সেগুনি ডিঙিয়ে বাইরের ঘরে ঢোকে শর্মিলা। বাড়ির এই অংশটা আনন্দের ভাগে পড়েছে। বাইরের একখানা ঘর, আর সিঁড়ি দিয়ে উঠে দ্বিতলের ঘরখানা। পাশের ঘরটায় থাকেন রতনদাদু। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ে চৌকির ওপর একখানা ছেঁড়া মাদুর, তার ওপর একটা জড়ানো হোল্ডঅল আর সুটকেস। আনন্দ কি কোথাও যাচ্ছে? না কি আর কোন অতিথি এসেছেন তার আগেই? শর্মিলার একেবারে খালি হাত। একটু চূপ করে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না। বাড়িতে কেউ নেই নাকি? কিন্তু তা কেমন করে হবে? সদর এমন হাট করে

খোলা ।

মুখটা তুলতেই অনেকগুলি পরিচিত দ্রব্য নজরে পড়ে । টোবলের ওপর সেই পরিচিত টেবিল রুখ । কোণার তাকে সেই ফুলহীন মাটির ফুলদানিটা । আর তার পাশেই একগাদা খাতাপত্র । আনন্দের পাখুঁলিপি নাকি ! ধুলোয় ভরা । মাকড়শার জাল হয়েছে তার ওপর । মনে হয় দীর্ঘদিন ওর উপর কারও হাত পড়েনি । দেওয়ালে সেই ছবিখানি । বিয়ের পরে তোলা ওদের যুগল চিত্র । আনন্দের এক সহযোগী ছবিটা তুলেছিলেন হুগলীতে, গঙ্গার ধারে । ওদের দাম্পত্যজীবনে নেমে এসেছে অমাবস্যার অশ্ধকার ; কিন্তু ফটোতে এখনও লেগে আছে সেই প্রথম প্রতিপদের একফালি শিহরণ । আনন্দের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি । শর্মিলার পরনে—কী আশ্চর্য, সেই বাসন্তী রঙের মূর্শিদাবাদী শাড়িটাই । আশ্চর্য এই যে, আজও অনামনস্ক ভাবে সেই শাড়িখানাই পরে এসেছে সে । সকালবেলা আলনা থেকে না দেখেই যে শাড়িখানা তুলে নিয়েছিল সেখানা সেই রতনদাদুর দেওয়া ফুলশয্যার শাড়িটাই । ভুল করেছে শর্মিলা । আজ এ শাড়িটা পরা ঠিক হয়নি । অবশ্য আনন্দ কি তাকে দেখতে পাবে ? এতটা চোখের দৃষ্টি হয়েছে কি তার ? হয়তো জানতেই পারবে না শর্মিলা কী-সাজে সেজেছে আজ । কিন্তু কী আশ্চর্য, ঐ ফটোখানার ওপর একটা কুন্দফুলের মালা দুলছে কেন ? এ বাসায় ও ফটোতে কে দিয়েছে ঐ ফুলের মালাটা ? আনন্দ ? সে তো এখনও প্রায় অশ্ব —জ্ঞানেই না, কোথায় কোন ফটো ঝুলছে । উমা ? কিন্তু সে তো আত্মারক ঘৃণা করে শর্মিলাকে । তাহলে ?

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে শর্মিলা । বাইরের ঘর পার হয়েছে ভেতরের বারান্দা । এক কোণে কিছূ বাসনপত্র, একটা ভাঙা সাইকেল । তার পাশ দিয়ে উঠে গেছে দ্বিতলে যাবার সিঁড়ি । চুন বালি খসা দেওয়াল । সারিকানি সিঁড়ি । মেজ তরফের ছেলেগুলি দুরন্ত । কাঠকয়লা দিয়ে সিঁড়ির দেওয়ালে নানান চিত্র-বীচিত্র করা । শর্মিলার অবশ্য সেসব নজর পড়ে না । সে নিঃশব্দ চরণে উঠে আসে দ্বিতলে । দ্বিতলের বারান্দার কোণায় ওর লক্ষ্মী পাতা । অনামনস্কের মতোই হাত দুটি কপালে ছোঁওয়াল । হুগলীতে থাকতে ঐ পট্টা পেতেছিল সে । আনন্দের নয়, উমার আগ্রহাতিশয্যে । প্রতি বৃহস্পতিবারে পাঁচালি পড়ত ঐ পটের সামনে বসে । ওর পক্ষে সেটা বেমানান । লরেটো-লালিত শর্মিলা বসু প্রাক-বিবাহ জীবনে এমন হাস্যকর কাণ্ড ভাবতেই পারত না ; কিন্তু হুগলীর বাড়িতে সেটা কিছূই বেমানান মনে হয়নি । উমার সঙ্গে তাল দিয়ে শিবরাত্রির উপবাস করেছে, জয়মঙ্গলবার করেছে ইতু করেছে ।

সিঁড়ির মূখেই দেখা হয়ে গেল হঠাৎ ।

উমা !

যেন ভূত দেখেছে উমা । পাথরের মূর্তির মতো ভঙ্খ হয়ে যায় । শেষ ধাপটা অতিক্রম করে উঠে আসে শর্মিলা, বলে—শোধ নেবে নাকি ? তাড়িয়ে দেবে দোরগোড়া থেকেই ?

উমা বলতে পারত, ভাবল শর্মিলা—আপনি বুদ্ধি স্বাগতা বসুর বাড়ি থেকে আসছেন ? অথবা বলতে পারত—না, দোরগোড়া থেকে তাড়িয়ে দেব কেন—আমরা তো বড়লোক নই । কিন্তু সে সব কিছই বলল না সে । কথা বলার ক্ষমতাই বোধ করি লোপ পেয়ে গেছে তার ।

—তোমার দাদা কোথায় ?—প্রশ্ন করে শর্মিলা ।

এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পায় উমা । বলে—কেন এসেছ তুমি ?

শর্মিলা জবাব দেয় না । ঢোকে গিয়ে বাঁ দিকের ঘরখানায় ! এটাতেই থাকত ওরা । শর্মিলা আর আনন্দ—সেই যেবার পুজোর ছুটিতে এসেছিল ! ঘরে সাবেকী বড় খাট । এক কোণায় একটা টেবিল । পুতুলের আলমারি । খান দুই চেয়ার । শর্মিলা পেছন ফিরে দেখে, উমাও এসেছে পেছন পেছন—কিন্তু কথা বলছে না সে ।

—তোমার দাদা কোথায় বললে না ?

—দাদা বাড়ি নেই ।

শর্মিলা হাসে । বলে—এতটা পথ এসেছি তার সঙ্গে দেখা করে যাব বলে । সত্যিই যখন সে বাড়িতে নেই তখন অপেক্ষাই করি । বলে, নির্বিকারে গিয়ে বসল একখানা চেয়ারে । আবার বলে—তুমি অবশ্য বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলোনি । দিলেও আমাকে গিয়ে বসে থাকতে হত বাইরের রাস্তায়, যতক্ষণ না সে বাড়ি ফেরে ।

উমা সাহস সঞ্চার করে বলে—কিন্তু এখন আর তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ?

শর্মিলা খিলখিল করে হেসে উঠে বলে—এত বড় ব্যারিস্টারের মেয়েকে এমন বেকাস কথাটা বললে উমা ? রেজিস্ট্রি-ম্যারেজের সম্পর্ক কি কারও খেলাল-খুঁশিতে উপে যায় ?

ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসে উমা । বলে—কিন্তু আমার প্রশ্নটার তুমি জবাব দাওনি । কেন এসেছ তুমি ?

শর্মিলা বলে—সে কথাটা আমি তাকেই বলতে চাই ।

উমা হঠাৎ কাতর স্বরে বলে—আমার একটা কথা শুনবে তুমি ? কাল তুমি এলে এ কথা বলতুম না । কিন্তু আজ আর না বলে পারছি না । একটা দিনের মধ্যে সবকিছু বদলে গেছে ! তুমি, তুমি এখন চলে যাও । দাদার সঙ্গে দেখা কর না । তাতে কারও কোন লাভ নেই । আর তাতে

সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে তোমার। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একদুগি চলে যাও।

শর্মিলা দরন্ত বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ উমার এ ভাবান্তরে সে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়ে। বদ্বতে পারে কিছুর একটা হয়েছে। ভীষণ কিছুর। কী সেটা? এগিয়ে এসে বলে—কেন? কী হয়েছে উমা?

—সে আমি বলতে পারব না। অত কথা বলার সময় নেই। তুমি আর দেৱী কর না; এখুনি দাদা ফিরে আসবে।

শর্মিলা দৃঢ় স্বরে বলে—কিন্তু কেন আমাকে চলে যেতে বলছ, না জেনে তো আমি যাব না। তা ছাড়া আমিও যে জানতে চাই একটা কথা। কেন তোমার দাদা আমাকে অমন চিঠি লিখেছিল।

হঠাৎ দুরূহাতে মুখ ঢেকে উমা বলে—সব মিছে কথা লিখেছিলাম আমি। সব মিথ্যে। সব মিথ্যে।

শর্মিলা এগিয়ে এসে ওর মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে—কী মিছে কথা উমা? বল, সব কথা আমাকে খুলে বল।

শর্মিলা দেখে উমার দৃষ্টি চোখে জল ভরে এসেছে। তবুও ওর চোখে চোখ রেখে বলে—দাদার দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার কথা। দাদা আর কোন দিন দেখতে পাবে না।

বৃকের মধ্যে মোড় দিয়ে ওঠে শর্মিলার। দাঁতে দাঁত চেপে বলে—ও।

উমা নীরবে কাঁদছে।

শর্মিলার কিন্তু সেজন্য কোন সহানুভূতি জাগে না। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বলে—তাহলে সে ও কথা লিখতে বলল কেন?

উমা আবার তার মন্থখানা তুলে বলে—বললাম তো, সব মিছে কথা। দাদা বলেনি লিখতে, আমি নিজেই লিখেছি ওসব কথা।

শর্মিলা আবার বলে—ও! কিন্তু কেন লিখেছিলে মিছে কথা?

এবার জবাব দিতে দেৱী হল উমার।

শর্মিলা একটু কঠিনস্বরে বলে—কই, বললে না। ছোট বোন হয়ে এমন অশ্লীল জঘন্য কথাটা কেন লিখলে তুমি?

উমা বোধ কার মর্মান্বিত করে মুখ তুলে তোবার, বলে—হ্যাঁ, বলব। সব কথাই বলব তোমাকে, কিন্তু কথা দাও, দাদার সঙ্গে দেখা করবে না তুমি?

শর্মিলা এবারও জবাব দেয় না। উমা স্পষ্ট গলায় স্বীকার করে। বলে—মিছে কথা লিখেছিলাম তোমার ওপর শোধ নিতে। ভেবেছিলাম—

—কি ভেবেছিলে?

—আমার মাথার তখন ঠিক ছিল না। দাদা অশ্ব হয়ে গেল। না খেতে

পেয়ে আমরা মরিছি আর তুমি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ শুনে আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম তোমাকে অপদস্থ করতে।

শর্মিলা বলে—থাক। বৃকোঁছ। কিন্তু বারে বারে কেন বলছ, যেন আমি তোমার দাদার সঙ্গে দেখা না করি ?

—ঐ তো বললাম। আজ আমার মন বদলে গেছে। আমাদের আগ্রস-আহার দুয়েরই ব্যবস্থা হয়েছে। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি আজ। মাস্টার-মশাই একটি দিনে আমাকে একেবারে বদলে দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি আমি মেনে নিয়েছি। তুমি আবার বিয়ে কর, তুমি সুখী হও। আমার আর কোন খেদ নেই।

—মাস্টার-মশাই ? তাঁর দেখা কোথায় পেলো তুমি ?

—কাল রাতে তিনি এসেছেন। আমাদের নিয়ে যেতে।

শর্মিলার মনে পড়ল, নিচে বাইরের ঘরে একটা হোল্ডঅল আর সুটকেস দেখে এসেছে বটে।

উমা আপন মনে বলতে থাকে—মাস্টার-মশাইয়ের কথাই মনে নিয়েছি আমি। আমাদের এ দুঃখের জীবনের সঙ্গে তোমাকে আর জড়াব না আমরা। দাদার কথাই ঠিক। তুমি বিয়ে কর। সুখী হও। কিন্তু আর দেরী কর না লক্ষ্মীটি। এখুনি দাদা ফিরে আসবে, তুমি এবার যাও দাদা না জানতে পারে তুমি এসেছিলে।

—কেন, কী হবো তাহলে ?

—কেন মিছিমিছি দুঃখ দেবে তাকে, সে কি করেছে তোমার ?

—বৃকোঁছ না।

—বৃকোঁছ কাজও নেই তোমার। তুমি গুণী।

গ্লান হেসে শর্মিলা বলে—তাড়িয়েই দিচ্ছ তাহলে ?

—হ্যাঁ দিচ্ছি। তোমার ভালোর জন্যেই দিচ্ছি।

—সেই ভালোটা কী, তাই তো জানতে চাইছি এক্ষণ। আমি এসেছি জানতে পারলে কেন তোমার দাদা দুঃখ পাবে, তা না জেনে তো আমি যাব না।

—তুমি বোঝ না ?

—না। কী ?

বিচিত্র হেসে উমা বলে—দাদা নয়, তুমিই অশু।

—তার মানে ?

—তোমার দেওয়া সব আঘাত সম্বন্ধে দাদা আজও তোমাকে তেমন ভালবাসে। তোমার আবার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। তোমার ভাবী স্বামী তোমাকে নেবার জন্য কাল দিল্লি থেকে এসেছেন। তুমি কাল দমদমে তাঁকে

রিসিভ করতে গিয়েছিলে। তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করছ সবই সে জানে। তবু আজও সে তোমাকে ঘৃণা করতে পারে না, ভুলতে পারে না।

—বলে যাও।

—আর কী বলব? এরপর তুমি এসেছ জানলে সে কি আর স্থির থাকতে পারবে? সে যা পাগল মানুষ, তা তো তুমি জানই, হয়তো সে—; না না, তোমার আসাটাই ভুল হয়েছে।

—কিন্তু সে যে অস্থ তা তো আমি জেনে আসিনি। হয়তো আমি এসেছিলাম থেকে যাব বলেই।

উমা একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—যাক, এখন তো জানলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসেনি। এখন তো বুঝছ যে, এখানে তোমার থাকার কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কেন মিথ্যে জড়িয়ে পড়বে ফের!

হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে উমা। বলে—ঐ বৃষ্টি ঠোরা ঘিরে এলেন! তুমি পালাও—

উমা দরজার দিকে পা বাড়ায়। শর্মিলা ওর হাতটা চেপে ধরে বলে ও কি একেবারেই দেখতে পায় না?

—না, কিন্তু চোখ গিয়ে ওর বোধশক্তিটা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। খুব সাবধান।

—তার মানে?

কিন্তু তার মানে জানবার সময় পায় না উমা। সিঁড়িতে পরিচিত পদশব্দ শুনলে সে চকিত হয়ে ওঠে। এগিয়ে যান দ্বারের কাছে। শর্মিলাও উঠে দাঁড়ায়। সজ্জিত হয়ে সে দেখতে থাকে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে আনন্দ। হাতে মোটা বেডের লাঠি, কাঁধে চাদর, চোখে কালো চশমা। আনন্দ দাঁড়ি রেখেছে ইতিমধ্যে। বেশ রোগা হয়ে গেছে সে এই এক বছরে। উমা নিঃশব্দে চৌকির ওপর আঙুল রাখে। কাঠের পদতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে শর্মিলা। নিঃশ্বাসও বৃষ্টি পড়ে না তার।

—কথা বলছিলা কার সঙ্গে রে?—প্রশ্ন করে আনন্দ, দেওয়ালের গায়ে লাঠিখানা রাখতে রাখতে। এগিয়ে আসে সে স্বচ্ছন্দ গতিতে। কাঁধের চাদরখানা রাখে চেয়ারের পিঠে। উঠে বসে খাটের ওপর।

—কথা বলছিলাম? কই না। জোরে জোরে একটা বই পড়ছিলাম।

হৃদুটো কুঁচকে ওঠে আনন্দর। একটু থেমে বলে—ঘরে আর কেউ নেই?

—কই, না!

আনন্দ চুপ করে যায়। চোখ থেকে চশমাটা খুলে পকেটে রাখে। তানন্দের দৃষ্টিহীন দৃষ্টি দেখে বৃকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে শর্মিলার।

—মাস্টার-মশাই কোথায়? প্রশ্ন করে উমা।

—নিচের ঘরে।— গছীর হয়ে জবাব দেয় আনন্দ। সে যেন কী ভাবছে।

সবার সঙ্গে দেখাশোনা হল ?

—হ্যাঁ ? হ্যাঁ হল। হোর সব বাঁধাছাঁদা সারা ?

—হ্যাঁ সারা। ভারি তো জিনিসপত্র !

আনন্দ আরাম করে পা তুলে উঠে বসে খাটে। শর্মিলা অবাক চোখে খঁটিয়ে খঁটিয়ে দেখছে তাকে। একেবারে নিঃশব্দে। একচুলও নড়ে না।

আনন্দ বলে জানিস উমা, মাস্টার-মশাই এতক্ষণ একটি মেয়ের কথা বলছিলেন আমাকে। ঠুঁদের আশ্রমে আছে। পোলিও হয়ে দু'টি পাই অবশ হয়ে গেছে তার। পা দু'টি গেছে, কিন্তু বুদ্ধিটা প্রখর হয়ে উঠেছে বয়স অনুপাতে। ভারী অভিমানী মেয়ে। ওর বাপ আবার বিয়ে করেছে। বিমাতা ওকে দেখতে পারে না। মেয়েটি বাড়ি যাবার নামও করে না। তার দাঁি ঝটাই তোকে নিতে হবে বিশেষ করে।

—কত বয়স হবে তার ?— প্রশ্ন করে উমা।

— ঠিক জানি না। আট-দশ বছর হবে। মিঠুয়া বুদ্ধি নাম। দু'দিন ধরে সে অনশন করে আছে। কেউ তাকে কিছু খাওয়াতে পারছে না।

বুকের মধ্যে মোড় দিয়ে ওঠে শর্মিলার। মিঠুয়ার কৌকড়ানো চুলে ঘেরা অভিমানী মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে যায়।

—কেন, অনশন করে আছে কেন ?

—সে আর এক ইতিহাস। শমুকে ঐ মেয়েটা তার মরা মায়ের মতো ভালবেসেছিল। তা শমুর বিয়ে ঠিক হয়েছে, সে চলে যাবে শুনে—

শর্মিলার দিকে তাকিয়ে উমা বুঝতে পারে ব্যাপারটা। তাড়াতাড়ি আনন্দকে থামিয়ে দিয়ে বলে—ও কথা থাক দাদা।

—কেন, থাকবে কেন ?

—ও গল্প এখন ভাল লাগছে না।

আনন্দ প্লান হাসল। বলে— বেশ, তাহলে মিঠুয়ার কথা থাক। শর্মিলার কথাই বলি। তার সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন মাস্টার-মশাই—

—না, না ! তার কথাও থাক। এ কি তোমার গল্প করার সময় ? যাও, স্নান করে এস। তোমার হলে তারপর মাস্টার-মশাইকে পাঠাব।

আনন্দ বলে স্নান করে আসব ? তা বেশ। হ্যাঁ রে, জবাকুসুম তেল আছে হোর কাছে ?

—জবাকুসুম ? না তো। হঠাৎ জবাকুসুম কেন ?

—মাথায় মাথব। বড্ড ধরেছে মাথাটা।

—তা জবাকুসুমে মাথাধরা সাবে কে বলল ? মাথা ধরার ওষুধ আছে

আমার কাছে । থাকে ?

—এ ঘরে আছে ?

—না নিচে ; নিয়ে আসব ?

—হ্যাঁ । নিয়ে আস ।

উমা ইঙ্গিতে শর্মিলাকে ডাকে । সঙ্গে যেতে বলে । যেতে হলে আনন্দের সামনে দিয়েই যেতে হয় । আনন্দের সামনেই থোলা জানালা । শর্মিলা বিকলাঙ্গদের সান্নিধ্যে অনেকদিন কাটিয়েছে । অশ্বদের প্রথর সংবেদনশীল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে তার প্রকৃষ্ট ধারণা আছে । সে জানে, আনন্দ এবং থোলা জানালার মাঝখান দিয়ে নৈঃশব্দ চরণেও সে যদি চলে যায় তবে আনন্দ বলে উঠবে—কে যায় ?

শর্মিলা জানে দাঁষ্ট হারালেও এ জাতীয় অশ্বদের চোখের ওপর আলোর একটা বোধ থাকে, হঠাৎ সে আলোর ওপর ছায়াপাত হলে তারা অনুভব করতে পারে । আনন্দ জানে উমা আছে ঘরের কাছে, এ পাশে নয় । আনন্দ যদি চোখ থেকে কালো চশমাটা না খুলত তাহলে হয়তো একটা খুঁকি নিলেও নেওয়া যেত । এখন কিন্তু তার সাহস হল না । অতি সন্তপণে মাথা আর হাত নেড়ে উমাকে জানান যে, সে যাবে না । এখানেই অপেক্ষা করবে ।

—কই যা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

শর্মিলা বুঝতে পারে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে খুঁকি না নিয়ে । উমা ঘরের ওদিকে যে এখনও দাঁড়িয়ে আছে তা অনুভব করছে আনন্দ । দেখতে সে পাচ্ছে না, কিন্তু উমার পদশব্দ সে পায়নি । শর্মিলা উপলব্ধি করে কতদূর প্রথর হয়ে উঠেছে আনন্দের বোধশক্তি ।

উমা নিচে যায় ওষুধটা আনতে ।

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে আনন্দ ! শর্মিলা ঘরের ঘোঁড়াকে দাঁড়িয়ে আছে সে দিকে মূখ্য করে বলে—উমা ডাকল, বই, তুমি গেলে না যে !

সর্বান্তে রোমাণ দিয়ে ওঠে শর্মিলার । বিস্ময়ে আতঙ্কে সে শিউরে ওঠে । কিন্তু তবু এক তিলও শব্দ করে না । আনন্দ কি অশ্ব নয় তাহলে ?

ভয় করছে আমাকে ? কেন ? অশ্বই হয়েছি, পাগল তো হইনি--ভয় কি শম্ভু ? এস, কাছে এস । আমি সত্যিই মূর্ত্তি দিয়েছি তোমাকে । আর ভয় কর না আমাকে । তুমি আবার বিয়ে কর । বিকাশের সংসাবে অন্তত অর্থকৃচ্ছ্রতা থাকবে না । বিশ্বাস কর শর্মিলা, আজ থোলা মনে আমি আশীর্বাদ করছি তোমাকে ।

আর সংঘম বাধ মানেন না । থরথর করে কেঁপে ওঠে শর্মিলা । দু'পা এগিয়ে এসে বাস পড়ে আনন্দের সামনে হাঁটু গেড়ে । ওর হাঁটুটা জড়িয়ে ধরে

বলে—তুমি—তুমি...তাহলে এতক্ষণ সব দেখতে পাচ্ছিলে ?

আনন্দ হাসে। একটা হাত রাখে শর্মিলার খোঁপায়। বলে কিছুই দেখতে পাইনি শম্ভু। অনুভব করছিলাম। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেরেছিলাম। সন্দেহ ছাড়া জবাবকুন্দের গম্ভীর। এ তেল তুমিই শব্দ মাথতে এ বাড়িতে। তোমার স্মৃতির সঙ্গে তোমার চুলের গন্ধটা মিশে আছে যে...

শর্মিলার দৃষ্টি চোখে আদ্রতা বনিয়ে আসে। আনন্দ তার অবোধ অশ্রু হাতের স্পর্শ তখনও বুলিয়ে চলেছে ওর মাথায়। কাপড়ে হাতটা লাগে। দৃষ্টি আঙুলে কাপড়ের প্রান্তটা অনুভব করে বলে—মর্শিদাবাদে আসছ, তাই বুদ্ধি এই মর্শিদাবাদী ?

শর্মিলা আরও অবাক হয়ে যায়। মৃদু ভুলে বলে—সত্যি তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না ?

—একেবারে পাচ্ছি না বললে মিছে কথা বলা হবে। সেই ফুলশয্যা রাতে বাসন্তী রঙের মর্শিদাবাদীখানা পরা তোমার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য কল্পনায়।

শর্মিলার অশ্রুর বন্যা আর যে বাধ মানেনা।

—এটা কী রঙের মর্শিদাবাদী ?

শর্মিলা জবাব দিতে পারে না। ঠোঁট দৃষ্টি কেঁপে ওঠে ওর।

আনন্দ আলগোছে শর্মিলার বাঁ হাতখানা তুলে নেয়। তার হাতের ওপর হাত বদলাতে বদলাতে বলে—অনেক রোগা হয়ে গেছ তুমি।

উগত অশ্রুকে কোনমতে রোধ করে শর্মিলা বলে—কেমন করে বুঝলে ?

—বাঃ! এটা তো সেই ছুনি বসানো আংটিটা। এটা তো মাঝের আঙুলে পরতে আগে।

শর্মিলা নিজেই ভুলে গিয়েছিল তা। অনিমেষে তাকিয়ে থাকে অনামিকার আংটিটার দিকে।

কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যায় শর্মিলা; সে কেন এসেছিল ? সে এখন কী করবে ? এ কোন আনন্দের কাছে এসেছে সে ? একে তো সে চেনে না।

—ওখানে কেন শম্ভু ? এস, কাছে এস।

শর্মিলা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। আনন্দ ওর বাহুমূল ধরে ওঠাবার চেষ্টা করতেই সে ভেঙে পড়তে চায় আনন্দের বুক। কিন্তু বাধা দেয় আনন্দই। বলে—না না, তা বলে অতটা কাছে টানতে চাইছি না। বস এখানে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রচণ্ড বেদনায় টনটন করে ওঠে শর্মিলার। লজ্জা ! কী অপারিসমী লজ্জা ! আজ এক বছর পরেও ঐ উদাসীন অশ্রু মানুষ্টা।

একাত্তলও বদলায়নি। আজও সে শর্মিলাকে দহাতে শব্দ দূরেই ঠেলে দিতে চায়। আর শর্মিলা লজ্জার মাথা খেয়ে ওর বুককেই আশ্রয় নিতে গিয়েছিল।

আনন্দ বলে—আমি অশ্ব, কিন্তু পাগল নই শব্দ।

শর্মিলা বলে—এ কথার মানে?

—সব জেনেশুনেও কি তোমাকে আজ..., না না শব্দ, তুমি এসেছ খব্দ খব্দই হয়েছি আমি। খব্দশী মনেই আজ বিদায় দিতে পারব আমি। তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়াটাই যে বাকি ছিল আমার।

—ক্ষমা! কী বলছ তুমি! সে তো আমি চাইব। আমার জন্যেই তোমার দুটি চোখ—

হঠাৎ হাতটা বাঁড়িয়ে শর্মিলার মুখটা চেপে ধরে আনন্দ। বলে—চুপ। এখনই উমা ফিরে আসবে।

—তার মানে? উমা আজও কিছু জানে না কি?

—কেন মিছামিছ তোমাকে ছোট করব তার কাছে? ভুল ভুলই। সে ভুল তোমার, সে ভুল আমার। তার মাসুল আমরাই দুজন দেব। উমা কিছুই জানে না আজও।

আর নিজেকে সামলাতে পারে না শর্মিলা। কিন্তু কিছু একটা করে বসার আগেই শোনে আনন্দ বলে—ঘরে আস উমা; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

শর্মিলা সংযত হয়। মূখ তুলে দেখে দূ চোখ মেলেও সে যা দেখতে পারিনি যষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে আনন্দ তাই দেখতে পেয়েছে। চিত্রাপিত্তর মতো উমা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। তার হাতে জলের গ্লাস আর ওষুধের বড়ি। উমার দূ চোখে আনন্দ, বেদনা, বিস্ময়, আর আতঙ্ক।

আনন্দ বলে—ভয় নেই রে উমি! আমাদের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। আমরা দুজনেই দুজনকে খব্দশী মনে বিদায় দিয়েছি। এরপর আমিও নিশ্চিত মনে আশ্রমের কাজে যেতে পারব, আর শব্দও দিল্লীতে তার নতুন সংসারে—

হঠাৎ আতঙ্কে শর্মিলা বলে ওঠে : ননা!

—না। না কি?—আনন্দের মুখে বিস্ময়।

দূ হাতে মূখ ঢেকে শব্দ কেঁদে ফেলে। বলে—উঃ! কী নিষ্ঠুর তোমরা। তখন থেকে শব্দ যাও যাও, বের হও, বের হও। কিন্তু কেন? কী করোছ আমি। না, আমি যাব না। কিছুতেই যাব না। এ আমার বাড়ি, আমার সংসার, দেখি কে আমাকে তাড়ায়।

উমা অবাক হয়ে বলে ওঠে—বউদি!

শর্মিলা সাড়া দিতে পারে না। বালিশটাকে সবলে আঁকড়ে ধরে হু হু করে কাদতে থাকে। সে কান্নার ভাষা নেই।

—দাঁড়াও, মাস্টার মশাইকে খবর দিই। দুজন নয় আমরা তিনজনই যাব

তার সঙ্গে ।

একছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় উমা ।

আনন্দ এবার আর কোন সঙ্কেচ করে না । শর্মিলার বাহুদুল ধরে আকর্ষণ করে নিজের দিকে ।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে শম্ভুর । প্রতিটি রোমকূপে জ্বলছে গিহরণ । কে বলে আনন্দ অশ্ব ? এতদিনে সে দেখতে পেয়েছে শর্মিলার সত্যস্বরূপ । শর্মিলার প্রেম, তার ভালবাসা, তার নারীত্ব এতদিনে সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছে । একান্ত নির্ভরতায় সে আত্মসমর্পণ করে আনন্দের বাহুবন্ধনে ।

আনন্দ গুর কানে কানে বলে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মিতা ! এ যে আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না !

শর্মিলা কথা বলতে পারে না তার সর্বাঙ্গ কিছু মৃদু হয়ে জ্বাষ দেয় এ প্রশ্নের । মিতা ! এ কানে কানে ডাকা নামটা তাহলে আজও ভোলেনি আনন্দ !

সে আত্মসমর্পণের ভিজিমাটায় বদ্ধ হতে আর কিছু বাকি থাকে না । শম্ভুর অশ্রু-আর্দ্র অধরোষ্ঠে একটি ক্ষমাসুন্দর চিহ্ন এঁকে দিয়ে আনন্দ বলে মিতা ! মধুমিতা !

নীলিমায় নীল

মারায়ণ মান্যাল

